প্রকাশক
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধানসরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৬

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টি, বিবেকানন্দের সমাজদৃষ্টি, মহাভারতের তাৎপর্য্য, অলঙ্কারের আবশ্যকতা, ভাষার দর্শন, মার্ক্‌স্‌, রাসেল, সার্ত্র প্রভৃতির দর্শনের সঙ্গে ভারতীয়দর্শনের তুলনামূলক সমালোচনা ॥

## সূচীপত্র

# ভূমিকা

"আন্তর্জাতিক" পত্রিকার নিয়মিত পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সুপরিচিত। ব্যাপকতর পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করার জন্য প্রবন্ধগুলি বর্তমান গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হল। "আন্তর্জাতিক" পত্রিকার পরিচালক বন্ধুবর্গ আমার প্রবন্ধগুলির প্রথম প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে একজনকে কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত হলে আমার হৃদয়ের ক্ষমাহীন কার্পণ্য প্রকাশ পাবে। "আন্তর্জাতিকের" বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক বেদুইন চক্রবর্তীর অকৃপণ প্রেরণা এই প্রবন্ধগুলির প্রধান উৎসস্বরূপ। সার্ত্রের দর্শনচিন্তার সমালোচনায় আমি যুক্তি দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে nothingness বস্তু বা ব্যক্তির "স্বভাব" হতে পারে না। তখন বোধ হয় খেয়াল করিনি যে উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব আমার অন্তরঙ্গ স্বভাব। আমার পক্ষে কলমধরা নিজের সঙ্গে কুস্তিলড়ার সামিল। এহেন একটি হতোদ্যম ব্যক্তির কলম থেকে শ্রীমান বেদুইন অন্ততঃ সাতটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ কেড়ে নিয়েছে। অধ্যাপক বেদুইনের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানাতে কুণ্ঠা বোধ করছি। তবে একথা ঠিক যে বেদুইন না হলে আমার প্রবন্ধ হত না।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ "সত্যাসত্য" বেরিয়েছিল অধুনালুপ্ত "খড়দহ থানা সমাচার" পত্রিকায়। পত্রিকাটির নামকরণ বিভ্রান্তিকর হলেও বস্তুত "থানা"র সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিলনা। দুঃখজনক কারণে এই পত্রিকাটির অপমৃত্যু একটি মননধর্মী উজ্জ্বল সম্ভাবনার অপমৃত্যু। "সত্যাসত্য" প্রবন্ধটি সৃষ্টির মূলে যাঁরা অফুরন্ত উৎসাহ সঞ্চার করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী, শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীসাধন চক্রবর্তী ও শ্রীঅমল দত্ত। প্রফুল্লবাবু আন্তর্জাতিকে প্রকাশিত আমার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ যত্নসহকারে পড়েছেন ও বহুমূল্য মতামত জ্ঞাপনের দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টি" প্রবন্ধটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ছাটাই করার অনুরোধ

করেছিলেন। (প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিকে "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব" নামে প্রকাশিত হয়েছিল)। সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন বন্ধুবরের এ অনুরোধ যুক্তিগ্রাহ্য উপদেশ মনে করেই আমি রক্ষা করেছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকপ্রধান শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আমার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিবিড় অভিনিবেশ নিয়ে পড়েছেন এবং আলোচনা করেছেন। তাঁরই উদার উৎসাহে এ প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে আমি ত্বরান্বিত হয়েছি। মামুলি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যের আধার এই অমায়িক বন্ধুকে আমি বিব্রত করতে চাইনা।

এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ব্যবসায়ীসুলভ লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা না করে আমি বলামাত্র বিনা দ্বিধায় গ্রন্থপ্রকাশে রাজী হয়েছেন এবং পনের দিনের মধ্যে প্রকাশনা সম্পন্ন করেছেন। এজন্য নিশ্চয়ই তিনি আমার কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। মুদ্রাকর দেবেশ দত্ত মুদ্রণ কার্য্য ত্বরান্বিত করে আমাকে ও শ্যামাপদবাবুকে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মুদ্রণ-প্রমাদের দায়িত্ব আমার, দেবেশবাবুর নয়।

যুক্তি-তর্কের প্রশ্নে আমি স্বভাবত তীক্ষ্ণভাষী। প্রকাশভঙ্গীর তীব্রতাকে অশোভন নির্মমতা মনে করে কোন পাঠক যেন হৃদয়ে আঘাত না পান। নিষ্করুণ যুক্তির আধার আমার বুদ্ধি, হৃদয় নয়।

মননশীল পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষভাবে আমার প্রবন্ধগুলির বিচার করুন এই আমার অনুরোধ।

শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

# রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদৃষ্টি

## ১

'তত্ত্ব' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বস্তুর স্বরূপ বা স্বত্ব বা স্ব-ভাব। তত্ত্বের দুইটি দিক, একটি বিশিষ্ট, আর একটি অবিশিষ্ট। স্কুল কলেজের ছাত্ররা ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম পাঠ গ্রহণের সময় জানতে পারে, মানুষের তত্ত্ব হ'ল মনুষ্যত্ব; যেখানে মানুষের অন্যান্য জীবের সঙ্গে মিল রয়েছে সেই অবিশিষ্ট জীবধর্ম, এবং যেখানে তার অন্যান্য জীব থেকে পার্থক্য রয়েছে সেই বিশিষ্ট বুদ্ধি বা মননধর্ম, এই বিশিষ্টতা ও অবিশিষ্টতা, এই স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্য, সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য, এই নিয়ে 'মনুষ্যত্ব', যাকে তত্ত্বজ্ঞানোচিত গাম্ভীর্য্য নিয়ে বলা যেতে পারে মানুষের 'তত্ত্ব'।

সাহিত্যেরও যদি কোন তত্ত্ব থাকে, তবে তার স্বভাবের ভিতরেও এই দুইটি দিক থাকাই স্বাভাবিক; যেখানে সে সাধারণ এবং যেখানে অসাধারণ। সমাজবদ্ধ মানুষের মনন ও ভাবনা সঞ্জাত অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে তার সাধর্ম্য, এবং যেখানে তার ইতর-বিশিষ্ট বৈধর্ম্য, এই দুইটি দিকের সমন্বিত স্বরূপকেই বলা উচিত সাহিত্যের 'তত্ত্ব'। কিন্তু সাহিত্যের তত্ত্বালোচনায় সাধারণতঃ সাহিত্যের অসাধারণ ধর্মটির উপরেই সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে, যার ফলে বক্রোক্তি, অলঙ্কার, রস, ধ্বনি, চমৎকারিত্ব, এই বিষয়গুলিই তত্ত্ববিচারের প্রধান উপজীব্য হিসাবে উপস্থিত করা হয়। সাধারণ কথাকে অসাধারণ ক'রে বলার ভিতরে বাচনভঙ্গীর যে একটু চমৎকারিত্ব আছে ঐটুকুই সাহিত্যের সার, অথবা কথার কারুকর্মের ভিতর নিয়ে ব্যঞ্জনাশক্তির মহিমায় যে একটি অনির্বচনীয় আনন্দঘন রসানুভূতির আস্বাদ পাওয়া যায় ঐটুকুই সাহিত্যের প্রাণ—এই দুইটি প্রধান মতবাদের যে কোনটিই গ্রহণ করিনা কেন, সমস্ত আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত এমন একটি চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য যাতে আমাদের ইতরজনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয় না। কারণ, কথাটা শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়—সাহিত্য একটা

অনুভূতির জিনিষ। সাহিত্যের স্রষ্টা ও উপভোক্তা উভয়েই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাজন, এই অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদে আবির্ভূত হয় এক বিচিত্র অপরোক্ষ অনুভূতি, এক আস্বাদনসর্বস্ব অভিজ্ঞতা—কি সুন্দর, কি চমৎকার! এই সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বের আর কোন নাম নেই, কারণ এ কেবল অনুভববেদনীয়, সুতরাং অনির্বচনীয়।

সাহিত্য অনুভূতির জিনিষ নয় এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু অনুভূতিকে অনুভূতিসর্বস্বতা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার বিপদ আছে। প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রে ও মোক্ষশাস্ত্রে এ বিপদ বার বার মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। একটা উদাহরণই দেয়া যাক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ কি এ সমস্যা নিয়ে দর্শনশাস্ত্রে তর্কের ঝড় বয়ে গেছে, এখনও থামেনি, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই ঝড়ের গতি বেশ বেগবতী। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে যদি বা কোনও রকমে একটা ঐকমত্যে উপস্থিত হওয়া গেল, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতিটা যে স্বয়ং কি পদার্থ, কি তার উপকরণ, কি তার পরিধি এ সমস্যার আর সমাধান হয় না। কারণ, প্রত্যেক পণ্ডিতের ধারণা তার অনুভূতিটাই ঠিক। শুধুমাত্র অন্তর্মুখী বিশ্লেষণের দ্বারা যদি অনুভূতিকে চিনতে হয় তাহলে উপায়ও তো আর নেই। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনের একজন দিক্‌পাল নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট খুব রসিক লোক ছিলেন। তিনি এই নির্ব্বাক অনুভূতির সবাক কোলাহল উপভোগ করে মন্তব্য করলেন—দেখুন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা আমাদের শেষ আপীল-আদালত। কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে যখন মামলা ওঠে, তখন ঘটনাটা সম্ভব কি অসম্ভব বিচার করার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আদালতে আপীল করি, এখন দেখছি প্রত্যক্ষ জ্ঞানটা যে কি তাই নিয়েই মামলা উঠেছে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমাদের কাছে কি যে প্রতিভাত হয় তাই জানি না। তাহলে প্রত্যেকে বুকে হাত দিয়ে শপথ করে বলুন, কার প্রত্যক্ষ কিরূপ? কিন্তু এ দ্বারা ত মীমাংসা হবে না। তাই হৃদয়ের শপথের পথ ত্যাগ করে আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে। অবশ্য জয়ন্ত ভট্ট কি পথ ধরলেন তা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নয়। লোকোত্তর মোক্ষশাস্ত্রের রাজ্যে ত আরও ব্যাপক বিভ্রান্তি। মুক্তির স্বরূপ যে কি—তাই নিয়ে এক এক মহাত্মার এক এক রকমের অনুভূতি, আমাদের ইতরজনের জন্য বিধান, যে কোন মহাজনের পথ ধরে সন্ধান কর। কিন্তু আমাদের মুস্কিল, কোন

মহাজন যে সত্যই মহান্ তা তো আর নিছক অনুভূতি দিয়ে যাচাই করতে পারি না।

সাহিত্যকেও যখন লোকোত্তীর্ণ অনুভূতির রাজ্যে সন্ন্যাস নিয়ে রসোত্তীর্ণ করার দাবী তোলা হয়, তখন আমাদের মুস্কিল বাঁধে আরও বেশী। প্রথম কারণ সাহিত্যিকরা সকলেই আমাদের কাছে মহাত্মা বা মহাপুরুষ বলে প্রতিভাত হন না, যারা কলাকৈবল্যবাদী তাদেরও কৈবল্যের প্রতি অনুরাগ কতখানি আন্তরিক সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, অনুরাগটা কথার তোড়ে ভাসমান বুদ্বুদ মাত্র কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগে। দ্বিতীয়তঃ আমরা সাধারণ মানুষ থাকি সংসারের সুখ দুঃখে জড়িয়ে, দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি আমাদের সর্ব্বাঙ্গে মাখা; ঠাসাঠাসি দিনমুসাফিরের মালগাড়ীতে ওষ্ঠাগত প্রাণটাকে অনেক সময় বইয়ের পাতা দিয়ে আটকে রাখি, তা সে পরীক্ষা পড়ুয়ার গণিত, ইতিহাস, ক্লাসের নোট বইই হ'ক, অথবা জানা অজানা সাহিত্যিকের বইই হ'ক। তখন কোথায় লোকোত্তর অনুভূতি, কোথায় কৈবল্যদায়িনী কলা, তার চেয়ে সিঙ্গাপুরী কদলীর ডাকে যে অনুভূতি জাগে তা কলাশাস্ত্রের লোকোত্তর সুড়সুড়ির চেয়ে অনেক বেশী রসোত্তীর্ণ। কিন্তু এহ বাহ্য, অন্তরঙ্গ কথা বলতে হবে। বাড়ী ফিরে একটু অবসর করে তদ্গত চিত্তে সাহিত্যের বই পড়ি, নানান দেশের নানান মানুষের বিচিত্র ভিড়, সে ভিড়ের ভিতরে নিজের মুখ, স্ত্রীর মুখ, ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধবের মুখ দেখি, শত্রুর মুখও দেখি। চিনিনা এরকম লোকও বিস্তর, তারাও চেনা হয়ে যায়। এই চেনা, অচেনা, নতুন চেনা মানুষের মিছিলটাই চোখের সামনে বড় হয়ে ভাসতে থাকে। এত ভিড় ঠেলে, পায়ের নীচে অনেক আবর্জনা ঠেলে, সামনের অনেক বাধা ঠেলে মানুষগুলি কিন্তু এগিয়ে চলেছে। মনে আশা জাগে, উৎসাহ জাগে। যে মানুষ মানুষের মূল্যকে পদদলিত করেছে সে রক্ষা পায়নি, অভিশাপ মাথায় নিয়ে মাঝপথে কবরের কোলে থেমে গেছে। যে মানুষ মানুষকে ভালবেসেছে, মানুষের অপমান সইতে পারেনি, কিন্তু সবল সংগ্রামী বাহুর দ্বারা মনুষ্যত্বের মূল্যকে রক্ষা করার চেষ্টাও করতে পারেনি সেও তার সকল ব্যর্থতার অন্তর্জ্বালা নির্বাণ করেছে কবরের শান্তিতে; কিন্তু তার শেষ পরাভব হয়নি, মিছিলের পিছের মানুষগুলি সামনে এগিয়ে এসেছে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, দুঃখ করেছে, কিন্তু তার ব্যর্থতার গ্লানি গ্রহণ করেনি,

সংগ্রামী মানবতার বাণী বহন করে পথ কেটে এগিয়ে চলেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে সমস্ত যুগান্তকারী সাহিত্য এই মরণজয়ী মানুষের জয়যাত্রার উজ্জ্বল ছায়াপথ। সব কোলাহল ছাপিয়ে এই জয়যাত্রার জয়ধ্বনি বেজে উঠল কবিকণ্ঠে—

"আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহামর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

একথাগুলি উচ্ছ্বাস না কোন গভীর অনুভূতির বাহন? এ সমস্যা তো কেবল অনুভূতি দিয়ে বিচার করা যাবে না। কোন কলাকৈবল্যবাদী যদি বলে বসেন—এত সাহিত্যিক অনুভূতি নয়, এ একটা সামাজিক অনুভূতি, যার ভিতরে একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে। সত্যিকারের সাহিত্যিক অনুভূতি নিরুদ্দেশ নি-র্লক্ষ্য। কোন ইন্দ্রিয়বিকারলব্ধ অভিজ্ঞতার একটি মুহূর্তকেও যদি উপযুক্ত ভাষার সাজে সাজাতে পারি, তবে রসবেত্তার কাছে ঐ একটি মুহূর্তই অনন্তকালে পরিণত হবে, গোস্পদও সাগরে পরিণত হবে, তিনি বারবার ঐ রত্নাকরে ডুব দেবেন; রত্ন তোলার প্রয়োজন নেই, শুধু অবগাহনেই আনন্দ। "বন্দীর বন্দনা"র বিকারপ্রমত্ত প্রলাপের ঘোরে যে বাচাল কবি রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্তির কল্লোল তুলেছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত মার্কিন ডলার পুষ্ট "এশীয় সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার" আড্ডাখানায় কৈবল্যধর্মের সন্ধান পেয়েছেন, তারও ত একটা অনুভূতি আছে। সে অনুভূতির কি দাম নেই? দাম আছে কিনা জানি না। তবে সরস্বতী স্বৈরিণী হ'লেও স্বৈরাচারের একটা হ্লাদিনী অনুভূতি আছে, সে যে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক, তাই অমূল্য। সঙ্গে সঙ্গে বক্র অঙ্গুলির ডগায় যদি ব্যবহারিক-মূল্যের ঘৃত কিছুটা উঠেই আসে তবে সেটা নিতান্ত আনুষঙ্গিক, পার্থিব বলেই ধর্তব্য নয়।

কথাটা এই জন্যেই উঠেছে যে কেবল উপলব্ধি দিয়ে সাহিত্যের মূল্য যাচাই করা যায় না, অর্থও বোধ হয় বোঝা যায় না। যেমন ধরুন ফরাসী-প্রেমিক বাঙ্গালী কবি সাহিত্যের ফরাস বিছিয়েছেন, সেই ফরাসে বসে তিনি অনুভব করলেন, বিশ্বকবির "নিরুদ্দেশ যাত্রায়" কোন ফরাসী কাব্যসুন্দরীর ছায়া নেমে এসেছে। এই সঞ্চারিণী ছায়ামূর্তিকে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করার

কৃতিত্ব তারই যিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে লাগলেন—পশ্চিমী সভ্যতার সুন্দরী ভাবনা বিশ্বকবিকে ইসারা করেছে, এই 'বিদেশিনী' সুন্দরীর নিগূঢ় সংকেতে এক অনাস্বাদিত মিলনের আশায় বিশ্বকবি অকূল সাগরে পাড়ি জমিয়েছেন। যে মজেছে সেই জানে—কি মনোহারিণী ব্যাখ্যা। কিন্তু উপলব্ধির প্রসাদ-বঞ্চিত যে ইতরজন ব্যাখ্যার পিছনেও যুক্তি খোঁজে তার মন হরণ করা দুঃসাধ্য। সে কবিতার ব্যাখ্যা বুঝতেও নীরস তথ্যের সন্ধান করে। "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটির নীচে সন তারিখ দেওয়া আছে—২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০ সাল। এই সময়টাতে যার দুর্নিবার উপস্থিতি কবিচিত্ত উদ্বেলিত করেছিল তার নাম দেশাত্মবোধ। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতবাবুই এখানে কথা বলুন,—"বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সরকারী পেনশনভোগী রায়বাহাদুর পর্য্যন্ত লিখলেন, 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজেতৃ-জেতৃসম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্ব গৌরব মনে করিব, ততদিন জাতিবৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনি প্রবল থাকে,"—দেশের মনোভাব এইরূপ, রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে প্রবন্ধ লিখলেন ; ...সভা হ'ল বিডন স্ট্রীটের চৈতন্য লাইব্রেরীতে, সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। কয়েকদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' ছাড়া এ সময়ে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লেখেন, যেমন, ইংরেজের আতঙ্ক, সুবিচারের অধিকার, রাজা ও প্রজা, রাজনীতির দ্বিধা প্রভৃতি। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তীব্র দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে প্রতি রচনার প্রতি ছত্রে। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য, ভারতবর্ষীয়রা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে উপযোগী নহে' (রবীন্দ্র-জীবনকথা পৃঃ ৫৮-৫৯)। ঐ একই সময় একদিন কটকে বিহারীলাল গুপ্তের বাড়ীতে এক ভোজসভায় রাভেন্‌স কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের মুখ থেকে ভারতীয়দের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখছেন, "একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে ব'সে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে!" (রবীন্দ্র-জীবনকথা, পৃঃ৫৬)। সভ্য পশ্চিমের বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে যখন শিক্ষিত ভারতবাসীর মন বিষিয়ে

উঠেছে, যখন রবীন্দ্রনাথ "অপমানের প্রতীকার" খুঁজে ফিরছেন, যখন বিদেশী ভাষার বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রচলনের অপরিহার্য্য প্রয়োজন অকাট্য যুক্তিতে প্রতিপন্ন করে "শিক্ষার হেরফের" ঘটাবার চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময়টির মাঝখানে কোন অলৌকিক স্বপ্নাবেশে পশ্চিমী সভ্যতার নিরুদ্দেশ প্রেমাভিসারে বিমুগ্ধ প্রেমিকের মত কবি অকূলে তরী ভাসাতে পারেন, এমন অলৌকিক চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না। "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র ব্যাখ্যায় যদি নবীন বোধিসত্ত্বের বোধি আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তবে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ এমন একটি Split-personality ছিলেন যাকে Jekyll and Hdye-এর এক সংস্কৃত সংস্করণ বলা চলে। কবিভারতী যাতে "দুর্ব্যাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিতা" না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন পড়েছে, সেজন্য হয়তো দুর্বাসার বচনও দরকার হতে পারে। এই দুর্ব্যাখ্যার উৎস হল এমন একটি সাহিত্যতত্ত্ব যা নিজেই নিরুদ্দেশের যাত্রী, যা সমাজ নিরপেক্ষ, যুগনিরপেক্ষ, বস্তুনিরপেক্ষ, মানুষের শুভাশুভ-নিরপেক্ষ, কেবলমাত্র রহস্যদীক্ষিতের উপলব্ধি-সাপেক্ষ।

এই একই সাহিত্যতত্ত্ব আবার অন্য এক বিপরীত দিক থেকে বিপদ ঘটাতে পারে। ভরতনাট্যশাস্ত্রের সবচেয়ে সেরা ব্যাখ্যাকার অভিনব-গুপ্তের বিরাট প্রতিভার প্রসাদে ভরতের নাট্যরসতত্ত্ব প্রায় উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের পদবীতে উত্তীর্ণ হল। কাশ্মীরী শৈবাদ্বৈতের তান্ত্রিক সাধক ও দার্শনিক অভিনবগুপ্ত সাহিত্যরসকে এক অলৌকিক রহস্যানুভূতির পর্য্যায়ে উন্নীত করলেন। সমাধিমগ্ন যোগীর নির্বিকল্প আনন্দানুভূতি থেকে কাব্যরসানুভূতির পার্থক্যের একটি সূক্ষ্ম ভেদরেখা তিনি টানলেন বটে, কিন্তু সে রেখাটি এত সূক্ষ্ম যে পরবর্তীকালে মম্মটভট্ট সাহিত্যরসাস্বাদকে প্রায় ব্রহ্মাস্বাদেরই মতো বলে তুলনা করলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ বললেন "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ"। সাহিত্যের উৎপত্তি লৌকিক জগৎ থেকে, কিন্তু তার রসানুভূতি অলৌকিক জগতে। এই সাহিত্যতত্ত্বের বিপদ হ'ল—সাহিত্যের মাতৃভূমিকে বিস্মৃত হওয়া এবং এই বিস্মরণকেই একক নিঃসঙ্গ অনুভূতির গৌরবরূপে প্রতিষ্ঠা করা। আকাশচারী রসবোধ আর নীচের মাটির দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না। কারণ রস তখন স্বপ্রকাশ, লৌকিক সমাজের মৃত্তিকাই যে তাঁর জন্মভূমি এই উপলব্ধি তখন বিলুপ্ত। এর ফলে সাহিত্যের অর্থবোধে বাধা ও বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, অর্থবোধ

ও রসবোধ অবিচ্ছেদ্য। ঊর্দ্ধবায়ুর প্রকোপে তখন রস ও অর্থ উভয়েই ঊর্দ্ধগামী। কোন সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টি-কর্মের অর্থ বিচার করার সময় কোন সময়ে, কোন সমাজে, কোন পারিপার্শ্বিকে সৃষ্টিকর্তাকে কাজ করতে হয়েছে, সমানকালীন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতি তাঁর মনোভাব কিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল, এই জাতীয় ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী বিচারকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, বিচারের চেয়ে প্রাথমিক অনুভূতিটাই প্রখর হয়ে ওঠে। ফলতঃ, প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা যে অপূর্ব ধ্বনিতত্ত্ব আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছিলেন, সেই তত্ত্ব শুধু প্রাচীন ভাবনার ভিতরেই সংকুচিত হয়ে থাকে, তাকে অতিক্রম করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধ্যান-ধারণায় প্রসার লাভ করতে পারে না। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্য বা নাটকের দু-একটি পংক্তির ভিতরেই ছোট্ট একটু ঠাঁই করে থাকতে হবে, একটি সমগ্র কাব্য বা নাটকের সামগ্রিকভাবে কোন একটি ব্যাপক ব্যঞ্জনাময় অর্থ থাকতে পারে না, এমন কোন রাজকীয় শাসন মানা চলে না। ঠিক সেজন্যই কোনো মহাকবির সমগ্রজীবন, তাঁর সাহিত্যজীবন ও সমাজজীবন, যখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হওয়ার সুযোগ পায়, তখন আমরা দাবী করি, এই মহাকবির সমগ্র জীবনের গতি ও লক্ষ্য নিরূপণ কর, তার উপক্রম ও উপসংহার লক্ষ্য কর, তাঁর সঞ্চরণপথের ঋজু ও কুটিল রেখাগুলি অনুসরণ কর, খুঁজে দেখ তাঁর সমগ্র জীবনটারই একটা গভীর ব্যাপক অর্থ আছে কিনা, যে অর্থে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও সাহিত্যজীবনের মিলিত সার্থকতা অনুভব করেছেন। এ দাবীটা খুবই বড়, পূরণ করা পরিশ্রমসাধ্য, কিন্তু অযৌক্তিক নয়। সাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সবচেয়ে বড় কথা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কার ধ্বনি, কার বাঞ্জনা? আলঙ্কারিক বললেন রসের ধ্বনি বা রসের ব্যঞ্জনাটাই বড় কথা। এখানেও আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু আপত্তি ওঠে তখনই যখন বস্তুধ্বনি থেকে রসধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা একথা বলেছি, যে কোন তত্ত্বের মতই সাহিত্যতত্ত্বেরও দুইটি দিক আছে, একটি সাধারণ, আর একটি অসাধারণ; একটি অবশিষ্ট, আর একটি বিশিষ্ট। বস্তুধ্বনি থেকে রসধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে, সাধারণ থেকে অসাধারণের, অবিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টের বিচ্ছেদ ঘটে। সাধারণ ভূমি থেকেই যে অসাধারণের জন্ম, বস্তুভাবনা থেকেই যে রসচর্বণার অভিব্যক্তি এই সাধারণ

সত্যটি তখন দৃষ্টিছাড়া হয়, আর রসবোধটিও হয়ে ওঠে সৃষ্টিছাড়া। কবি-মানসের পিছনে কবির যে ক্রিয়াশীল সমাজ-মানসটি কাজ করে যাচ্ছে, কোন সমানকালীন সামাজিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেই সমাজ-মানসটি কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়েই যদি কোনো কবি-কর্মের তাৎপর্য্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে বস্তুদৃষ্টিহীন রসবোধ সত্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য।

আমরা যে মহাকবিজীবনের কথা বলেছি তার বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম থেকেই উদাহরণ টেনে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করব। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' সর্বাধুনিক ব্যাখ্যাবিভ্রাটে একবার আমাদের বক্তব্য যাচাই করার সুযোগ পেয়েছি। 'রক্ত করবী'র ব্যাখ্যাবিভ্রাটে এ সুযোগ হয়তো আরও বেশী করে পাওয়া যাবে। কারণ, রক্তকরবীর ব্যাখ্যায় বিভ্রাট সৃষ্টি করার দায়িত্ব রবীন্দ্র-নাথকেও গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচারশীল পাঠক মাত্রই জানেন রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর নাটকের কি ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর প্রাথমিক ব্যাখ্যায় রক্তকরবীর তাৎপর্য্য হল—আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দুরন্ত যান্ত্রিক বর্বরতার বিরুদ্ধে শান্ত স্নিগ্ধ কৃষিসভ্যতার মুক্তিস্নাত জয়গান। নন্দিনী এই মুক্তিস্নানের আনন্দ-উচ্ছল প্রাণমূর্তি যে যন্ত্রের বাঁধ ভেঙেছে, আপন হাতে সৃষ্টি করা বিকৃতির জালে আপনি আবদ্ধ মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছে। এ হ'ল ১৩৩১ সালের কথা। কিন্তু মাত্র এক বছর পরে, রক্তকরবীর ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হওয়ার পরে, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষায় তাঁর নাটকের একটি ভাষ্য তৈরী করলেন, পশ্চিমী মনের কাছে তার আবেদন পৌঁছে দেয়ার জন্য। এই ব্যাখ্যায় তিনি একটি নতুন জিনিষ উপস্থিত করলেন—যা হয়ত পূর্ব ব্যাখ্যায় উহ্য ছিল—সে হ'ল প্রাচ্য দেশ-গুলির উপর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের লোলুপ আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্য-বাদ কথাটি উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু বলতেও বাকী রাখেন নি। "The Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a giagantic system......It is an organised passion of greed that is stalking Europe in the name of European civilisation......The hungry purpose, having science for its steed, running about unchecked, trampling our life's harvest,

is not an intellectual generalisation unfit for imaginatve literature.'' এখানে "organised passion of greed"—"একটি সংগঠিত লোভাতুর কামনা" এই কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আরও লক্ষণীয়, 'The hungry purpose. having science for its steed…', একটি ক্ষুধার্ত উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ঘোড়ায় চেপে পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে। প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথ এখানে কাকে দোষী করছেন, বিজ্ঞানকেই দোষী করছেন, না যারা অপরিমেয় শোষণলালসা চরিতার্থ করার জন্য বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে মানুষের অভিশাপে পরিণত করেছে তাদের দোষী করছেন; যন্ত্রকেই দোষী করছেন, না যারা যন্ত্রের মালিক হয়ে দেশের দশের ও বিদেশের মালিক হয়েছে তাদের দোষী করছেন, যন্ত্রসভ্যতাকে দোষী করছেন, না 'যান্ত্রিক' সভ্যতাকে দোষী করছেন। রক্তকরবীর ইংরেজি ভাষ্য থেকে ঠিক এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। কারণ, এই ব্যাখ্যায় এমন পংক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে যার দ্বারা মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ দুর্বল মানুষের দুর্গতির জন্য যন্ত্রকেই দায়ী করছেন।—"I have a stronger faith in the simple personality of man than in the prolific brood of machinery that wants to crowd it out.''

সুতরাং যারা রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী সভ্যতার প্রেমে পড়েননি বলে স্বস্তি পেয়েছেন, তারা আরও নিশ্চিন্ত হলেন। পশ্চিমী সভ্যতা মানে জড় বিজ্ঞানের, যন্ত্রবিজ্ঞানের সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীতে এই সভ্যতার পরাজয় ঘটেছে, কৃষিনির্ভর তপোবনের শান্তির বাণী আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসেছে কবিঋষির কণ্ঠে। এই তো রবীন্দ্রনাথ, উপনিষদের রবীন্দ্রনাথ যাঁর সাহিত্যতত্ত্বের ছত্রে ছত্রে উপনিষদের তত্ত্ব প্রতিফলিত! কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কাব্য ও নাটকে কবি নিজে থাকেন অন্তরালে, কিন্তু প্রবন্ধের ভিতরে তিনি প্রত্যক্ষ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পান সকলের প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে। রক্তকরবী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালে আশ্বিনের প্রবাসীতে। এক বছর পরে যখন কবি তাঁর ইংরেজী ভাষ্য রচনা করলেন, ঐ একই সময় তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত "চরকা" প্রবন্ধ। সে প্রবন্ধে কবির বক্তব্য শোনা যাক—"য়ুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিক সাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্য-প্রকৃতির হাতের সব রকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে

প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে একপাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড় কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।···বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে একথা যদি ভুলি, তাহলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।" আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাধনায় দেশের মানুষকে যে কবি এমন করে আহ্বান জানালেন ঐ একই মুহূর্তে তিনি আবার নাটকে ও ভাষ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানকেই ধিক্কার দিলেন কেমন করে? তাই রক্তকরবীর মর্ম নিহিত রয়েছে ঐ প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথার ভিতরে—"মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে, প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা"। পশ্চিমী সভ্যতার দোষটা তা হলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের নয়, দোষটা হল সংগঠিত ধনিক সভ্যতার দুরন্ত লোভের, যার ফলে বিষ্ণুচক্রের আশীর্বাদ মানুষের অভিশাপে পরিণত হয়েছে, মানুষের মনটাকেই যন্ত্রে বাঁধা হয়েছে। মুক্তি চাই যন্ত্রবিজ্ঞানের হাত থেকে নয়, ঐ দুরন্ত লোভের হাত থেকে। এ ছাড়া কোন সংগত অর্থ আর রক্তকরবীর হতে পারে না।

মুক্তধারা সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ধিক্কারটা যন্ত্রের উপরেই বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হয় মুক্তধারা থেকে রক্তকরবী পর্য্যন্ত সময়টাতে পাশাপাশি একটি স্বচ্ছ দ্ব্যর্থহীন প্রবন্ধের ধারাও চলেছে—'শিক্ষার মিলন' থেকে 'স্বরাজ সাধন' পর্য্যন্ত। বিশেষ করে 'শিক্ষার মিলনের' ভিতরে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিমের যে মিলনের আদর্শ তুলে ধরলেন তা দৃষ্টির প্রসন্নতা ও বুদ্ধির প্রখরতায় অতুলনীয়। উপনিষদীয় নির্লোভ আত্মিক সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞানের সাধনাকে মিলাতে হবে, না হলে মানুষ সম্পূর্ণ হবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি মুক্ত হৃদয়ে আশীর্বাদ জানালেন, ধিক্কার দিলেন তার শক্তিমত্ত লালসাকে, যাকে আধুনিক ভাষায় বলে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। —"মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে, তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে।···সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান

বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্য্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হয়ে থাকে ; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয় ; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাযথ বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে, তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে—অন্য উপায় নেই।" "অমৃত লোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।" কিন্তু "পশ্চিমী সভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে।" "ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানব সমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে,……তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন।" এর কিছুদিন পরের প্রবন্ধ 'সত্যের আহ্বানে'ও রবীন্দ্রনাথ একই কথা অন্যপ্রসঙ্গে বললেন—"স্বরাজ গড়ে তোলার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত…যাঁরা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাদের ভাবতে হবে, যারা যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে ও কর্মে লাগতে হবে।" "বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোট করা যায়, ছোট কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকা দ্বারাও। …মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয়, সেখানে চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিষটা সুতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।" রবীন্দ্রনাথ দেখালেন আসল রোগ কলটা নয়, আসল রোগ লোভ ও স্বার্থ।

এর কিছু পরেই মুক্তধারার আবির্ভাব। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি যে পিছনের পটভূমি তৈরী করেছে মুক্তধারার তাৎপর্য্যকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি রসবোধের সহায়ক হবে? মুক্তধারার প্রতিবাদ যন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়, এ প্রতিবাদ তাদেরই বিরুদ্ধে যারা উচ্ছ্রিত অহঙ্কারে, শক্তির স্পর্ধায় যন্ত্রশক্তির অপপ্রয়োগ করেছে, শিবতরাইয়ের কৃষকদের জীবিকার জল থেকে বঞ্চিত করেছে। 'কলসী গলায় বেঁধে যে আত্মহত্যা করল তার দুর্গতির জন্য কলসীটাকেই দায়ী করার মত অবিবেচক বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। পাশাপাশি প্রবন্ধগুলির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর সামাজিক অনুভূতি স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সমসাময়িক নাটকগুলিকে তার

জ্যোতিঃস্পর্শ থেকে আড়াল করে দেখবার চেষ্টা করলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গৌরব কতখানি রক্ষা পায় জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গৌরব নিশ্চয়ই রক্ষা পায় না।

সবচেয়ে মজার কথা হ'ল, যে পশ্চিমীবিকারগ্রস্ত আধুনিক কবি রবীন্দ্র মানসকে পশ্চিমী সভ্যতার সন্তান বলে প্রমাণ করতে উদ্‌ভ্রান্ত, আর যারা পশ্চিমের "জড়বাদ" বিরোধী নির্ভেজাল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক বলে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করতে ব্যতিব্যস্ত তাদের দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু একটা জায়গায় এসে মিলে গেছে—মিলনটি হয়েছে এক নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ অনুভূতিসর্বস্ব সাহিত্যতত্ত্বে। জানিনা এ হেগেলীয় দর্শনের Identity of opposites-এর একটি উদাহরণ কিনা।

২

সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের কি ধারণা ছিল, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বগত মত কি ছিল—এ প্রশ্নে এখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছি। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বার বার উপনিষদ আবৃত্তি করেছেন, ঔপনিষদিক তত্ত্বের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বকে মিলিয়ে দেখার অনেক রকম চেষ্টা করেছেন ; সৃষ্টির আনন্দ, প্রকাশের আনন্দ, অনির্বচনীয়, আপনাতেই আপনি সার্থক, প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের অতীত—এ জাতীয় শব্দ-প্রয়োগ অনেক জায়গায় অনেকবার করেছেন। এর থেকে নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ রসতত্ত্বের সাধনাই সাহিত্যের সাধনা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত মত বলে ধরে নেয়ার পিছনে যুক্তি আছে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বলাবাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় ; তার যে রস সে অহেতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি ছোঁওয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তার সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ব'লে জানি নে" ( সাহিত্যের পথে —সাহিত্যতত্ত্ব, পৃ ১২৫ )। সাহিত্যের ভিতরে আমরা চোখের জলের মধ্য দিয়েও একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পাই, সাহিত্যের এই আনন্দময় উপভোগ্যতাই তার বৈশিষ্ট্য, এমত আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকরা অনেক

সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন। তাই করুণ, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস, সবই রস। মূল ভাব যাই থাকুক, সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ হলে তা রসরূপে আনন্দ-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। এরিষ্টোটেল বলবেন, চোখের জলের ভিতর দিয়ে শুধু আমাদের চোখের ময়লাটাই কাটে না, অন্তরের ময়লাটাও কেটে যায়, অন্তর প্রসন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল সাহিত্যের সকল তত্ত্ব কি এই রস-স্বরূপেই নিঃশেষিত হয়ে যায়? এই কি রবীন্দ্রনাথের মত? সাহিত্যের সৃষ্টি বা উপভোগের আনন্দ নিশ্চয়ই দুর্মূল্যের বাজারে সস্তায় ভাল মাছ পাওয়ার আনন্দ, বা ফাটকাবাজারে দাও মারার আনন্দের সমগোত্রীয় নয়। তা হলে এ হ'ল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের দিক। কিন্তু বৈশিষ্ট্যটাই একমাত্র তত্ত্ব নয়, তত্ত্বের উপরিভাগ, উপরতলার অংশ। সমাজবদ্ধ মানুষের ভাবনার মাধ্যমে অন্যান্য শাস্ত্র যেমন মানুষের সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, সাহিত্যেরও তেমনি জন্মভূমি হ'ল মানুষের সমাজ। এই জন্মভূমিটাই হ'ল সাহিত্যের সাধারণ বা অবিশিষ্ট দিক। এই ভিত্তিভূমির সঙ্গে উপরতলার রসভূমির সম্বন্ধ নিরূপণ করতে না পারলে সাহিত্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদ ঘটার আশঙ্কা আছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কি—তাই আমাদের আলোচ্য।

ঐ সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধ থেকেই কবির নিজের দেয়া একটি উদাহরণ দেখা যাক। কবির নিজের জীবনেরই ঘটনা। ভৃত্য মোমিন মিঞা অনেক দেরী করে বেলা দশটায় বাড়ী থেকে এল। কবি একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন —কোথায় ছিলি। "সে বললে—'আমার মেয়েটি মারা গেছে কাল রাতে।' বলেই ঝাড়ন নিয়ে নিঃশব্দে কাজে লেগে গেল। বুকটা ধক্ করে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা তার আবরণ উঠে গেল। মেয়ের বাপ ব'লে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল; সে হল প্রত্যক্ষ, সে হল বিশেষ"। "সেদিন করুণ রসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল। প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব" (সাহিত্যতত্ত্ব)। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনের অতীত বলতে কি বুঝিয়েছেন? প্রভু ও ভৃত্যের যে ভেদবুদ্ধিটা সৃষ্টি হয়েছিল ব্যক্তিস্বার্থের তাগিদে, তাকে অতিক্রম করে অভেদ বুদ্ধিটাই বড় হয়ে উঠল, ব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ল সমাজের মানুষের মধ্যে। সন্তানশোকাতুর পিতৃস্নেহই এক সাধারণ অনুভূতির ভূমিতে প্রভু আর ভৃত্যকে মিলিয়ে দিল।

সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কাজ এই 'সাধারণীকৃতি'। ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডীকে ছাপিয়ে যায় বলে এ প্রয়োজনাতীত, কিন্তু মানুষ হিসাবে এর চেয়ে বড় প্রয়োজন বোধ হয় আর কিছুই নেই।

একই জিনিষকে অন্য দিক থেকে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের তত্ত্ব কি অর্থে বুঝেছেন, উপনিষদ সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদে ধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে কত স্বতন্ত্র—সে কথাটাও বোঝা যাবে। "উপনিষদ ব্রহ্মস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছেন—সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্।" রবীন্দ্রনাথ বলছেন সত্যেরই তিনটি দিক —I am, I know, I express। "আমি আছি", এর ব্যাখ্যা করলেন—"টি'কতে হবে তাই অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাসস্থান চাই, স্বাস্থ্য চাই।" বলা বাহুল্য ঔপনিষদিক সত্যের এ ব্যাখ্যা কোনও প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরও এগিয়ে চলুন—"যে পরিমাণে মানুষ বলে অন্যের টি'কে থাকার মধ্যেই আমার টি'কে থাকা সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়, সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়।" এরই নাম অনন্তের আস্বাদ, এর থেকেই আসে প্রকাশের প্রেরণা,—"যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। এই প্রকাশেই আনন্দ। সাহিত্য এই অনন্তের প্রকাশের ভিতর দিয়ে আনন্দ দেয়।" এই সাহিত্যের ব্যাখ্যাকে রবীন্দ্রনাথ কোথায় টেনে গিয়ে গেলেন তা লক্ষ্য করার মত। টাকার ঐশ্বর্য্য কোথায়?—যখন "সে কোনো একজন অমুক বিশেষ লোকের ভোগ্যতার মলিন সম্বন্ধ হতে মুক্ত হয়। অশেষের প্রসাদ বঞ্চিত সেই বিশেষ ভোগ্য টাকার বর্বরতায় বসুন্ধরা পীড়িতা।...টাকা যখন দৈত্যের বাহন হয় তখন তার চাকার তলায় কত মানুষ ধূলিতে ধূলি হয়ে যায়......টিটাগড়ের পাট-কলের কারখানায় যে মজুরেরা খেটে মরে তারা মজুরি পায়। কিন্তু তাদের হৃদয়ের জন্যে তো কারও মাথাব্যথা নেই। তাতে তো কল বেশ ভালই চলে। যে মালিকেরা শতকরা ৪০০ টাকা হারে মুনাফা নিয়ে থাকে, তারা তা মনোহরণের জন্য এক পয়সাও অপব্যয় করে না।" বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যতত্ত্বের উপর গম্ভীর বক্তৃতা দিতে গিয়ে কবিগুরু এ সব কি কথা বলছেন। উপনিষদের কথা দিয়ে আরম্ভ করে তিনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? সাহিত্য ও শিল্প কলার "আসল কথা হচ্ছে এই যে, তারা আনন্দের

ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করেছে, প্রয়োজনের দৈন্যকে করেনি। সেই দৈন্যের রূপটা যদি দেখতে চাও তবে পাটকলের কারখানায় গিয়ে ঢোকো, যেখানে গরিব চাষীর রক্তকে ঘুর্নীচাকার পাক দিয়ে বহু শতকরা হারের মুনাফায় পরিণত করা হচ্ছে।" এই সব উদ্ধৃতিগুলিই "সাহিত্য" প্রবন্ধ থেকে। কিন্তু প্রবন্ধের উপসংহার হলো—"সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা।" এখানে 'হিতসাধন' কথাটি রবীন্দ্রনাথ কি অর্থে গ্রহণ করেছেন তা বুঝতে হলে আরও এগিয়ে যেতে হবে। 'সৃষ্টি' প্রবন্ধটির দিকে নজর দেয়া যাক—"মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করেছে, মিস্ত্রি করেছে, মহাজন করেছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে···কোনখানে মানুষের শেষ কথা? যা সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, তারই মধ্যে, সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য।···যেখানে একজন ধনী দশজনকে শোষণ করেছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করে এক-জন শক্তিশালী হচ্ছে, যেখানে বহু লোকের ক্ষুধার অন্ন একজন লোকের ভোগবাহুল্যে পরিণত হচ্ছে, সেখানে মানুষের সত্যরূপ শান্তিরূপ আপন সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেল না।" এই বক্তব্যের সঙ্গে 'সাহিত্য' প্রবন্ধের উপসংহারী মন্তব্যটির সংগতি কোথায়? প্রবন্ধগুলি সামগ্রিক-ভাবে পড়লেই সংগতি ধরা পড়ে। সাহিত্য বা আর্টের মধ্যে সৃষ্টি ও উপভোগের আনন্দটাই তার স্বকীয়তা। হিতসাধন করব বলে সাহিত্য শাস্ত্রবার্তার আসরে নেমে আসে না। কিন্তু সমাজে যখন বিপুল অহিত জমে ওঠে, একজনের ব্যক্তিহিতের স্বার্থে যখন সমষ্টির হিতস্বার্থ পদ-দলিত হয়, তখন এই পরম অকল্যাণের ভূমিতে সাহিত্যের রসব্যক্তি পূর্ণ হতে পারে না, যদি তার 'সাধারণীকৃতি' সার্থক না হয়। আর সাধারণীকৃতি সার্থক হতে পারে না যদি তার কল্যাণের ভূমিকা না থাকে। এ কল্যাণের ভূমিকা কোনো প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে আসে না। কল্যাণ করব বলে নোটিশ দিয়ে আসে না। কিন্তু যিনি আনন্দলোকের স্রষ্টা তার দরদীমন পদদলিত সামগ্রিক মানবতার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, যেমন করেছিল কন্যা শোকাতুর মোমিন মিঞার সঙ্গে। এই ব্যাপক সাধারণীকৃতির পিছনে থাকে বৃহত্তম মানবিকতার আবেদন, অন্যের বাঁচার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচি, এই পরম

সত্যের প্রকাশ। হৃদয়ের বিপুল প্রসারজনিত আনন্দের মধ্যে বেদনাও তখন মধুর হয়ে মিশে যায়—সাহিত্যের স্রষ্টা, উপভোক্তা ও সাহিত্যের জীবন্ত মানুষগুলি একাত্ম হয়ে মিশে যায়। এই একাত্মীয়তারই নাম সহৃদয়তা। উপনিষদের আধ্যাত্মিক সত্যকে রবীন্দ্রনাথ যেমন মানবিক সত্যে পরিণত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অলৌকিক সাধারণীকৃতি ও সহৃদয়তাকেও প্রসারিত করলেন মানবলোকে। "আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগল মিলন। আমরা বাইরে যদি কিছুই অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করিনে। বাইরের অনুভূতি যত প্রবল হয় অন্তরের সত্তাবোধও তত জোর পায়। আমি আছি, এ সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেই জন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। বাইরের যে কোনো জিনিসের 'পরে আমি উদাসীন থাকতে পারিনে" (সাহিত্যতত্ত্ব)। রবীন্দ্রসাহিত্যতত্ত্বের মূল কথা—"উদাসীন থাকতে পারিনে" এই কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যেউদাসীন সে একক নিঃসঙ্গ, তার সংকুচিত ব্যক্তিত্বের ভারে সে অবনত, সে অনায়াসে লোভের কাছে আত্মবিক্রয় করে, পরকে পীড়ন করে আপনার শূন্য ব্যক্তিত্ব পূর্ণ করার চেষ্টা করে, তার ফলে ব্যাপক মানবতা থেকে আপনাকে আরও বেশী বিচ্ছিন্ন করে, তার একাকিত্বের দৈন্যকে আরও দুর্বহ করে তোলে। তাই, যে সাহিত্য স্পর্ধিত একাকিত্বের সাধনা করে তার রসব্যক্তি অপূর্ণ ও বিকৃত। মূল্যবোধহীন বিকৃত একক মানুষের আন্তরিক ও সামাজিক দৈন্যের ক্ষুধিত চেহারাটাই সে সাহিত্যে নৈর্ব্যক্তিক গৌরবের ঘোমটা পরে আত্মপ্রকাশ করে। ঐটুকুই তার সার্থকতা। কিন্তু তার রসবোধে ব্যাপ্তিও নেই, গভীরতাও নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যাক্তি না থাক, গভীরতা থাকতে বাধা কি? সাহিত্যরস কুয়ার জলের মত নয় যে ব্যাপ্তি না হলেও গভীরতা থাকতে বাধা নেই। সাহিত্যরসের কথা বাদই দিলাম, স্থুল রসগোল্লার রসবোধও গভীর হতে পারে না যদি তার ব্যাপ্তি না ঘটে। যেরসগোল্লা খেতে ভালবাসে সে যদি একা এক নিভৃত কোণে বসে গপাগপ্ গিলতে থাকে তার রসনা রসের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যখন দশজনে সভায় বসে তাকে আদরে ও আনন্দে খাওয়ায় তখন তার রসনার রসতৃপ্তিও গভীর হয়। কারণ সামাজিক প্রীতি ও সৌজন্যের ভিতরে সে তৃপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। "আধুনিক কাব্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক কবিদের নকল নৈর্ব্যক্তিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত

করলেন তারা এই মানবিক মূল্যহীন একাকিত্বের সাধক। তাদের তিনি নাম দিলেন অঘোরপন্থী। সমাজের গলিত শবটাকে কথার তোড়ায় সাজিয়ে সদর রাস্তায় বের করাতেই আনন্দ। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ততঃ কিম্। তার উত্তরের প্রয়োজন নেই। মানুষটা যে একদিন বেঁচেছিল তাও মিথ্যা, ভবিষ্যতে যে মানুষ বাঁচবে তাও মিথ্যা, মাঝখানের ঐ শবটাই সত্য, কারণ ও পথ জুড়ে পড়ে আছে। কফিন সাজাবার ভিতরেও শিল্প আছে, কিন্তু সব শিল্প যদি কফিন-সাজাতেই শেষ হয়ে যেত, জীবন্ত মানুষের জন্য যদি কিছুই বাকী না থাকত, তবে কফিন শিল্পটাও গড়ে উঠত না, কারণ ওটা জীবন-শিল্পের উচ্ছিষ্ট দিয়েই তৈরী।

যদি কেউ আপত্তি তোলেন রবীন্দ্রনাথের কায়দায় নিজের কথা বলা হচ্ছে, তাকে কবির নিজের কথাতেই নিয়ে যাওয়া যাক। তখন তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধ, কিন্তু ভবিষ্যৎ শবের স্বপ্ন দেখছেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অন্তরলোক বিশ্লেষণ করে "শব সাহিত্যে"র উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করলেন (সাহিত্যের পথে—"পঞ্চাশোর্দ্ধম্", পৃঃ ২৩৭-২৩৮)। "সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না—একমুহূর্তে হ'ল ভূমিসাৎ। পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্য্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালু বেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে পড়ল, তাড়াহুড়া বেধে গেল। অস্থায়িত্বের এই ভয়ংকর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোনো কিছুর স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হয়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলা-রচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি শুরু হ'ল।"

এই অনাসৃষ্টি দূর করার জন্য কবি নবীনদের আহ্বান জানালেন। এই আহ্বানের ভিতরে সাহিত্যের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গীটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় —কেউ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে Socialist Realism-এর কাছাকাছি বলে প্রেরণা লাভ করতে চান তাকে বোধ হয় গাল দেওয়া চলে না। "যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে

ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করতে পারেনি, সাহিত্যে কলা-রচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানাভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ···বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের, সেই সমাজের আত্মরূপ সৃষ্টির বীজশক্তি।

"সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায় যাতে সে মনোহর হয়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্তি ধরে যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কাজ করতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে···যা আমাদের ভাল লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় সেই ভালো লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজ সৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।" (পঞ্চাশোর্দ্ধম্)।

ভবিষ্যৎ নূতন সমাজ সৃষ্টির কাজে সাহিত্যপ্রতিভাকে উৎসর্গ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নবীন সাহিত্যিকদের আহ্বান জানালেন। বাল্যাবধি যে বৃহত্তর মানবিকতার আদর্শ রবীন্দ্র মানসে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে গড়ে উঠেছিল এ তারই ন্যায়সংগত পরিণতি। এরই এক বছর আগে "সাহিত্য সমালোচনা" প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি, তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য প্রচার—মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়—তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা"। এই একই কবি যখন আবার বলেন, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, আনন্দ দেয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য নেই, তখন এই কথাগুলিকে আগের কথার সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে। মানুষের গৌরব মানুষের সকল সৃষ্টির মধ্যেই প্রতিভাত; মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, কলা, সাহিত্য সব কিছুর মধ্যেই এই একটি সাধারণ মিল রয়েছে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষের সকল সৃষ্টি সকল বিদ্যা মানুষেরই বিজয় গৌরব ঘোষণা করেছে। সাহিত্যের কাজ আনন্দ দেওয়া, কিন্তু তার এই সাধারণ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সে কাজ করা সম্ভব নয়। সমাজের সংগে সাহিত্যের যে সম্বন্ধ তা

মূলত এই গৌরবকে প্রতিফলিত করা, ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্ধিত করা, পথের বাধাকে অপসারিত করার সম্বন্ধ। কদর্য্যতার দিকটাও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তা এই সৌন্দর্য্য ও গৌরবকে আরও ভাস্বর করার জন্য। সাহিত্য তার বিশেষ কারুকর্মের ভিতর দিয়ে, বক্রোক্তি, অলংকার, ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে একাজটিই করে, তাই সে প্রকাশ পায় আনন্দরূপে; শৃঙ্গার, করুণ বীভৎস, ভয়ানক, রৌদ্র সব মিলিত হয় একটি আনন্দের স্বপ্রকাশ অনুভূতিতে। এখানে ম্যাকবেথ ও হ্যামলেটেরও অত্যুচ্চ স্থান আছে। মানুষের গৌরবকে অবমাননা করলে তার পরিণতি কি সুকঠোর, আর সেই অবমাননার বিরুদ্ধে দুর্বার সাহসে সংগ্রাম করতে না পারলে তার পরিণতি কি মর্মান্তিক—সেই রহস্য অপূর্ব কলাকৌশলের সাহায্যে উদ্ঘাটিত ক'রে ম্যাকবেথ আর হ্যামলেটও মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে আনন্দের প্রকাশ বেদনায় মধুর, কারণ ট্রাজেডি অন্তরাত্মাকে শুদ্ধ করার দাম দেয় বেদনার মধ্য দিয়ে।

তাই "আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই" সাহিত্যের এই নিতান্ত বৈশিষ্ট্যগত তত্ত্বটিকে যখন মানবিক মূল্যবোধহীন সাহিত্যিকরা কফিন-সাহিত্য সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে অনাসৃষ্টি শুরু করে, তখন কবিগুরুকেই রাশ টেনে ধরতে হয়, বলতে হয়—গোড়াঘাটের নোঙরটি ছিঁড়ে উধাও হয়ো না, জন্মাবধি মানুষের দুর্বার অগ্রগতির কথা ভুলো না, জড়প্রকৃতির উপর মানুষের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভাব জগতেও তার গৌরব দীপ্ত অভিযানের কথা ভুলোনা। "মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত।…কিন্তু সে পৃথিবী তার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ খায়নি, তাই আদিকাল থেকেই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে মানব বুদ্ধিকৌশলে আপন ইচ্ছানুগত মানবিক পৃথিবী করে তুলছে…উপকরণ পাচ্ছে এই পৃথিবীরই কাছ থেকে, শক্তি ধার করছে তারই গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। সেগুলিকে আপন পথে আপন মতে চালনা করে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়ে দিচ্ছে।…মানুষের বিশ্বজয়ের এই একটা পালা বস্তু জগতে; ভাবের জগতে তার আছে আর একটা পালা। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে একদিকে তার জয়স্তম্ভ, আর একদিকে শিল্পে সাহিত্যে। যে দিন থেকে মানুষের হাত পেয়েছে নৈপুণ্য, তার ভাষা পেয়েছে অর্থ, সেই দিন থেকেই মানুষ তার ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগৎ থেকে নানা উপাদানে উদ্ভাবিত করেছে তার ভাবগম্য জগৎকে…কল্পনা দিয়ে তাকে এমন রূপ দিয়েছে, হৃদয়

দিয়ে তাতে এমন রস দিয়েছে, যাতে সে মানুষের মনের জিনিষ হয়ে তাকে দিতে পারে আনন্দ" ( সাহিত্যের তাৎপর্য্য )। কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের—কোটেশন মার্ক না থাকলে মার্কস্ এঙ্গেলসের কথা বলেও মনে হতে পারতো।

সাহিত্যের আনন্দ, প্রকাশের আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ কোথায় ব্যাহত হচ্ছে, তুচ্ছ প্রয়োজন কোথায় এই আনন্দকে ব্যাহত করছে তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বার বার কেন নিঃসহায় দরিদ্রের উপর ধনীর লোলুপ শোষণের কথা উল্লেখ করছেন, উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁর ভাষায় অমন তীব্র আবেগ কেন সঞ্চারিত হচ্ছে, গম্ভীর সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাকালে এই শোষক-শোষিত দ্বিধা বিভক্ত সমাজের কথা বার বার কেন তার মনে আসছে, কলাকৈবল্যবাদীদের নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে হবে। কিন্তু এ উত্তর তারা দিতে পারেন না—বলবেন, রবীন্দ্রনাথ এক split-personality। কিন্তু রবীন্দ্রসাধনার আজন্ম ও আমৃত্যু অগ্রগতির ধারা যারা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করেছেন তাদের পক্ষে এর উত্তর খুব সহজ। মুষ্টিমেয় মুনাফালোলুপ ধনিকের হাতে মানব সমাজের সামগ্রিক গৌরব লাঞ্ছিত। সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দরস যে মূল ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ধনিক সভ্যতা সেই ভিত্তিটাকেই ভেঙে দিচ্ছে, তাই রসের ধারা শুকিয়ে যাচ্ছে, সাহিত্য বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়ে উন্মার্গগামিতার ভিতরে প্রকাশের পথ খুঁজছে।

রবীন্দ্রনাথ মার্কস্‌বাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি, মননধর্মী মানবিকতার আবেদন থেকে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের গভীর সম্পর্কও তিনি এদিক থেকেই বিচার করেছেন। আমাদের দেশের কাব্যশাস্ত্রের বিচারে এদিকটা প্রায় অনুপস্থিত। হয়তো বা সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্কটা স্ব-প্রতিভাত সিদ্ধান্ত বলেই অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। কিন্তু এর ফলে কাব্যশাস্ত্রের তত্ত্বালোচনা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে, অলংকার, রস, ধ্বনি, চমৎকারিত্ব, সাহিত্যের এই বিশেষ ধর্মগুলির আলোচনাতেই নিঃশেষিত হয়েছে। তার ফলে মাতৃভূমির সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্বের যোগসূত্রটা হারিয়ে গেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকায় একটা গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ উপাখ্যানের ভিতরে সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কের প্রশ্নটা একবার উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু তারপর

আঙ্গিক ও রসতত্ত্বের চাপে তলিয়ে গেছে। ব্রহ্মা নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন; ভরতমুনি তার প্রচারক। এই নাট্যবেদকে বলা হল পঞ্চমবেদ এবং সকল বেদের শ্রেষ্ঠ। কারণ, চতুর্বেদে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নেই, এই নাট্যবেদে সমগ্র জনসাধারণের সমান অধিকার। বিশ্বকর্মা রঙ্গমঞ্চ তৈরী করলেন, অভিনয় হবে। দানবরা এল রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে দিতে, তারা নাটক অভিনীত হতে দেবে না। ব্রহ্মা তাদের ডেকে পাঠালেন—কি তাদের আপত্তি? দানবরা উত্তর করল—দেবতাদের ইচ্ছায় আপনি নাট্যবেদ সৃষ্টি করছেন, সুতরাং তাদেরই স্বার্থে আমাদের চিত্রিত করা হবে কলঙ্কের দাগে। ব্রহ্মা বললেন, তোমাদের বা দেবতাদের কারুর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন পক্ষপাতিত্ব-মূলক ভাবনা কোন নাট্যে থাকবে না, ত্রিভুবনের সত্য ঘটনাই নাটকীয় ভাবনায় রূপান্তরিত হবে। লোকসমাজ-বৃত্তান্তের অনুকরণই হবে নাট্য। এই নাট্য ধর্ম, যশ, আয়ু, কল্যাণ, বুদ্ধি, ও লোকোপদেশ ধারণ করে আবির্ভূত হবে। কাজেই তোমাদের দুঃখ ও ক্রোধ অমূলক। (নাট্যশাস্ত্র ১।১০৩—১১৫) আশ্চর্য্যের কথা এই গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যানটির তাৎপর্য নিয়ে পরবর্তী কোনো কাব্যশাস্ত্রে আর আলোচনা হলনা। সমস্ত প্রশ্নটাই চাপা পড়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ প্রশ্নটি নাট্যশাস্ত্রের সূত্র ধরে উত্থাপিত করেননি। তাঁর নিজের সামাজিক ও সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ব-সাহিত্যের সমীক্ষা, সর্বোপরি তাঁর উদার মানবিকতা থেকেই এ প্রশ্ন আলোচনা করলেন। "সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব—মানুষের 'সহিত' থাকিবার ভাব—মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা···উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়" (সাহিত্যের উদ্দেশ্য)। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে অনুধাবণীয়, ১৩০১ সালের লেখা "সাহিত্যের গৌরব"। এখানে রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ডের দুই সাহিত্যরথীর আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ ও সাহিত্যের গভীর সম্পর্কের দিকটি আলোচনা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে উচ্চগ্রামের সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায়ের কথাটি যেভাবে আলোচনা করলেন তা আজকের দিনে নূতন করে ভাববার কথা; ইয়োরোপীয় সাহিত্যে আমাদের তুলনায় কেন এত অধিক অগ্রসর তার কারণ নির্ণয় করারও তিনি চেষ্টা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব-সমীক্ষার সামগ্রিক ফল হল রসতত্ত্বকে সমাজের

ভিত্তিতে, বৃহত্তম মানবিক ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকাগত উপখ্যানটিতে সাহিত্য ও সমাজের যে সম্পর্কের সমস্যাটি একবার মাত্র মুখ দেখিয়ে আঙ্গিকের তলায় তলিয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথ তাকে নূতন-যুগের নূতন ভাবনার ভিত্তিতে দাঁড় করালেন, প্রাচীন রসতত্ত্বকে সংস্কৃত ও পরিমার্জিত করে এক উন্নততর মানবিক ভূমিতে রসের ও সমাজের মিলন ঘটালেন। এ কাজ করতে গিয়ে উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বকেও, হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতসারে, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে আধুনিক ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের উপযোগী করে প্রকাশ করলেন। এই শেষের কথাটিতে অনেকের আপত্তি উঠতে পারে। অনেক জায়গাতেই একথা শুনতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা আর উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা একই জিনিষ। কিন্তু এ কথাটির ভিতরে একটা মস্ত বড় ফাঁক সৃষ্টি করেছে বাংলা ভাষার হ্রস্ব ই-কারটি। এই অক্ষরটি যাদুকর। একটুমাত্র স্থান বদল করে অর্থের ওলটপালট ঘটিয়ে দেয়। যদি বলি 'মানবিকতাই আধ্যাত্মিকতা'—মার্কস-বাদীরাও আপত্তি করবেন না, কিন্তু অলৌকিক আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী অনেকেই আপত্তি তুলবেন। যদি বলি আধ্যাত্মিকতাই মানবিকতা, অলৌকিক রহস্যবাদীরা খুসী হবেন, কিন্তু বস্তুবাদীরা আপত্তি করবেন। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে উপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না। 'মানব সত্য' প্রবন্ধটি যদি "মানুষের ধর্মের" সারাংশ হয়ে থাকে, তবে এই সত্য কোনো অলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির বাণী নয়, ইহলোকের মহা-মানবের পরম সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী। "অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা···এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন" (মানব সত্য)। কিন্তু এই বিশ্বমানবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসটা ছিল আধ্যাত্মিক ধরণের। একটা অকুণ্ঠিত বিনয়নম্র ভক্তির ভাব ছিল প্রবল। হয়তো তিনি বিশ্বমানবের ভিতরেই প্রকাশমান এক বিশ্বমানবিক আত্মাতেই

বিশ্বাস করতেন। কারণ, তিনি তাঁর বিরাট মানব-সত্যে পৌঁছেছিলেন স্বভাবসিদ্ধ মানব-প্রেম ও হৃদয়ের আবেগের ভিতর দিয়ে। এর ভিতরে অত্যুচ্চ মানবধর্মের সন্ধান পাওয়া গেলেও, ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি এ সত্যে পৌঁছাননি। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছাতে হবে কঠোর দুঃখ, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে এ স্থির প্রত্যয় তার কোনদিন এতটুকু শিথিল হয়নি। তাই তাঁর নিজের কথায় 'ফাল্গুনী' নাটিকার ব্যাখ্যা শুনলে চমকাতে হয়—"জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলেছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে" (আত্মপরিচয় পৃঃ ৬৬)। সোভিয়েট রাশিয়ার তীর্থভ্রমণের পর এই মানব-সত্যের আদর্শ হয়তো কবির কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর আগে এতো স্পষ্ট করে "মানব সত্যের" বক্তব্য আর কখনও তিনি তুলে ধরেন নি। তিনি সোভিয়েট সমাজের তত্ত্বের দিকটা গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু মানবিকতার দিকটা খোলামনে গ্রহণ করেছিলেন। মানবসত্যকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো সাহিত্য-তত্ত্ব নেই, রসতত্ত্ব নেই।

যখন মানবসত্যের অবগুণ্ঠিতা প্রজ্ঞাবাণীকে কবি স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন তখন তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার তরী 'সভ্যতার সংকট' পার হয়ে এসে ভিড়লো রূপ-নারাণের কূলে—

জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ—

# অতিশয়োক্তি ও কাব্য

ঠাকুর্দা নাতিকে গল্প বলছেন : একবার আমার ছোটবেলায় সে যে কী গরম পড়েছিল তোরা ভাবতে পারবি না। আমাদের গ্রামের পুরুতঠাকুর আর এক গ্রামে পূজো করতে গিয়েছিলেন। পূজো শেষ হতে দুপুর হয়ে গেল। যজমান বাড়ীর লোকেরা বলল, ঠাকুর আর বাড়ী যাবেন না। এ প্রচণ্ড রোদে ঘর থেকে বেরুলে আর বাঁচবেন না। ঠাকুরের কিন্তু বাড়ী ফিরে আসতেই হবে। জরুরী কাজ আছে। বাইরে একটিও জনমানব নেই, ঠাকুর একাই চলছেন। রোদের তাপে তাঁর হাত-পা-নাক-কান সব গলে গলে মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু সূর্য্যদেব ঠাকুরের টিকিটিকে কিছুতেই গলাতে পারল না। জোঁকের মত বুকে হেঁটে টিকিটি শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল। বাড়ীর লোকে দেখল দরজার চৌকাটের তলা দিয়ে একটা বড় জোঁক গলিয়ে আসছে। কাছে গিয়ে দেখতে পেল জোঁক নয়, ঠাকুরের টিকি। পুরুতের প্রাণ টিকির ভিতরেই কিছুক্ষণ ধুক ধুক করে নিভে গেল।

ঠাকুর্দার এই গল্পটিতে আলঙ্কারিকের অতিশয়োক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। অতিশয়োক্তি না হলে অলঙ্কার জমে না, অলঙ্কার না হলে কাব্যও জমাট বাঁধে না। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডী একটা দামী কথা বলেছেন—অতিশয়োক্তি সমস্ত অলঙ্কারের একমাত্র অবলম্বন। ইংরেজি figure of speech-এর চেয়ে সংস্কৃত 'অলঙ্কার' শব্দটি বোধ হয় বেশী সার্থক, কারণ এ শব্দটির মধ্যে এমন একটি প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনা আছে যা ইংরেজি প্রতিশব্দটিতে নেই। মেয়েদের অলঙ্কার একটি বাহুল্য বা আতিশয্য যা শোভাবৃদ্ধিতে সাহায্য করে; কাব্যকথায় অলঙ্কারও এমনি একটা আতিশয্য যা কাব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে সাহায্য করে।

এরিষ্টোটেল রাজনৈতিক বাগ্মীদের বাগবৈদগ্ধ্য শিক্ষা দেবার জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের অবতারণা করেন। অতিশয়োক্তি না হলে বাগ্মিতা দিয়ে বিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না, বক্তৃতার জৌলুস খোলেনা, শ্রোতার হাততালি

জোটেনা। সুতরাং এরিষ্টোটেলও দণ্ডীর মত অতিশয়োক্তিকেই তার অলঙ্কারশাস্ত্রের সার বলে ঘোষণা করতে পারতেন। দণ্ডীও বলেছেন, অতিশয়োক্তি হল 'বাগীশমহিতা উক্তি'—বাক্যাধীশদের বন্দনীয়া উক্তি। বৈষ্ণব কবিদের অনেক আগেই দণ্ডী তাঁর অভিসারিকাকে জ্যোৎস্না রাতে সাদা শাড়ী পরিয়ে অভিসারে পাঠিয়েছেন। সাদা মল্লিকার মালায় মাথা ঢেকে, শ্বেত চন্দন মেখে, সাদা শাড়ী জড়িয়ে গৌরী তন্বী অভিসারিকা পূর্ণিমারাতে অভিসারে চলেছে। কোনো অভিভাবক পুলিশ পাঠিয়েও এই অভিসারিকাকে ধরতে পারবে না, সে যে চন্দ্রালোকে একাকার হয়ে মিশে গেছে। পাঠক কিন্তু ঠিকই ধরতে পারবে, তার বৈষয়িক দৃষ্টির সামনে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাতেও কোনও অভিসারিণী সর্বশুক্লা হয়েও মিলিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু পাঠককে তার বৈষয়িক চোখটি বন্ধ রাখতে হবে, কাব্যদৃষ্টি উন্মীলিত করে এই বিচিত্র অতিশয়োক্তির রসটুকু উপভোগ করতে হবে।

সুতরাং সাহিত্যে অতিশয়োক্তি শুধু সহনীয় নয়, উপভোগ্যও বটে। অতি কঠোর বাস্তববাদী সাহিত্যিকও অতিশয়োক্তি ছাড়া এক কলম লিখতে পারবেন না। অকাল-প্রয়াত কিশোর কবি মাত্র আটটি ছোট্ট পঙক্তিতে নিরন্ন মানুষের ক্ষুধার যাতনাকে প্রকাশ করলেন। নিছক ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ঐ ছোট্ট কবিতাটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিই তো অতিশয়োক্তি—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ॥

সোজা কথাকে এত বাঁকাবার কি দরকার ছিল।' বললেই হত—'ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছি, তোমাদের কাব্যটাব্য শিকায় তুলে রাখ।, কিন্তু এ হলেও হবে না। 'শিকায় তুলে রাখ'—ওটাও তো কাব্যিক বাহুল্যই হল। কাব্যের বইগুলো সত্যিই তো আর রান্নাঘরের শিকায় তুলে রাখতে বলা হচ্ছে না। তবে বাহুল্য বর্জন করতে হলে কি বলতে হবে? কাব্যকে কবর দাও, আগুনে পুড়িয়ে ফেল? এতেও হল না। বাহুল্য রয়েই গেল। আর কবি যা বলতে চেয়েছেন তার কিছুই বলা হল না। কথাগুলিকে যতই সাদাসিদে আটপৌরে করার চেষ্টা করুন না কেন, কথার খোলটা অর্থের তুলনায় অনেক বড় হতে বাধ্য। যদি বলা যায় ক্ষুধার সময় কাব্যের ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ কর, কথাটা একদম বাস্তবধর্মী হল কি? কবির বক্তব্য কি ছিল, আর আমরা কোথায়

নেমে এসেছি সে বিচার এখন থাক। আমরা একান্ত একটা জৈব যাতনা কি ভাবে প্রকাশ করব সে কথাই ভাবছি। অনুভূতির তীব্রতা-প্রকাশকে নিতান্ত বাস্তবধর্মী করতে হলে ভাষার মাধ্যম পরিত্যাগ করতে হবে। আর্তনাদ, চীৎকার, ছটফটানি, মাটিতে গড়াগড়ি, ভাবপ্রকাশের এই আদিম জান্তব ভঙ্গীগুলোকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা মাটির কাছাকাছি পৌছব সন্দেহ নেই, তবে এহেন কবির জন্য কোন কবিগুরু কান পেতে থাকবেন না।

আধুনিক কবিতা চিত্রকল্পসৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বাস্তবধর্মী হতে চাইছে। মনে পড়ে কোথায় যেন কোন এক আধুনিক কবিতায় দ্বিতীয়ার চাঁদকে নারিকেল ফলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। বেরসিক পাঠক নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন—কবিরসনা কি নারকেল রসাস্বাদে অনেকদিন বঞ্চিত ছিল? জীবনানন্দ বলেছেন—'শিং-এর মত বাঁকা নীল চাঁদ।' কবি কি কোনদিন ষণ্ডরাজের শৃঙ্গাঘাতে কাতর হয়েছিলেন? না হলে বঙ্কিম চাঁদ দেখে বাঁকা শিং-এর কথা মনে পড়ল কেন? দিনেশ দাস কাস্তে হাতে ধান কাটেন নি। তবু বাঁকা চাঁদ দেখে তাঁর কাস্তের কথা মনে হয়েছে—'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে'। প্রাচীন কবিরা আকাশের চাঁদকে সুন্দরী রমণীর মুখ পর্যন্ত নামিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কবিরা তাকে নারিকেল ফলা, গরুর শিং, রুটি ও কাস্তে পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। এর মধ্যে নারকেল-ফলা ও গরুর শিং-এর চিত্রকল্প কবির ভাবনাকৃতির বৈচিত্র্যমাত্র। কিন্তু কাস্তে ও ঝলসানো রুটি শুধুমাত্র চিত্রকল্প নয়, বিবর্তিত সমাজ-চেতনার এক সুগভীর প্রতিচ্ছবি ব্যঞ্জনাবৃত্তি-বাহিত হয়ে চিত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইতরজনের বস্তুদৃষ্টিতে এই চিত্রকল্পগুলিতেও অতিশয়োক্তি রয়েছে—চাঁদ শিং বাগিয়ে গুতোতে আসেনা, কাস্তে হয়ে ধান কাটতেও যায়না।

চিত্রকল্প রচনায় সংস্কৃত কবি বাণভট্ট অদ্বিতীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বাঁধাধরা চিরাচরিত উপমামণ্ডলীও গণ্ডীরেখা তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে অনেকদূর অতিক্রম করে গিয়েছেন। এদিক থেকে বিচার করলে বাণভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যে **most unconventional poet** যেমন **most unconventional dramatist** হলেন শূদ্রক। অস্তগামী জীর্ণরশ্মি বৃদ্ধ সূর্যের গায়ে তিনি পারাবতের পায়ের পাটল রং মাখিয়ে দিয়েছেন—'পারাবত-পাদ-পাটলরাগো

রবিরশ্মিরতলাদলম্বত'। জীবনানন্দ দাস বাংলা কবিতার চিত্র বিতানে যে ধূসর রংএর আধিপত্য সৃষ্টি করেছিলেন, বাণভট্টের কাব্যে সেই ধূসরিমা আধিপত্যের দাবি করেননি, কিন্তু কখনো কখনো এমন একটি নিটোল আবহমণ্ডল সৃষ্টি করেছে যার মোহ পাঠককে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। রাত্রি শেষের আকাশে কয়েকটি পাণ্ডুর তারকা মাত্র অবশিষ্ট আছে, প্রভাত-কালীন নবজন্মের পূর্বে এই মৃত্যুবিলীন জরাগ্রস্ত আকাশের নিবিড় রিক্ততাকে বাণভট্ট প্রকাশ করলেন বৃদ্ধ পারাবতের ডানার ধূসরবর্ণে—'অল্পাবশেষপাণ্ডুতারকে জরৎপারাবতপক্ষধূসরে নভসি'। অসামান্য শব্দধ্বনির ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ সমাসগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের মত গড়িয়ে চলেছে, তারি মধ্যে ব্যঞ্জনাগম্ভীর অফুরন্ত চিত্রৈশ্বর্য্য ছড়িয়ে পড়েছে। কলমকে তুলির মত ব্যবহার করতে বাণভট্টের দোসর নেই। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম পাঠকসমাজকে দৃষ্টিদান করেছেন। আলঙ্কারিকদের অতিশয়োক্তি মূলে না থাকলে বানভট্টের এই চিত্রগুলিও কিন্তু ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হত না।

মনে হতে পারে আধুনিক কবি ও পাঠক বাহুল্যপক্ষপাতী নন। যন্ত্রনির্ভর সমাজ-জীবনে কাজের তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান মানুষের কাছে সাজের বাহুল্য বর্জনীয়, ভাষার আতিশয্যেরও সময় নেই। আমাদের প্রাচীন অট্টালিকাগুলিতে গম্ভীর স্তম্ভগুলি যে নিষ্প্রয়োজন সৌন্দর্যের আতিশয্য সৃষ্টি করত তাকে ছাঁটাই করে architecture এখন functional হয়ে উঠেছে। কাব্যসাহিত্যে ভাষা-ব্যবহারেও লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কলাদেবীও functional হয়ে উঠেছেন। সরস্বতী দেবী হলেও মহিলা। functional art পরিধান-কলায় প্রযুক্ত হয়ে fashionable মহিলাদের অঙ্গবাসকে প্রায় বক্ষোবাসে এনে দাঁড় করিয়েছে। দেবী সরস্বতীও এ যুগধর্মকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই সারস্বত-সজ্জাকেও যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। অবশ্য আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর পাঁচালী ও কড়চা এই নূতন সারস্বত বিধিকে মেনে নেয়নি। মেনে নিয়েছে বোধ হয় বাংলা কবিতা। এখন মনে হচ্ছে উচ্চাঙ্গ গণিতের ফরমূলা সাজিয়েও বোধ হয় কবিতা তৈরি করা সম্ভব।

যারা সব চেয়ে বৈষয়িক তাদেরই বোধ হয় বাহুল্য বর্জনে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ থাকা উচিত ছিল। ব্যবসায়ীদের মত বৈষয়িক বোধ হয় আর

কারুর নেই। কাজ হাসিল করার দিকে একাগ্র তাদের দৃষ্টি। কত অল্প খরচে কত বেশী কাজ হাসিল করা যায় এবিষয়ে তারা খুবই সতর্ক। তবু দেখুন সরকার যখন বিজ্ঞাপনের খরচ কমাবার প্রস্তাব করলেন তখন শুধু খবরের কাগজের মালিকরাই নন, শুধু বিজ্ঞাপনী এজেন্সীগুলিই নয়, মূল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও ঘোর আপত্তি তুলল। আপনার আমার কাছে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি কৌতুকাবহ বাহুল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বোর্ণভিটার মালিক চান আমরা যেন বোর্ণভিটা কিনে খাই। খবরের কাগজে একদিন একটা অনুরোধজ্ঞাপক নোটিস দিলেই চলত। কিন্তু কাগজের অর্দ্ধেক পাতা জুড়ে কি বিপুল কাণ্ড। দুটো চাকার উপর একটা বোর্ণভিটার পিঁপা দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক পালোয়ান। এক হাতে কাপ থেকে গরম ধোঁয়া উড়ছে। আর এক হাতে চারটা লাগাম দিয়ে দূরে চারটা মহাতেজী বেয়াড়া ঘোড়াকে বাগ মানাচ্ছে। এই অতিশয়োক্তির তাৎপর্য কি? —বোর্ণভিটা কিনে খাও। এই বিজ্ঞাপনবাগীশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বোধ হয় আমাদের প্রাচীন পূর্বমীমাংসক দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। পূর্বমীমাংসা-দর্শনে বিধি আর অর্থবাদ নিয়ে প্রকাণ্ড বিচার চলেছে। বিধি মানে কোন কার্য্যে প্রবৃত্তিজ্ঞাপক বৈদিক নির্দেশবাক্য—যেমন, বায়ু দেবতাকে শ্বেত ছাগ বলি দাও। এটাই আসল বক্তব্য। এই বিধিবাক্যগুলিই স্বতন্ত্র প্রামাণিক বাক্য। তারপর আছে বায়ুদেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনামুখর মন্ত্রবাক্য। এই স্তুতিমাহাত্ম্যময় মন্ত্রবাক্যগুলিকে বলা হয় অর্থবাদ। এখন বিচার চলল, এই অর্থবাদ-বাক্যগুলি প্রমাণ কি অপ্রমাণ? পূর্বপক্ষ বললেন, এগুলির প্রামাণ্য নেই। কারণ, এদের মধ্যে অনেক আজগুবি, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, পরস্পর-বিরোধী অতিশয়োক্তি আছে। উত্তরপক্ষ সিদ্ধান্ত করলেন—এই অর্থবাদ বাক্যগুলির স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নেই একথা ঠিক, তাই বলে এগুলি অপ্রমাণ নয়। বিধিবাক্য-নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত করতে এই অতিশয়োক্তিগুলি সাহায্য করে। তাই বিধিবাক্যের সঙ্গে একার্থতা-প্রাপ্তির দ্বারা অর্থবাদ-বাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার করা যেতে পারে। বিধিবাক্যই প্রধান। চাপরাসীর চাপরাসে যেমন মালিকেরই মহিমা প্রতিফলিত হয়ে চাপরাসীকেও কিছুটা মর্যাদা দান করে, অতিশয়োক্তিরূপী অর্থবাদ-বাক্যও তেমনি স্বপ্রধান বিধি-বাক্যের মাহাত্ম্য থেকে কিছুটা গৌরব ধার করে প্রামাণ্য লাভ করে।

তাহলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি অতিশয়োক্তি হলেও নিতান্ত নিষ্প্রমাণ ও নিরর্থক নয়। মালিকের পণ্য বিক্রয়ের সহায়ক বলে—'বোর্ণ ভিটা কিনুন' এই আসল বিধিবাক্যটির সঙ্গে একার্থতা বা একবাক্যতা লাভ করে অর্থবাদরূপী বিজ্ঞাপনটি বাহুল্যও সার্থকতা লাভ করেছে। পূর্ব-মীমাংসা-প্রদর্শিত বৈদিক অর্থবাদ-বাক্যই কি বর্তমান যুগে ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনরূপে অবতীর্ণ হয়েছে?

আমাদের দেশের ব্যঞ্জনাবাদী আলঙ্কারিকরা মীমাংসকদের কাব্যরসানভিজ্ঞ বেরসিক বলে তিরস্কার করেছেন। এতটা তিরস্কার হয়ত এদের প্রাপ্য নয়। কারণ অর্থবাদের প্রামাণ্য মেনে নিয়ে মীমাংসকরা কাব্য-সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গির মূল মাহাত্ম্যটি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। কাব্য-সাহিত্যের রস-অলঙ্কার-ধ্বনি এ সবই কিন্তু এক অর্থে অর্থবাদের খেলা। রাস্তায় নিরন্ন ভিখারীর কান্নাকে বিদগ্ধজন করুণরসের অভিব্যক্তি বলবেন না। ভিখারীর কান্না সাহিত্যের পাতায় কথার সাজে সাজলে তবেই রসিক সুজন রসাস্বাদ করবেন। রসিকের আবদার বড় বেশী। পরের দুঃখকেও তিনি আনন্দরূপে উপভোগ করতে চান। অর্থাৎ বস্তুসত্য স্বরূপে উপস্থিত হলে রসিকের রস-ভঙ্গ হবে। সত্যকে অভিনয়ের সাজ পরতে হবে, কথার বিনুনি বুনতে হবে, শোককে শ্লোকের ঘটা দিয়ে ঢাকতে হবে, তবেই শোক রসরূপে প্রকাশ পাবে। রসবাদী আলঙ্কারিকের মতে অলঙ্কার মূলতঃ রসকেই অলঙ্কৃত করে, কারণ পরোক্ষভাবে রস-প্রকাশে সাহায্য করাই অলঙ্কারের কাজ। সুবর্ণালঙ্কার আসলে শরীরকে সাজাবার জন্যই ব্যবহৃত হয় না, সুন্দরী গরবিণীর হৃদয়ের গৌরববোধ চরিতার্থ করার জন্য, তার হৃদয়কে সাজাবার জন্যই ব্যবহৃত হয়। আলঙ্কারিক অবশ্য গম্ভীরভাবে বলেন—লৌকিক অনুভূতির আস্বাদনযোগ্য অলৌকিক অনুভূতিরূপে যে প্রকাশ তারই নাম সাহিত্যরস। এতো সহজকে গম্ভীর করার চিরাচরিত পণ্ডিতী কৌশলমাত্র। মানুষের হাসি-কান্নাকে ঘর-সংসারের গণ্ডী থেকে রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জায় টেনে আনা হল, ভাষার জৌলুসে ঘিরে কবিতার পাতায় ঠাঁই দেয়া হল। এত সেই বোর্ণ-ভিটার বিজ্ঞাপন। মানুষ হাসে কাঁদে—এই সহজ বস্তুসত্যটিকে ফ্যাশনের পোষাকে পল্লবিত করে প্রকাশ করা হল। সাহিত্য তাহলে অনাড়ম্বর

সত্যের সাড়ম্বর বিজ্ঞাপন—পূর্বমীমাংসার অর্থবাদের প্রকারান্তর। ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিক মনে করেন সাহিত্যে ব্যঞ্জনাবৃত্তির মাধ্যমে অনুক্ত বহু অর্থকে স্বল্পোক্তিতে প্রকাশ করা সম্ভব। সুতরাং ধ্বনি অতিশয়োক্তির প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক। ভরতনাট্যমের মুদ্রার মত শুধু ইঙ্গিতে, স্বল্পভঙ্গীতে ভাব-রাশিকে রস-সমুদ্রে পরিণত করে। ধ্বনির চূড়ান্ত পরিণতি প্রতীকী প্রকাশে এবং প্রতীকী প্রকাশের শেষ কথা গাণিতিক ভাষা—যেখানে ভাষার আর দরকার নেই, শুধু প্রতীক দিয়েই সব কিছু প্রকাশ করা চলে। হে অঙ্ক, কথা কও! ধ্বনিবাদকে প্রতীকবাদে রূপান্তর করলে, প্রথম ধরুন, বিশ্বশান্তির জয়যাত্রা বোঝাবার জন্য কাব্যনাটক-উপন্যাস সভা-সমিতি-বক্তৃতা ইত্যাদি সব কিছু বাদ দেয়া যেতে পারে—মাটিতে লুটিয়ে পড়া একটা হায়েনা বা বাঘের মাথায় একটি ডানামেলা পায়রা বসিয়ে দিন। তবু রং তুলি ইত্যাদির আতিশয্য বাদ দিতে হবে। তাই এখন গণিতের শরণ লউন। পায়রা বোঝাবার জন্য p ব্যবহার করুন, হায়েনা বোঝাবার জন্য h, এখন p/h মানে সভ্যতার কাছে হিংস্রতার পরাজয়। আমি অঙ্ক একেবারে জানিনা বলে এমন কাঁচাভাবে কথাটা বললাম। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সভাপতিত্বে mathematical logician-দের একটা কমিটি তৈরী করে তাদের উপর ভার দিন—মানুষের স্থূল ভাষা বাদ দিয়ে অশরীরী গাণিতিক প্রতীকে কিভাবে সূক্ষ্ম সাহিত্যিক রস থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব সে কায়দা তাঁরা বাতলে দেবেন। এডিংটন বলেছেন, বিশ্বের মূল সত্তা এক অসীম অনন্ত গণিত-মানস বা mathematical mind, যা বিশ্বাকারে বিবর্তিত হচ্ছে; সুতরাং গণিতের ফরমূলা ও সমীকরণ দিয়ে এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশ করা অন্ততঃ theoretically সম্ভব। একাজ করতে পারলে আনন্দবর্দ্ধনের আত্মা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করবে, কারণ তাঁর ধ্বনিবাদের এই চরম বিস্ময়কর সার্থকতা তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি।

কিন্তু একাজ যে পর্যন্ত আমরা করতে না পারি সে পর্য্যন্ত ধ্বনি-কাব্যেও অতিশয়োক্তি থাকতে বাধ্য। কারণ মানুষের ভাষাটাই হল অতিশয়োক্তি। আমাদের দেশের বৌদ্ধ দার্শনিকরা এ কথাটা খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন। উৎসববিশেষে ইংলণ্ডের রাণীর গাউনের পিছনে প্রায় আধ ফার্লং লম্বা একটি পুচ্ছ থাকে, রাজকীয় কুটুম্ব-নারীগণ এই পুচ্ছের ভার বহন করে রাণীর পিছনে

মিছিল করে চলেন, তারা বোধ হয় রাণীকেই স্পর্শ করছেন ভেবে কৃতার্থ বোধ করেন। আমরাও বস্তুসত্যকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাষার পোষাকে জড়িয়ে নিয়ে তারপর সাহিত্যিকদের হাতে ছেড়ে দিই, তাঁরা রাজকীয় দর্জির মত ভাষার পুচ্ছটি যথেচ্ছ লম্বা করে তৈরী করেন। আমরা সবাই মিলে এই পুচ্ছটি বহন করি, আর এই ভেবে কৃতার্থ বোধ করি যে আমরা বস্তুসত্যকেই স্পর্শ করে চলেছি। বৌদ্ধাচার্য্যরা বলেন—সাহিত্যিকের ভাষা ত দূরের কথা, সংক্ষিপ্ত আঁটসাট আটপৌরে সাধারণ মানুষের ভাষাও কখনও বস্তু-সত্যকে স্পর্শ করতে পারে না। ক্ষণিক বস্তুসত্তাই হল একমাত্র বস্তুসত্য, যার পারিভাষিক নাম 'স্বলক্ষণ'। ভাষার দ্বারা একে প্রকাশ করা যায় না। সমাজজীবনে একের ভাব অন্যকে বোঝাবার জন্যই ভাষার ব্যবহার। কিন্তু এক মানুষের অন্তরের ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপী ভাবটি অন্য মানুষের অন্তরে থাকতে পারে না, যেমন আমার আপনার দুজনেরই দন্তশূল থাকলেও আমাদের দন্তশূল দুটি আলাদা, বেদনাবোধ দুটিও আলাদা, আমাদের উভয়ের আর্তনাদ দুটিও আলাদা। সুতরাং খাঁটি **আমার** ব্যথাটি **আপনাকে** বুঝাব কি করে? আমরা একে অন্যকে জানতেও পারিনা, বুঝতেও পারিনা। আমরা প্রত্যেকে এক একটি অসাধারণ সত্তা, আমাদের মধ্যে সাধারণ বলে কিছুই নেই। তাই ভাষা প্রকাশ করে এমন একটি সাধারণ অর্থ যা বস্তুজগতে কোথাও নেই। ভাষার এই বস্তুসম্পর্কহীন সাধারণীকৃতিকে মিথ্যাই আমরা সত্যস্পর্শী বলে মনে করি। ভাষা কেবল বিমূর্ত সাধারণ বিকল্প সামান্যকেই প্রকাশ করতে পারে—ইংরেজী তর্জমা করলে দাঁড়ায় Language can communicate only linguistic fictions। ভাষার দৌলতে আমরা এই fiction-এর জগতে ঘুরে মরি অথচ মনে করি আমরা সত্যের স্বাদ পাচ্ছি। অসাধারণকে সাধারণ করার এই মিথ্যাচার সাহিত্যকর্মের সব চেয়ে বড় ধর্ম, কারণ আলঙ্কারিকরা সাহিত্যের কপালে সাধারণীকৃতির তিলকটা খুব ঘটা করে এঁকে দিয়েছেন।

কিন্তু বৌদ্ধদের পক্ষে মুস্কিল হ'ল এই যে ভাষার দ্বারা সত্যার্থ প্রকাশ করা যায় না এই সত্যটি প্রকাশ করার জন্য তাঁদের কয়েক শত বই লিখতে হয়েছে। তাঁদের এই স্বসিদ্ধান্ত-বিরোধী ব্যবহার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। সব কিছুই ক্ষণিক এই ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁরা

বহুযুগস্থায়ী মঠ ও বিহার তৈরী করেছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট খুব রসিক লোক ছিলেন, বৌদ্ধদের স্ববিরোধী ব্যবহার উল্লেখ করে তিনি চমৎকার একটি শ্লোক লিখলেন—

'নাস্ত্যাত্মা ফলভোগমাত্রমথ চ স্বর্গায় চৈত্যার্চনং
সংস্কারাঃ ক্ষণিকা যুগস্থিতিভৃতশ্চৈতে বিহারাঃ কৃতাঃ।
সর্বং শূন্যমিদং বসূনি গুরবে দেহীতি চাদিশ্যতে
বৌদ্ধানাং চরিতং কিমন্যদিয়তী দম্ভস্য ভূমিঃ পরা॥'

—ক্ষণিক বিজ্ঞানধারার অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নাই, অথচ পরলোকে স্বর্গফল ভোগ করার জন্য চৈত্যমূলে পূজার্চনা করা হয়। সব কিছুই ক্ষণিক সংস্কারমাত্র, অথচ বহুযুগস্থায়ী বিহার নির্মাণ করা হয়েছে। সব কিছুই শূন্য, কিন্তু গুরুকে ধনদৌলত দান কর, এ আদেশটি শিষ্যকে ঠিকই দেয়া হয়ে থাকে। এই চূড়ান্ত ভণ্ডামি ছাড়া বৌদ্ধদের চরিত্র আর কি হতে পারে। জয়ন্তভট্ট শেষের দিকে একটু কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। আমরা তা করব না। শুধু এটুকু বলব—ভাষার মাধ্যমে সত্যার্থ প্রকাশ করা যায় না, এই পরম সত্যটি প্রকাশ করার জন্য কয়েক শ' বই না লিখে একেবারে শূন্য-সিদ্ধিতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকাই বৌদ্ধদের উচিত ছিল।

উক্তি মাত্রই অতিশয়োক্তি বৌদ্ধদের এই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমূহ বিপত্তি দেখা দেবে, প্রত্যেকটি মানুষের মুখে কাপড় গুঁজে চারদিকে এক একটি দেয়াল তুলে দিতে হবে। নইলে প্রত্যেকটি মানুষই মিথ্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত হবে। অথচ আশ্চর্য্য, বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষ কাব্যনাটক পর্য্যন্ত লিখে ফেললেন। আমরা প্রসঙ্গটা আরম্ভ করেছিলাম ঠাকুর্দার গল্পের অতিশয়োক্তি দিয়ে। কোনও সাহিত্যিকের হাতে পড়লে এগল্পটি বেশ রসাল হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় অসাহিত্যিক সাধারণ লোকও সার্থক অতিশয়োক্তি সৃষ্টি করে থাকেন। কোন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন সুরু হবে। তখন ভারত সরকার প্রত্যেক প্রদেশে জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা পেশ করেছেন। আমাদের আলোচ্য প্রদেশটিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও কাজ তখনও কিছুই এগোয়নি। বিপক্ষদল মন্ত্রীদের নির্বাচনে ঘায়েল করতে চান। এক মন্ত্রীকে নিয়ে এক রসাল গল্প প্রচলিত হল—মন্ত্রীমহোদয় বক্তৃতা দিচ্ছেন—'সমবেত সভ্যবৃন্দ,

আপনারা জানেন আমরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারিনি বলে বিরোধী পক্ষ আমাদের কঠোর সমালোচনা করছেন। কিন্তু আমরা বিরোধী পক্ষকে জিজ্ঞাসা করছি—দুধ থেকে মাখন তুলে নিলে দুধের কি থাকে? অসার জল মাত্র! আমাদের প্রদেশের জল থেকে বিদ্যুৎ শক্তি তুলে নিলে শক্তিহীন জলমাত্র পড়ে থাকবে। ভেবে দেখুন বিরোধী পক্ষ কত বড় দেশদ্রোহী চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁরা আমাদের সমস্ত জলসম্পদকে নিবীর্য্য দুর্বল করে দিতে চান। এই চক্রান্ত সম্পর্কে আপনারা হুঁসিয়ার থাকুন।' এজাতীয় গল্পে নির্বাচনী যুদ্ধের তীব্রতা ও তিক্ততার মধ্যেও একটু রসিকসুলভ মেজাজের সৃষ্টি করে। মীমাংসাশাস্ত্র কথিত অর্থবাদের এ এক নবীন সরস সংস্করণ। এই গল্পটির কোনও স্বতন্ত্র প্রামাণ্য বা সত্যতা নেই। বিরোধী পক্ষ বলতে চান—মন্ত্রীরা মূঢ়। এজন্য বহু যুক্তিতর্কের মধ্যে এই গল্পটিও চালু করে দিলেন। গল্পটি লোকে বিশ্বাস করবে এ তাঁদের ধারণা নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মন্ত্রীদের মূর্খতা প্রতিপাদনের জন্য এ এক সরস অতিশয়োক্তি যা শ্রোতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস না করেও উপভোগ করেন। পূর্ব-মীমাংসকগণ বিধি ও অর্থবাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তার একটা গভীর লৌকিক তাৎপর্য রয়েছে। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের লৌকিক প্রসঙ্গ থেকে সমাজের লৌকিক প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধটি টেনে আনলে তার তাৎপর্য্য বোঝা যায়। তাৎপর্য্যটি এই যে সত্যার্থপ্রকাশের বাহন হিসাবে ভাষার সার্থকতা বিচার করতে হলে শব্দ এবং অর্থ উভয়কেই সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। সত্যের স্বরূপ সামগ্রিক, অর্থস্বরূপ সামগ্রিক, শব্দস্বরূপও সামগ্রিক। পূর্ণতাই সত্য এই ঔপনিষদিক সিদ্ধান্ত উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। বাক্যার্থ-বোধের বিচারে এই অখণ্ডার্থ উপলব্ধি করা সহজ। 'বৃষ্টি পড়ছে'—এই বাক্যটির অর্থ এবং শব্দ বিশ্লেষণ করে আপনি বলতে পারেন—বৃষ্‌ ধাতু, তি প্রত্যয়, প্রথমা বিভক্তি, পড়্‌ ধাতু, ছে প্রত্যয়—এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যোগ করে একটি বাক্য তৈরি হয়েছে, এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অর্থগুলো যোগ করে একটি বৃহৎ অর্থ তৈরি করা হয়েছে। এজাতীয় অর্থ-নির্মাণ ও বাক্যনির্মাণ পদ্ধতি বৈয়াকরণের বৈঠকখানায় প্রচলিত থাকতে পারে। কিন্তু নির্বোধ বালক বা প্রাজ্ঞ পণ্ডিত বস্তুজগতে বাক্যার্থ উপলব্ধির সময় এজাতীয় বিশ্লেষণী নৈপুণ্যের মারফত অর্থগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ বাক্য

ও অর্থ আমাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে পাটিগণিতের যোগফল নয়। একটি সমগ্র বাক্যের সমগ্র একটি অর্থ আমরা একটি মানসিক প্রযত্নের দ্বারা অখণ্ড ভাবেই গ্রহণ করে থাকি। কর্তা, কর্ম, অধিকরণ, উদ্দেশ্য, বিধেয়, বিশেষ্য-বিশেষণ, ধাতু, শব্দরূপ, প্রত্যয় ইত্যাদি বিশ্লিষ্ট রূপগুলির সংশ্লেষণের দ্বারা যদি পদে পদে অর্থাহরণ করতে হত তাহলে সমাজ-জীবন একদিনে অচল হয়ে পড়ত। বৃষ্টি পড়া একটি ঘটনা যা বৃষ্টি-রূপী কর্তার সঙ্গে 'পড়া' ধাতুর অর্থযোগ করে তৈরী হয়নি। অপণ্ডিতের সহজ সামগ্রিক অর্থবোধকে পববর্তীকালে পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করেন এবং মনে করেন যে বোধবিধৃত অর্থটিই বোধ হয় সংশ্লিষ্ট অংশগুলির যোগফল রূপে তৈরী হয়েছে। 'নীল শাড়ীটা নিয়ে আয়' বললে 'নীলরূপ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট একটি তন্তু-বিন্যাসময় পরিধেয় বস্তু আমাকে আনতে বলা হল' এই মনে করে আপনার মেয়েটি শাড়ী আনতে ছুটবে না। পণ্ডিতেরা অনেক সময় নিজেদের চাতুর্য্যের দ্বারা নিজেরাই প্রতারিত হন, বিশ্লেষণী প্রতিভার দ্বারা অখণ্ডকে খণ্ডিত করেন আর মনে করেন ইঁটের ওপর ইঁট চাপিয়ে ইমারত তৈরির মত খণ্ড খণ্ড শব্দার্থ জোড়া দিয়েই একটি সমগ্র শব্দার্থ তৈরী হয়ে থাকে। যদি বলা হয় অর্থবোধের সময় আমরা খণ্ডগুলিকে খুঁজে পাইনা কেন, অনুভব করিনা কেন, তাঁরা উত্তর দেন, 'আছে বুঝতে পারছনা। ন্যায় ব্যাকরণ পড়লে বুঝতে পারবে।' অনেকটা 'চিকিৎসা-সংকটের' কবিরাজ মহাশয়ের 'হয়, Zানতি পারো না' গোছের উত্তর হল।

পাণিনি ব্যাকরণের দার্শনিক সম্প্রদায় কিন্তু এ বিষয়ে খুবই স্পষ্টবাদী। তারা স্পষ্ট বলে দিলেন—বাক্যের অখণ্ড রূপ এবং অর্থের অখণ্ড রূপটাই সত্য। খণ্ডাংশগুলি এই অখণ্ড সত্তাকেই অভিব্যক্ত করে মাত্র। অংশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা সত্য নয়, সামগ্রিক সত্যের প্রকাশে অংশগ্রহণ করে বলেই অংশগুলির সার্থকতা। আধুনিক ভাবনায় সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ নির্ণয়ে এই সমগ্রতাবাদ অধিক প্রযোজ্য। সামাজিক চিন্তা চেতনা ও কর্মে অংশ গ্রহণ করেই ব্যক্তিসত্তা সার্থকতা লাভ করে। সামাজিক সম্বন্ধের দ্বারাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং কতগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তির যোগফল হিসাবে সমাজ গড়ে ওঠেনি। বাক্যার্থ বিচারে পাণিনীয় সমগ্রতাবাদ 'পূর্ণতাই সত্য' এই ঔপনিষদিক সিদ্ধান্তের প্রতিফলিত রূপান্তর মাত্র। সমগ্রতাকে

অস্বীকার করলে বাক্যার্থবোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে—ধরুন 'আকাশকুসুম নাই' একটি বাক্য। এখানে খণ্ডার্থ যোগ করে সমগ্র অর্থটি নির্মাণ করার চেষ্টা করে দেখুন প্রথম ধরুন 'আকাশকুসুম' শব্দটির একটি আলাদা অর্থ আছে। এই অর্থটি কি নাই? অর্থ যদি আছেই তবে নাই বলছেন কাকে? আর অর্থই যদি নাই, তবে 'নাই' ক্রিয়ার কর্তা কে?। আকাশকুসুম শব্দটির অর্থ না থাকলে সমগ্র বাক্যটিই তো নিরর্থক হয়ে পড়বে। অথচ এর স্পষ্ট অর্থ তো আমরা অনুভব করি। যদি বলেন আকাশকুসুম শব্দটির একটি মানসিক ধারণাগত অর্থ আছে, কিন্তু সে অর্থটি বাইরে নাই, তাহলেও আকাশকুসুম 'নাই' ক্রিয়ার কর্তা হতে পারে না, কারণ বুদ্ধিগত ধারণাটা সত্যিই আছে। যদি বলেন 'ধারণা ব্যতিরিক্ত বস্তুস্বরূপ নাই' বিপদ আরও বেড়ে যাবে, কারণ যা নিঃস্বরূপ তা ক্রিয়ার কর্তৃত্বস্বরূপ লাভ করতে পারে না। তাই কর্তা নিঃস্বরূপ হলে 'নাই' এই ক্রিয়াপদটি নিরর্থক। এইরূপে 'বইটি আছে' বা 'বইটি নাই' প্রভৃতি যে কোন বাক্যকে বিশ্লেষণ করে দেখানো সম্ভব যে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করলে সমগ্র বাক্যার্থটি ব্যর্থতায় বিলীন হয়ে যাবে। এই জটিল কুটিল তর্ক তর্কের খাতিরেই করা হচ্ছে না। এ কথাটাই দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমাদের বুদ্ধির সহজ স্বভাব সমগ্রতামুখী। খণ্ড-সত্যবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাই বিপদে পড়ে বললেন, 'A does not exist' এই বাক্যটির কর্তা A কোনো না কোনো রকমে অবশ্যই আছে, না হলে বাক্যের কর্তা হ'ল কিরূপে? আমরা কিন্তু সমগ্রতা-বাদী পাণিনীয় দর্শন অনুসারে বলতে পারি—আমাদের অনুভব-ধৃত বাক্যার্থটি সমগ্র অখণ্ড। এ অখণ্ডতা আপামর পণ্ডিতজনের অনুভবসিদ্ধ। পণ্ডিতের পরিতৃপ্তির জন্য এই সামগ্রিক বোধকেও বিশ্লেষণ করে পাণ্ডিত্য প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু সে প্রচেষ্টা থেকে সম্প্রতি আমাদের বিরত থাকতে হবে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের দ্বারা শিশুমানসেও সমগ্র বাক্যার্থবোধ কিভাবে জাগ্রত হয় সে বিষয়টি কুতূহলী গবেষকের অনুসন্ধিৎসার উপযুক্ত লক্ষ্য হতে পারে।

ভাষা মানুষের যৌথ সমাজ-জীবনের সব চেয়ে সার্থক অভিব্যক্তি। ভাষা ছাড়া সমাজ এক মুহূর্তে অচল হয়ে যেত, দণ্ডী বলেন—জগত অন্ধকারে ডুবে যেত। ভাষা ও অর্থের এই পূর্ণতাগ্রাহী অনুভূতি সমগ্রতাসন্ধানী মানব-

সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার প্রতিচ্ছবি। খণ্ডিত সমাজকে অখণ্ড রূপ দেবার সাধনা মানুষের সহজাত স্বভাব। ভাষার জগতে মানুষ সমান অর্থের অংশীদার, তাই মানুষ মানুষকে চেনে, জানে, বোঝে। আপন ছোট্ট পরিবারে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে তখন পারিবারিক স্নেহ-বন্ধন সমার্থবাহী ভাষার বন্ধনে অভিব্যক্ত হয়ে নিবিড় পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের ভাষার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান দার্শনিকরা গবেষণা করছেন, আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিকরাও গবেষণা করেছেন। আমাদের দেশের শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণ-দার্শনিক সম্প্রদায় বাক্যর্থেবোধের মধ্যে যে পূর্ণ অদ্বৈত সংহতি আবিষ্কার করেছেন তাকে আধুনিক সমাজ-চেতনায় প্রসারিত করা সম্ভব। এই প্রসারণা কোনও কষ্টকল্পনা নয়। কারণ ভাষা-বোধের স্বভাব মূলতঃ সমাজেরই স্বভাব। সমান ও সমগ্র অর্থবোধের ভিত্তিতে মানুষকে মানুষের কাছে টেনে আনার জন্যই সমাজে ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ভাষা যদি মানুষকে দূরে ঠেলে দেবার কাজে প্রযুক্ত হয় তবে সে নিশ্চয়ই ভাষার চরম অপব্যবহার, তার মৌলিক স্বভাব ও উদ্দেশ্যের ব্যভিচার। আমরা আশা করব দেশে দেশে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাবার কাজে ভাষার যে অপব্যবহার তা মানুষের সাময়িক স্বধর্ম-বিচ্যুতি মাত্র। এ বিচ্যুতি স্থায়ী হতে পারে না।

আধুনিক খণ্ডকবিতা অন্যদিক থেকে এ বিচ্যুতি ঘটাচ্ছে। অনেক বাংলা কবিতা পড়লেই মনে হয় কবির কাছে পাঠকের উপস্থিতি অবান্তর। কবি আপন মনে ভূততাড়ানী মন্ত্র পড়ে যেন বাগ্‌দেবীর ভূত তাড়াতে ব্যস্ত হয়েছেন। শুধু কষ্টকল্পিত প্রতীক ব্যবহারই নয়, প্রতীকী চিত্রগুলির পূর্বাপর সংহতি ও সঙ্গতিহীন সন্নিবেশ একটি পূর্ণ সমগ্র অর্থগ্রহণে বাধা জন্মায়। অতিশয়োক্তি-বর্জন বাতিকে পরিণত হলে অর্থব্যভিচারী প্রতীকী আতিশয্য সরস্বতীর শ্রাদ্ধের মন্ত্রের মত শোনায়। কাব্যসাহিত্যে অতিশয়োক্তি অপরাধ নয়, যদি মূল বক্তব্যের সঙ্গে তা একার্থতা ও একবাক্যতা লাভ করে। আধুনিক প্রতীক-কাব্য বাহুল্যবর্জনের তপস্যা করছে একথা একেবারে ঠিক নয়। তারা অর্থবহুল বাহুল্য পরিত্যাগ করে অনর্থবহুল দীর্ঘায়ত প্রতীক ও চিত্রাতিশয্যের আশ্রয় নিয়েছে। আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সার্থক কবি জীবনানন্দ দাস। তাঁর অত্যাশ্চর্য্য শব্দের যাদু ও চিত্রের

মোহ পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে, কিন্তু তবু এহেন শক্তিধর কবির বিখ্যাত কবিতা 'হাওয়ার রাতে'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নেয়া যাক—

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ !
কাল এমন আশ্চর্য্য রাত ছিল।

আশ্চর্য্য রাতের বিশাল আকাশের জ্বলজ্বলে চিত্র আঁকতে গিয়ে বেবিলনের রাণীর ঘাড়টাকে চিতার চামড়ায় জড়িয়ে নিরীহ পাঠকের বুদ্ধিকে চিতায় চড়াবার কি খুবই প্রয়োজন ছিল ?

অতি আধুনিক কবি এরকম বাড়াবাড়ি করেন না, তবে যেদিকে তাঁরা বাড়াবাড়ি করেন তার চেয়ে জীবানানন্দের এই বাড়াবাড়ি অনেক বেশী সহনীয়। আধুনিক কবি যখন কবিতার মধ্যে সোজাসুজি উচ্চাঙ্গ গণিতের কয়েকটি ফরমূলা বসিয়ে দেন :

···বলা যাবে মিলিয়নে, বিলিয়নে···ইত্যাদি ইত্যাদি
তিনগুণ দশের শক্তি চুয়াত্তর হলে যত পরমাণু ধরে
তাদের বিভাগ্য শক্তি, ক্ষমতায়, যা কেবল শুধু
$E=MC^2$-এর সীমা জানে,···

তখন ব্যাপারটা খুবই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সত্যিই গণিত হলে মা সরস্বতী চমকাবেন না, কারণ তিনি গণিত-বিদ্যারও দেবতা। কিন্তু গণিতও নয় কবিতাও নয়—এ কেমন রূপ ? এতো মা সরস্বতীর শ্রাদ্ধের মন্ত্র !

বাংলা উপন্যাসের মেদবাহুল্য কমিয়ে দিয়ে, বাংলা কবিতায় বাণভট্ট ও রবীন্দ্রনাথের অতিশয়োক্তিকে ফিরিয়ে আনলে সরস্বতী বোধ হয় আমাদের মত ইতরজনের ঘরে আবার বেঁচে উঠবেন।

# সাহিত্য ও সাদৃশ্য

'সহিত' থেকে 'সাহিত্য' হয়েছে এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। কারণ পাণিনির বিধান তর্কাতীত। তর্ক বেধেছে কার সহিত কে মিলেছে তাই নিয়ে। অনেকে বললেন, শব্দের সহিত অর্থ মিলেছে ; কেউ বললেন, কবির হৃদয়ের সহিত রসিক পাঠকের হৃদয় মিলেছে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানুষের সহিত মানুষ মিলেছে, তাই সাহিত্যের জন্যই 'সাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাখ্যা দিলেন তা শুধু প্রশস্ততমই নয় প্রসন্নতমও বটে। তর্কের কথা বাদ দিলেও কোথাও একটা মিল, একটা নৈকট্য স্থাপন না করলে সাহিত্য তার নামের সার্থকতা লাভ করতে পারে না, একথা বুঝতে বোধ হয় অসুবিধা নেই।

'চাঁদপানা মুখ' কথাটি যে মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছিল সে বোধ হয় সাহিত্যিক ছিল না। শৈশবের বর্ণপরিচয়ে মা যখন বলতেন চাঁদমুখো ভ, হাঁটুভাঙা দ, তখন মাও সাহিত্যিক ছিলেন না। তবু এই শব্দগুলির ভিতরে সাহিত্যের একটা মর্মকথা লুকিয়ে রয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্রীরা তার মর্ম উপলব্ধি করে অনেক বিচার বিশ্লেষণও করেছেন। বেশ কিছুদিন আগে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় চাঁদপানা মুখ, বাঁশীর মত নাক ও পটলচেরা চোখের এক কার্টুন দেখেছিলাম। কার্টুনকারের উদ্দেশ্য হয়ত ছিল একটু বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করা। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা গভীর তত্ত্বও হয়ত অজ্ঞাতসারেই বার হয়ে পড়েছে। মনে করুন কারুর মুখ চাঁদের মত থালাকার গোল, আর চাঁদের মতই সে মুখ থেকে আলো বার হচ্ছে। তাহলে কিন্তু চাঁদপানা মুখ দেখে খুসী হওয়া যেত না, সাহিত্যেও সে মুখের কোন ঠাঁই হত না। আকাশের চাঁদ ও মাটির মানুষের মুখের ভিতর যে মিলটুকু মানুষ গ্রহণ করেছে সে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল কমনীয় কান্তি যা মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে পরিতৃপ্ত করে, প্রসন্ন করে। অমিলের ভিতরে এই মিলকে উপলব্ধি করা, দূরের ভিতর এই আত্মীয়তাকে আবিষ্কার করা উপমা অলঙ্কারের মূল কথা। সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেছেন সব অলঙ্কারের মূলে রয়েছে

এই উপমা অলঙ্কার ; উপমা এক নিপুণা নটিনী, কত বিচিত্র বেশে, কত বিচিত্র অলঙ্কারের সাজে সে বার বার সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়।

এই তত্ত্বটিকেই এক বিখ্যাত আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা করে বললেন—উপমা অলঙ্কারের ভিতরে রয়েছে এক বিচিত্র ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এখন আবার প্রশ্ন করা হল, চাঁদের কান্তি, আর মুখের কান্তি কি এক, কোথায় এদের মিল। তখন আলঙ্কারিক আবার সুনিপুণ দার্শনিক বিশ্লেষণ সুরু করলেন ; শেষ পর্য্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, এই মিলটি আর ভাষা দিয়ে বোঝান যাবে না, হৃদয় দিয়ে এর চমৎকারিত্ব অনুভব করতে হবে। সাহিত্যিক বা দার্শনিক না হয়েও কিন্তু সহজ মানুষ সহজ ভাবেই বিভেদের ভিতর এই মিল বা নৈকট্যকে উপলব্ধি করেছিল। সাধারণ মানুষের এই আত্মীয়তার উপলব্ধিকে আরও ব্যাপকতর ও উন্নততর পর্য্যায়ে উন্নীত করতে পারার ভিতরেই সাহিত্যিকের কৃতিত্ব। তখন সে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ।

মানুষ ভাষা পেয়েছিল ভাবকে প্রকাশ করার জন্য, গোপন করার জন্য নয়, সহজকে দুর্বোধ করার জন্য নয়। একই সমাজে, একই পরিবারে, এই একই সংসারে ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেয়। ভাবকে প্রকাশ করার অর্থই হ'ল যা ব্যক্তিগত তাকে ব্যক্তির বাইরে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত সমাজগত করে তোলা। মানুষের ভাষা সামাজিক সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সেজন্যই ভাষা-বাহিত ভাবরাশিকে ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে তুলে দেয়াই তার কাজ। এই 'depersonalisation' বা নির্ব্যক্তীকরণ অর্থাৎ সমাজীকরণ মানুষের শৈশব থেকে সুরু হয়েছে। এ না হলে মানুষই বাঁচত না, সাহিত্য সৃষ্টি করা ত দূরের কথা।

আমরা অনেকেই ছাদ পেটানো গান শুনেছি। গানের ভাবার্থের সঙ্গে কাজের মিল নেই। কিন্তু গানের তালের সঙ্গে কাজের তালের মিল রয়েছে। নদী থেকে কাছি বেঁধে বড় বড় গাছের গুড়ি টেনে তুলতে দেখেছি। অনেকে মিলে টানছে আর ছড়া বলছে। সে ছড়াগুলির অর্থ অনেক সময় এতই কুৎসিত যে ভদ্র সমাজে পরিবেশন করা অসম্ভব। কিন্তু ছড়ার তালে একসঙ্গে কাছিতে টান পড়ছে, বিপুলকায় তরুস্কন্ধ ডাঙ্গায় উঠে আসছে। মানুষের দৈহিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই যে গানের মিল এ কোন সাহিত্যিক বা দার্শনিক সৃষ্টি করে নি, সাধারণ মানুষ জীবনের তাগিদে এই মিলকে খুঁজে বার

করেছে। আদিম মানুষের শিকার নৃত্য এবং তার আনুষঙ্গিক আদিম ভাষার ভিতরে নিতান্ত প্রাণধারণের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে 'তত্ত্ব' জীবনের স্বাভাবিক স্বীকৃতি লাভ করেছে তাকেও বলা যেতে পারে বৈসাদৃশ্যের ভিতরে সাদৃশ্যের অঙ্গীকার। সবাই মিলে বাঁচা, তাই সবাই মিলে নাচা। আর সে নাচকে সতেজ রাখার জন্য সবাই মিলে ভাষা। এ না হলে প্রতিকূল প্রকৃতির কোলে প্রথম মানুষ বাঁচত না। বাঁচবে বলে মানুষ মিলেছে, মিলবে বলে নাচের সঙ্গে জান্তবপ্রায় ভাষাকেও মিলিয়ে দিয়েছে।

আমাদের দেশের ভেদাভেদবাদী দার্শনিকরাও ভেদের ভিতরে এই অভেদের উপলব্ধিকে মানুষের মুক্তির উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। বহু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বস্তুকে একটি শব্দের দ্বারা একসঙ্গে প্রকাশ করার কৌশল মানুষ যেদিন প্রথম আয়ত্ত করেছিল, তখন তার অগ্রগতির ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল বলতে হবে। পরস্পর-বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত মূর্ত বস্তুগুলিকে একটি বিমূর্তভাবের আধারে বিন্যস্ত করে ধরে রাখার উপায় আবিষ্কৃত না হলে মানুষ মানুষ হত না, জানোয়ারই থেকে যেত। সকল মানুষকে এক 'মানুষ' নামে অভিহিত করা, সকল গাছকে 'গাছ' বলে চিনতে পারা ও বলতে পারা, ন্যায়শাস্ত্রে যাকে বলে 'সামান্য' বাচক শব্দ, সেই একটি সাধারণ শব্দের দ্বারা বহু অসাধারণকে একত্র করে গেঁথে রাখা—এ হ'ল মানুষকে মানুষ করে তোলার কাজে এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। তারপর, 'সমাজ' 'সংসার', 'বিশ্ব', প্রভৃতি আরও উন্নত স্তরের বিমূর্ত-ভাবব্যঞ্জক শব্দগুলি আরও বহু বিচিত্র মূর্ত ব্যক্তিগুলিকে মানুষের মনন ও ভাবনার মধ্যে এক জায়গায় এনে একটি ভাবমূর্তিতে দাঁড় করিয়েছে। বিমূর্তকে পরিহার করে কেবল মূর্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই আমাদের ধ্যান ধারণা যদি ঘুরপাক খেতে থাকত, তাহলে শুধু 'সমাজ', 'সংসার'ই মিছে হত না, 'জীবনের কলরব'ও মুছে যেত।

এক আধুনিক আমেরিকান দার্শনিক বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে মানুষের সকল দুঃখের মূল কারণ কতগুলি বিমূর্ত শব্দের অত্যাচার। তাঁর মতে বস্তু-জগতে 'মনুষ্যসাধারণ' বলে কিছুই নেই, আছে কেবল ১নং আদমী, ২নং আদমী···এই ভাবে অনির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত। 'সমাজ', 'সভ্যতা', 'সংস্কৃতি', 'ফ্যাসিবাদ', 'পুঁজিবাদ', 'সাম্যবাদ'—এই সব নিরর্থক শব্দের

চাপে নিপীড়িত হয়ে মানুষ নির্বোধের মত হানাহানি করে মরছে। মানুষের জীবনের ব্যাকরণ থেকে common noun, abstract noun প্রভৃতি সবগুলি বিশেষ্য তুলে দিয়ে একমাত্র proper nounকেই ধরে রাখতে জানলে আর কোন গোলমাল নেই। মানুষকে সংখ্যা মাত্রে পরিণত করার লোভ-কলুষ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী'তে বিদ্রূপ জর্জরিত ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু এখন মানুষকে আবার সেই সংখ্যা হিসাবে পরিচিত করার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

'ব্যক্তি স্বাধীনতার' এই দুরন্ত দার্শনিক আন্দোলন পশ্চিম জগতে এখনও বেশ জোরদার। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিক বলেছেন—উপমা অলঙ্কারের ভিতরে ভেদাভেদের একটা চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে। অভেদের চেয়ে ভেদটা বড় হয়ে উঠলে উপমা পরিণত হয় 'ব্যতিরেক' অলঙ্কারে, এবং ভেদটাকে চাপা দিয়ে কেবল অভেদটাকেই তুলে ধরলে উপমার জায়গা দখল করে 'রূপক' অলঙ্কার। মানুষের জীবন-দর্শনে আজ সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা—যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে মানুষ তার জীবন-দৃষ্টির স্বচ্ছ প্রশান্তি ফিরে পাবে সে কি উপমা, রূপক, না ব্যতিরেক? এ জিজ্ঞাসা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক সকলকেই ব্যাকুল করে তুলেছে।

'ব্যতিরেকি' দর্শন যখন সাহিত্যকে আক্রমণ করে তখন অঘোর-পন্থী তান্ত্রিকের ব্যভিচারে সাহিত্যের আলো বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এই বিষেরই সর্বশেষ প্রসব বোধ হয় বিটনিক-কাব্য। বিটনিকের বামাচার 'কুলার্ণব তন্ত্রের'ও কুলনাশ করেছে। তাই স্বাধীন সাহিত্যে এদেরও বোধ হয় অবাধ গতিবিধি। কিন্তু এ কাব্য আমাদের আলোচ্য নয়। বস্তুত কোনও গোষ্ঠী-কাব্যই আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা আলোচনা করছিলাম জীবন-দর্শনের এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা যা আদিমকাল থেকে বৈচিত্র্যের ভিতরে ঐক্য সাধনে ব্যাপৃত। কোন সচেতন দার্শনিকের দর্শন-সূত্রে নিবদ্ধ হওয়ার বহু আগে থেকেই এই দৃষ্টি মানুষের জীবনের মূলে অজ্ঞাত অঙ্গীকার লাভ করেছে। পৃথিবীতে মানুষ যেদিন প্রথম এসেছে সেদিন থেকেই সে ব্যক্তি-সত্তাকে অতিক্রম করার কাজ সুরু করেছে। বহিঃপ্রকৃতির আলো বাতাস জল সে পান করেছে, তারই কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করেছে, এই ভাবেই তার দেহ মন ও অনুভূতি গঠন করেছে। প্রতি মুহূর্তে বহির্জগতকে এই ভাবে

'আত্ম'সাৎ করতে না পারলে তার 'ব্যক্তিসত্তাই' গঠিত হত না। পরকে আপন করা, বাহিরকে ঘর করার এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে মানুষ এখনও বেঁচে আছে, ভবিষ্যতেও এই ভাবেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে এই অনুকূল একাত্মতা না থাকলে মানুষের বোধশক্তি প্রথম দিনেই লোপ পেয়ে যেত, যদিও এই একাত্মতা মানুষের বোধির ভিতরে ধরা পড়তে কয়েক যুগ সময় নিয়েছে। এই একাত্মতার ঐকান্তিক অনুভূতি যখন কবির হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তখন তার প্রকাশভঙ্গীও বিশ্ব-কাব্যকে প্রকাশ করার উপযুক্ত গৌরব অর্জন করে। যিনি বিশ্ব-কাব্যকে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই বিশ্ব-কবি :

'এক সময় ……আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম……আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।……'

'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন তখন আমি পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতালের মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলেম—নব শিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম।'

'প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি

না। সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকেই মুক্তই করিতেছে ; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে, নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই ; নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।' (আত্ম পরিচয়)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদকে আলঙ্কারিক পরিভাষায় 'উৎপ্রেক্ষা' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন গভীর উপলব্ধিকে অলঙ্কারের দ্বারা চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার ভিতরে 'আঙ্গিক'-প্রধান দৃষ্টির সংকীর্ণতা বিমুগ্ধ হৃদয়কে পীড়িত করে। উপলব্ধির দিক থেকে এখানে কোন অসম্ভবের সম্ভাবনা নেই। বাংলা 'যেন' কথাটি এখানে ইংরেজী 'as if' এর ধারণা বহন করে না। নদীর তরঙ্গভঙ্গীকে যখন কোন কবি ক্রোধোদ্দীপ্ত ভ্রূকুটি বলে কল্পনা করেন, তখন তার ভিতরে একটা সচেতন 'অসত্য' ভাষণের অপরূপ প্রয়াস আমাদিগকে মুগ্ধ করে। অসম্ভবের সম্ভাবনাই কল্পনা ও প্রকাশ ভঙ্গীকে গৌরব দান করে। কিন্তু বিশ্ব-কবির অনুভূতি এখানে অবস্তুকে বস্তুরূপে প্রতিভাত করে না, কল্পনার ঐশ্বর্যের দ্বারা ভাবনাকে পীড়িত করে না, কিন্তু এক সুনিবিড় সত্যভাবনার ভিতরে মানুষ ও পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বৃহৎ সত্যকে প্রকাশ করে। এই সাহিত্যিক বিশ্বদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বের সত্যরূপ প্রসারিত ও প্রকাশিত।

এখন যদি বলা যায় কবির এই অনুভূতি নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত, যার গভীরে অবগাহন করার মত ক্ষমতা সাধারণের নেই, তাহলে কবিকে সম্মান দেয়া হল, কি অসম্মান করা হল, এ নিশ্চয়ই ভাববার কথা। শুধু কবির কথাই বলছি কেন। যে কোন মানুষের ভাবনা ও বাসনা এক হিসাবে ব্যক্তিগত, আর এক হিসাবে সমাজগত। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিক রসগ্রাহী পাঠক ও দর্শকের নাম দিয়েছেন 'সহৃদয়' ও 'সামাজিক'। এই পারিভাষিক নামকরণ দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবির হৃদয়ের সমান হৃদয় রয়েছে পাঠকের, একই ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে—এ ক্ষমতা, এই সহৃদয়তা শুধু তার একার নয়। সমাজের মানুষের চিন্তা ও ধারণা ব্যক্তি-হৃদয়ের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে ; মানুষে মানুষে যত প্রভেদই থাকুক, সমান হৃদয়, সমান ভাবনা, সমান চেতনা না থাকলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনদিন

কোন সম্পর্ক গড়ে উঠত না, এমন কি কোন শত্রুতার সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারত না। আপনি যাকে গাছ ভাবেন, আমি যদি তাকে মানুষ ভাবতাম, আমি যাকে টেবিল ভাবি, আপনি যদি দেখতে পেতেন সে চার পা ফেলে দৌড়াচ্ছে, আপনার দুঃখের অশ্রুকে আমি যদি সুখের জলসেক বলে মনে করতাম, তাহলে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, দাস-ভৃত্য, বন্ধুত্ব আর বৈরিতা—মানুষের সকল সম্পর্কই ঘুচে যেত। প্রত্যেকটি মানুষ তার নির্জন দ্বীপে একটি নির্বাসিত রবিনসন্ ক্রুশো হয়ে থাকত। প্রাচীন আলঙ্কারিক বুঝেছিলেন মানুষ যে সহৃদয়, মানুষ যে সামাজিক, এ তার সাহিত্যানুভূতিরও মূল ভিত্তি, যে ভিত্তিতে সাহিত্যিক অসাহিত্যিক বিদ্বান ও মূর্খ এক জায়গায় মিলেছে। এই সর্বসাধারণ সহৃদয়তা ও সামাজিকতাকেই আরও বেশী সুসংস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারলে আমরা সাহিত্যিক সামাজিকতা ও সহৃদয়তায় পৌঁছাতে পারি।

শৈশব থেকে শিশুর সাধনা চলেছে তার অনুভূতির ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে সমাজসত্তায় পৌঁছাবার জন্য। মা শিশুকে আঙ্গুল দিয়ে চাঁদ দেখাবার পর শিশু যেদিন আঙ্গুল দিয়ে মাকেই আবার চাঁদ দেখাতে শিখল, সেদিন এই শিশু নিছক অন্ধ জৈব প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে তার নিষ্কৃতির পালা সুরু করল। শুধু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করাই নয়, একটি সমান প্রতীকের ব্যবহার দ্বারা অন্যের ভিতরেও সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব, এই প্রারম্ভিক সামাজিক সত্য তার কাছে আবিষ্কৃত হল। তারপর অঙ্গুলিনির্দেশের এই স্থূল প্রতীককে অতিক্রম করে যখন সে ভাষাগত প্রতীকে উপনীত হল তখন শিশুমনের সমাজীকরণ যেন একলাফে অনেকদূর এগিয়ে গেল। প্রথম শব্দটি শেখার সঙ্গে বার বার তার উচ্চারণ, আর ঐ উচ্চারিত শব্দের দ্বারা কোন বস্তুর সনাক্তীকরণ শিশুচেতনার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শব্দের ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গে মানবশিশু সমাজের মানুষ হতে শিখেছে। অন্যের ভাবনাকে আত্মসাৎ করা ও নিজের ভাবনা দ্বারা অন্যের চেতনাকে অনুবিদ্ধ করা, এই দেনা পাওনার কৌশল সে আয়ত্ত করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তিচেতনায় বিধৃত ভাব ও বস্তুকে একটি শব্দপ্রতীকের মাধ্যমে একটি সর্বসাধারণ ভাবনার আকারে বেঁধে রাখা যে সম্ভব, এ আবিষ্কার মনুষ্যত্বের গৌরব।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই গৌরবের শ্রেষ্ঠ অংশীদার। উপরের উদ্ধৃতিটির ভিতরে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের মৌলিক একাত্মতা শুধু কবির উপলব্ধির ভিতরেই নিঃশেষ হয় নি, পাঠকের চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই সঞ্চার-প্রক্রিয়াকে সার্থক করার জন্য কবি যে ভাষা-প্রতীক ব্যবহার করেছেন তার ভিতরে আধুনিক কষ্ট-কল্পিত প্রতীক-ধর্মিতার উৎকট কসরৎ নেই। কয়েকটি অতিপরিচিত শব্দ ব্যাকরণের পরিচিত গাঁথুনির ভিতরে সুবিন্যস্ত হয়ে এক অসাধারণ ধারণাকে সাধারণের ধরার সীমানার মধ্যে এনে দিয়েছে। যাদের এ ক্ষমতা থাকে না, অথচ প্রকাশের দীনতাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতেও যারা কুণ্ঠিত, তারা কাব্যকে শব্দের ধাঁধায় পরিণত করতে কুণ্ঠিত নয়। ব্যক্তিমানসকে সমাজমানসে সঞ্চারিত করার যে প্রাথমিক দায়িত্ববোধ শিশু-মনেও সহজ অঙ্গীকার লাভ করেছে সেই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভই যেন শিল্পস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা।

একদল আধুনিক দার্শনিক মনে করেন—আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কতগুলি খণ্ড ছিন্ন ইন্দ্রিয়বাহিত অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র। যা কিছু অতি-প্রাথমিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে, তাই অর্থহীন। এই দর্শনের মতে আমি, আপনি, নদী, পাহাড়, আকাশ, প্রান্তর কোনও কিছুরই মৌলিক অস্তিত্ব নেই। একজন বললেন গতদিনের রবিনসন ক্রুশো আর আজকের রবিনসন ক্রুশোর মধ্যেও মূলতঃ কোনও ঐক্য নেই। দুই দিনের 'এক' ব্যক্তি এক নয়। তাই এই দুই-এর ভিতর যে সম্বন্ধ, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ক্রুশোরও ঐ একই সম্বন্ধ। কাজেই সম্বন্ধ থাকা না থাকা একই কথা, ওটা 'বস্তুজগতের' ব্যাপার নয়, একটা অর্থহীন অভ্যাস-সঞ্জাত কল্পলোকের ব্যাপারমাত্র। এদের মতে সাধারণ মানুষের ভাষাই মানুষের কাল হয়েছে। এই ভাষা বস্তুহীন জগতকে বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত করেছে। এই সাধারণ মানুষের ভাষার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় আবিষ্কার করাই দর্শনের প্রধান কাজ। সুতরাং ভাষাকে গাণিতিক সংকেতে পরিণত করতে হবে, নূতন নূতন বদখত চেহারার কতকগুলি সংকেতচিহ্ন দ্বারা আমাদের প্রাথমিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে প্রকাশ করতে হবে। 'আমি একখানা বই দেখছি' এজাতীয় বাক্য অর্থহীন। আমিও নেই, বইও নেই, আছে শুধু দেখা নামক একটি ইন্দ্রিয়গম্য ঘটনা বা অভিজ্ঞতা। যে দেখেছে আর যাকে দেখছে—ওসব রহস্যবাদী কথা ভুলে

যান। একটি লাল রঙের দেখা, একটি নীল রঙের দেখা, এই পর্য্যন্ত। এখন এই বিভিন্ন রক্ত নীল বা পীত দৃষ্টির জন্য বিভিন্ন গাণিতিক সংকেত ব্যবহার করুন—সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, দর্শনশাস্ত্রে যুগান্তর ঘটে গেল। Hume বা Mach-এর দর্শন, অথবা দু'হাজার বছর আগেকার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শন নূতন নামাবলী গায়ে দিয়ে আসরে নেমেছে। লেনিনের Empirico-Criticism এদের কাছে অপাংক্তেয়। কারণ তার প্রত্যেকটি পংক্তি এদের নিদারুণ আঘাত করে।

এখন শোনা যাচ্ছে এই দর্শনের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নূতন ধরণের কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালান হবে, হয়ত বা সুরুও হয়ে গেছে। মানুষের ভাষা ও ব্যাকরণকে বর্জন করে 'বিজ্ঞানধর্মী' সাহিত্য সৃষ্টি হবে, গণিতের সংকেতের সারি দিয়ে খণ্ডিত অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে সার বাঁধা হবে। অনেক সময় মনে হয় অনেক আধুনিক বাংলা কবিতাও এই প্রচেষ্টারই প্রাথমিক পরীক্ষা কিনা। শব্দের অর্থ কোনও রকমে বুঝতে পারলেও বাক্যের অর্থ যখন বুঝি না, একটি বাক্যের সঙ্গে আর একটি বাক্যের অর্থগত কোনও মিল যখন অনেক কষ্ট করেও বুঝতে পারি না, বাক্যগঠনে চিরকাল প্রচলিত 'যোগ্যতা' 'আসত্তি' ও 'আকাঙ্ক্ষার' নিয়ম যখন স্বেচ্ছাকৃতভাবেই উপেক্ষিত হয় তখন সত্যিই খটকা লাগে—এটা কোন অতি আধুনিক দর্শনের ছোঁয়ালাগা প্রগতির প্রকাশ কিনা। এই দর্শনের একটা মূল কথা, একটি লোকের দুইটি ক্ষণের অভিজ্ঞতাও একই লোকের অভিজ্ঞতা নয়। সুতরাং অপরের জ্ঞানের সঙ্গে তার মিলের কথা ত উঠতেই পারে না। ঐ মিলটা মোটেই পারমার্থিক নয়। নিতান্তই ব্যবহারিক। এর সহজ সিদ্ধান্ত এই হওয়া উচিত—সারা দুনিয়াটাই split-personalityর ভাঁড়ার ঘর। সুতরাং ভাষা এখন আর মানুষের অর্থবোধের অপেক্ষা রাখেনা, বিভিন্ন মানুষ যাতে সমানে অংশ গ্রহণ করতে পারে এমন কোনও ইতরজনগ্রাহ্য ভাববস্তুকে প্রকাশ করার দায়িত্ব থেকে ভাষা মুক্তি পেয়েছে। মানুষে মানুষে যোগাযোগের সেতু হিসাবে কাজ করার ভূমিকা ভাষার শেষ হয়ে গেছে।

অনেক বন্ধু এ রকমের একটা উদার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন যে আধুনিক জীবনটা এতই জটিল যে তাকে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হলে

স্বভাবতই জটিল আঙ্গিক গ্রহণ করতে হয়। একথার দুরকম অর্থ হতে পারে—জীবনের জটিলতা প্রকাশ করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে জটিল আঙ্গিক প্রয়োগ করা হচ্ছে। অথবা জীবনের জটিলতা কবি-সাহিত্যিকের মনেও এমন জট সৃষ্টি করেছে যা তার সাহিত্য কর্মের আঙ্গিক ও ভাববস্তু উভয়ত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম পক্ষে বলা যেতে পারে, জট দিয়ে জটিলকে প্রকাশ করা যায় না, আরও জট পাকানো যায়। দ্বিতীয় পক্ষে কবি-সাহিত্যিক নিজেই একটা pathological case, সমাজ-চিকিৎসার রোগী, সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়।

'ব্যতিরেকি'-দর্শন জীবনের অনেক কিছুই অতিরিক্ত বলে বর্জন করেছে। ধর্মীয় অনুভূতিই বলুন, সাহিত্যিক উপলব্ধিই বলুন, নৈতিক আদর্শই বলুন – ওগুলি দার্শনিক সত্যাসত্যের বিষয় নয়। তাই এগুলি দার্শনিক বিচারে অর্থহীন। কারণ মূল্যবোধ বা মূল্যবিচার দর্শনের পরিধির বাইরে। যে ভাষা ইন্দ্রিয়লব্ধ ক্ষণিক অভিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রাখে তাই কেবল অর্থপূর্ণ, বাকী সব অর্থহীন। এই নিরিখে রবীন্দ্রনাথের সত্য উপলব্ধির সঙ্গে দার্শনিক সত্যদৃষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং পূর্বের উদ্ধৃত কথাগুলির কোন অর্থ নেই।

আমাদের প্রাচীন রসবাদী আলঙ্কারিকরা রসের বিচারে এবং রসের লক্ষণ নির্ণয়ে শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করেছেন রসিক পাঠকের উপর। কবির অনুভূতিকে রস না বলে, সহৃদয় সামাজিক পাঠকের হৃদয়ে অভিব্যক্ত সাহিত্যিক আনন্দানুভূতিকে রস বলেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই রসদর্শন মানুষের ভাষার চিরন্তন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে কোনও সাহিত্যিক বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন—কবিকর্ম মানে পাখীর আপন মনে গান গাওয়া নয়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন বললেন মানুষে না বুঝলে লিখে লাভ কি, তখন তাঁরা হাটুরে সাহিত্যের কথা বলেন নি, রস-শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেই কথা বলেছেন। ঋষি টলষ্টয় শিল্প-রসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার সঙ্গে ভারতীয় রস-শাস্ত্রের বিস্ময়কর মিল রয়েছে—'দর্শক বা শ্রোতা যদি শিল্পীর অনুভূতি দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তবেই তা শিল্প।' টলষ্টয়-প্রণীত শিল্প-রসের লক্ষণ বহুজনবিদিত হলেও এখানে তার পূর্ণ উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ

'To evoke in oneself a feeling one has once experienced and having evoked it in oneself then by means of movements, lines, colours, sounds, or forms expressed in words, so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of art.

'Art is a human activity consisting in this, that one man consciously by means of certain external signs hands on to others feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them.'

এর পর টলষ্টয় টীকা করে বললেন—সবচেয়ে বড় কথা—'শিল্প কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আনন্দের খেলা নয়, সমান অনুভূতির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার উপায় হল শিল্প। জীবনের জন্য এ অপরিহার্য্য, ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকর অগ্রগতির পথে এ এক অপরিহার্য্য পাথেয়।'

টলষ্টয়ের মূল শিল্পরস-সংজ্ঞার সঙ্গে অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্ত-লক্ষণের আশ্চর্য্য সংগতি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। টলষ্টয়ের লক্ষণের যে অপূর্ণতা রয়েছে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। সন্তানহারা মায়ের বুকফাটা কান্না শ্রোতার হৃদয়ে সহানুভূতির মাধ্যমে যে সমান অনুভূতির সৃষ্টি করে তাও কি শিল্পরসে অন্তর্ভুক্ত হবে? তা হলে মায়ের ঐ কান্না যখন সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয় তখন পাঠক হিসাবে আপন অশ্রুধারার মধ্যেও একটা আনন্দঘন পরিতৃপ্তি আমরা অনুভব করি কেন? এ একটা মৌলিক প্রশ্ন। তাই আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা সাহিত্যের মূল ভিত্তির কথা যখন আলোচনা করেছেন তখন সমান অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলেছেন, কিন্তু যখন সাহিত্যের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তখন 'বিগলিত-বেদ্যান্তর' আনন্দময় অনুভূতির কথা বলেছেন। সাহিত্যশিল্প যে কেবল অনুকৃতি নয় এ বিষয়ে অভিনব গুপ্ত প্রখর ভাবে সচেতন ছিলেন, মন্তব্য করেছেন যে অনুকৃতি মাত্র হলে সাহিত্য কেবল হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারত।

কিন্তু সাহিত্যের মূল ভিত্তিই যদি নড়ে যায় তবে আনন্দঘন অনুভূতি একটা নিরালম্ব খেয়ালী খেলায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সচেতন ছিলেন তার নজিরের জন্য বেশী দূর যেতে হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি কত নিবিড় হতে পারে প্রথম উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। কিন্তু মানুষ হিসাবে এই ঐকাত্ম্য-বোধই যে যথেষ্ট নয় সে কথাও রবীন্দ্রনাথের মত এমন করে আর কে বুঝেছে?

'যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে শিল্পপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়। কারণ এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা······

'বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ। কেন না সে দিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনো ঘটতে পারে না। কেন না আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটা বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।'

প্রকৃতি থেকে মানব, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিশ্বমানব—এই ব্যাপকতম উপলব্ধি মানুষেরই বিশ্বপরিক্রমার ইতিহাস। যে ভাষা, যে প্রতীক ও সংকেত, যে দর্শন ও সাহিত্য কখনও বিকৃত বস্তুবাদের নামে, কখনও স্বার্থান্বেষী দেশ-হিতৈষণার নামে, কখনও 'বিজ্ঞান ধর্মিতার' নামে মানুষের এই স্বাভাবিক বিশ্বমুখীনতাকে ব্যাহত করে, তা মানুষের গৌরবের সামগ্রী নয়। মানুষকে খণ্ডিত করে একরাশ পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে বিকীর্ণ করে দেখা 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি' নয়। খণ্ডিত মানুষকে মিলিত করাই বিজ্ঞানের দৃষ্টি। এ দৃষ্টি সাহিত্যের, এ দৃষ্টি দর্শনের।' কারণ এ সুস্থ মানুষের চিরায়ত স্বভাবসংগত। বিসদৃশের ভিতর সদৃশকে আবিষ্কার করে অসাহিত্যিক প্রথম মানুষ উপমা অলঙ্কার সৃষ্টি করেছিল, সকল মহান সাহিত্যিক এই আবিষ্কারকেই এগিয়ে

নিয়েছেন মানুষের পরম কল্যাণের দিকে। মানুষের কল্যাণ ব্রতের নাম দেয়া যেতে পারে—সাদৃশ্যের অন্বেষণ।

পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য ঋগ্বেদের সর্বশেষ মন্ত্র সকল মানুষের মূলমন্ত্র :

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

সায়নাচার্য্য ব্যাখ্যা করলেন :

তোমাদের সাহিত্য যাতে শোভন হয় তাই তোমাদের সংকল্প সমান হোক, হৃদয় সমান হোক, মন সমান হোক।

# মহাভারতের তাৎপর্য

রামকৃষ্ণদেবের একটি চমৎকার গল্প হয়ত অনেকেরই জানা আছে। দুই ভাইয়ের সংসার। বড় ভাই অসার সংসারমায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হল। ছোট ভাই গৃহস্থধর্ম নিয়ে ঘরে পড়ে রইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বড় ভাই বার বছর পরে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল। ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করল—দাদা, ঘরসংসার ছেড়ে বার বছর তপস্যা করে কি পেলে তুমি? বড় ভাই ছোট ভাইকে নদীর ধারে টেনে নিয়ে গেল, জলের ওপর দিয়ে গট গট করে হেঁটে নদী পার হয়ে গেল। আবার হেঁটে ফিরে এল, বলল—দেখলি তো কি শিখেছি? ছোট ভাই বলল—দুপয়সা দিলে খেয়া নৌকো করেই তো নদী পার হওয়া যায়। তাহলে বার বছর ধরে সংসার ছেড়ে কঠোর সাধনা করে তুমি শেষ পর্য্যন্ত দুপয়সার বিদ্যা আয়ত্ত করেছ?

আজ বিংশ শতকের বানপ্রস্থদশায় বিজ্ঞানের রকেটচারিণী জয়যাত্রার কথা মনে রেখেও রামকৃষ্ণদেবের গল্পটির তাৎপর্য্য বোধহয় একবার নূতন করে ভাববার প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানের মারফত মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে; আপন প্রয়োজনে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের এই আধিপত্য তার মানসিক জগতে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, মানুষ নিজেকে কতখানি জয় করেছে, বিজ্ঞান মানুষকে কতখানি মানুষ করেছে—এ প্রশ্নের উত্তর আজ মানুষকেই দিতে হবে। Man is a tool-making animal-মানুষ যন্ত্রনির্মাতা প্রাণিবিশেষ, এই কি মানুষের সর্বশেষ লক্ষণ? পশু থেকে মানুষের সেখানে চূড়ান্ত প্রভেদ তা হল মানবিক মূল্যবোধ। যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতিই যদি মনুষ্যসভ্যতার মাপকাঠি হয়, তবে বলতেই হবে এখন পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের চরম গৌরবময় বিকাশ ঘটেছে মার্কিন মুলুকে। ভিয়েটনামে এই মার্কিনী মনুষ্যত্বের মহিমা দেখে আমাদের শ্রদ্ধায় অভিভূত হওয়া উচিত ছিল।

মানুষ বেঁচে থাকবে, জন্তুর মত বাঁচবে না, শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন ও শিল্পকলায় সমৃদ্ধ সুস্থ সবল সভ্যতার সক্রিয় অংশীদার হয়ে বেঁচে থাকবে। এর জন্য জৈব জীবনের ভিত্তিটা তার সুনিশ্চিত হওয়া চাই, না হলে বাঁচাই অসম্ভব। সেই ভিত্তির ওপর মানবিক নীতিবোধে সমুন্নত সভ্যতা গড়ে উঠবে। একের বেঁচে থাকার সুযোগ কেড়ে নিয়ে অন্যের জীবন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পশুপ্রকৃতির বিকারমাত্র। এই মানবতা-বিরোধী পাপাচারকে মানুষের সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। এই নীতিবোধই হল মানবিক মূল্যবোধের মূলভিত্তি। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে পুঁজিবাদী সভ্যতা ধিক্কৃত, কারণ এ সভ্যতা আদিম শ্বাপদবৃত্তির পরিণত প্রকাশ, এ সভ্যতা ব্যক্তিস্বাধীনতার নকল নামাবলীর অন্তরালে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থে সমাজের সম্পদ কেড়ে খাওয়ার হিংস্র পশুতন্ত্রকে গায়ের জোরে কায়েম রাখতে চায়। এর হিংস্রতায় বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের চমক আছে, এর শোষণব্যবস্থায় ধর্ম ও স্বাধীনতার মুখোশ আছে। কৌটিল্যতন্ত্রের কুটিলরঙ্গে এ সভ্যতা মানুষের মুখকে মুখোশে পরিণত করেছে, মানবিক মূল্যবোধকে শ্বাসরুদ্ধ করেছে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার মূলেও রয়েছে মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননা, নীতির ওপর লালসার এই আধিপত্য। এ অপমানের নির্মম প্রায়শ্চিত্ত না করে মানুষের নিষ্কৃতি নেই।

সুদূর অতীতে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে এমনি এক নিষ্করুণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। একটি রাজপরিবারের উদ্ধত দম্ভ ও লালসা সেদিন সমস্ত দেশে ধ্বংস ডেকে এনেছিল। মানুষের মৌলিক মূল্যবোধ কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত হলে মহাকাল ক্ষমা করে না—এই গভীর তাৎপর্য্যই সেদিন উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। ভারতের মহাকাব্য মহাভারত।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা মহাভারতকে দেখেছেন বহিরঙ্গ দৃষ্টিকোণ থেকে। মহাভারতের কোন্ অংশ সুপ্রাচীন এবং কোন্ অংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এ' নিয়ে তাঁরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চারশ সাল থেকে চারশত খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় এই আটশত বছর ধরে মহাভারত বর্তমানের এই বিপুল কলেবর লাভ করেছে। মহাভারত এক ব্যক্তির লেখা নয়। মূল লেখকের লেখার সঙ্গে পরবর্তী বহু অখ্যাত

অজ্ঞাত লেখকের লেখা সংযোজিত হয়েছে। ফলে মহাভারতের আকার হয়েছে এক বিপুলকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মত ( literary monster ), যার বিসদৃশ উদ্বৃত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শিল্পদৃষ্টিতে বড় বিকট ও বেমানান ঠেকছে। এ জাতীয় গবেষণার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এই আকারগত দৃষ্টি দিয়ে মহাভারতকে দেখলে এই মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে বাধ্য। একটা কথা মনে রাখা দরকার, যে যুগে মহাভারত প্রথম লেখা হয়েছিল সে যুগে চিন্তাবিদ্দের চিন্তাধারায় সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম পৃথক পৃথক শিল্পসত্তার লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। ঔপনিষদিক যুগ থেকে মহাভারতীয় যুগের কালগত ব্যবধানটা বিরাট নয়। বেদ ও উপনিষদে যেমন সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম একাকার হয়ে মিশে গেছে, মহাভারতও তার ব্যক্তিক্রম নয়, যদিও মহাভারতে সাহিত্যদৃষ্টি বেদ ও উপনিষদের যুগ থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পরবর্তী কালের অলঙ্কার-শাস্ত্রীদের নিয়ম কানুন দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতকে বাঁধা যায় না, বিশেষ করে মহাভারতকে। তাই ভারতীয় ঐতিহ্যিক দৃষ্টিতে মহাভারত সাহিত্য মাত্র নয়, সাহিত্যের অনেক ঊর্ধ্বে। মহাভারতের ভূমিকায় একে বলা হয়েছে উপনিষদ। এর কারণ বোধ হয় এই সে মহাভারতের মূল ঘটনাস্রোত ও চরিত্রবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এমন একটি কালাতীত বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে যা নিজস্ব সাহিত্য গণ্ডী পার হয়ে সর্ব যুগের সর্ব মানুষের সামাজিক অন্তরাত্মার গভীরতম মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চতম দার্শনিক পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে, সামাজিক ঘটনাবলীর সংঘাতে মানুষের চরিত্রের অন্তস্থল অবারিত হয়েছে, এবং এই বহু মানুষের বিচিত্র মিছিলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানবিক সত্তার দার্শনিক মূল্য যাকে শুধু আর সাহিত্যের মধ্যে ধরে রাখা যায় না।

কোন গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য বুঝতে হলে উপক্রম ও উপসংহার মিলিয়ে দেখতে হবে। এ নীতি আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত। মহাভারতের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা অত্যাশ্চর্য্য নীতিগত মিল রয়েছে যাকে উপেক্ষা করে শুধু বহিরঙ্গগত অনৈক্যের ওপর জোর দিলে বিচারকর্তার দৃষ্টিদৈন্য প্রকাশ পেতে বাধ্য। একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য এই মহাকাব্যের ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞ পার হয়ে

স্বর্গারোহণ পর্বে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। এদিকে লক্ষ্য না রেখে মহাভারতের প্রথম দিকটা প্রক্ষিপ্ত এবং স্ত্রীপর্বের পরবর্তী সমুদয় অংশ প্রক্ষিপ্ত—এজাতীয় গবেষণা সাহিত্যের ওপর ঘোরতর অবিচার এবং গবেষণার নামে বুদ্ধির ব্যভিচার।

মহাভারতের প্রারম্ভিক ভূমিকা বা অনুক্রমণীপর্বেই এই বিরাট কাব্যের তাৎপর্য্যগত ইঙ্গিত রয়েছে। লক্ষ্য করা দরকার এই ভূমিকাটির প্রায় অর্ধেক জুড়ে আছে বিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ—সেই সুপ্রসিদ্ধ "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" দিয়ে আরম্ভ করা শ্লোকগুলি। রিক্ত ও নিঃশেষিত অন্ধ রাজার এই আর্তরোদনের শেষ কথাটি লক্ষ্য করুন। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষত্রির বীরদের মধ্যে বেঁচে রইল মাত্র দশজন; পাণ্ডব পক্ষে সাত জন, কৌরবপক্ষে তিন জন। স্ত্রীপর্বে কুরুক্ষেত্রেযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভীমকেও ঠিক এই কথাটাই একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অযুতহস্তীর দৈহিক বল নিয়েও এই বৃদ্ধ রাজার চিত্ত শিশুর চেয়েও দুর্বল, কিন্তু শিশুর মত সরল মোটেই নয়। অন্তরে বাইরে অন্ধ এই রাজা অন্যায়কে অন্যায় জেনেও অসহায়ের মত প্রশ্রয় দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছেন, অথচ এতটা অসহায় তিনি ছিলেন না। এত বড় একটা ধ্বংসের নৈতিক দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে, তাই প্রলয়-শেষের প্রেতাত্মার হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের বোঝাও তাঁকেই বহন করতে হবে। মহাভারতের ভূমিকাতেই গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্র-মহাশ্মশানের এই জাগ্রত প্রেতমূর্তির মুখোমুখী পাঠকদের দাঁড় করিয়েছেন এবং তার একটানা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যবনিকাপাত পর্য্যন্ত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করেছেন। ভিতরে বাইরে নিঃস্ব এই অন্ধ রাজার নিঃশ্বাসবায়ু যেন সমগ্র মহাভারতের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে এবং মহাপ্রস্থানের পথে পাণ্ডবদের পার করিয়ে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে। মহাকাব্যের মূল সুর সুরুতেই বাধা হয়ে গেছে।

কিন্তু এই মূল সুরটিই মহাভারতের মূল বক্তব্য নয়। একটি শোকবিদীর্ণ পিতৃহৃদয়ের উন্মুক্ত ক্ষত হতে যেন কুরুক্ষেত্রের সকল কলুষরক্ত ঝরে পড়ছে, মহাকাব্যকার অনুক্রমণীপর্বেই এই রক্তক্ষরা হৃদয়টি পাঠকের সামনে মেলে

ধরেছেন। এর ফলে পাঠকবর্গ প্রারম্ভেই মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত আত্মিক পরিমণ্ডল বা Inner spiritual climate-এর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। এই প্রারম্ভিক পরিচিতি মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

এখন ধৃতরাষ্ট্রের পাশাপাশি আর একটি চরিত্রকে আমরা দাঁড় করিয়ে দেখতে পারি। ইনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। এই মানুষটি রাজা হতে চাননি, কিন্তু রাজা তাঁকে হতে হয়েছে। যুদ্ধ করতে চাননি, কিন্তু অনিচ্ছুক হাতে তাঁকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। অভিশাপগ্রস্ত সিংহাসনের পঙ্কে তাঁর অনিচ্ছুক পাদুখানিকে চালিয়ে নিতে হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তপ্লাবনে তাঁর কোন অপরাধ নেই। কিন্তু মহত্তম মানবিক বিবেকের কাছে বার বার তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেছেন। তিনি ভারতের অধীশ্বর হলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য তাঁর কাছে এক সান্ত্বনাহীন নিঃসীম মরুপ্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধ বৃদ্ধ রাজার হিমশীতল নিঃশ্বাস, কুরুক্ষেত্রের শবরাশির উপর বিলুণ্ঠিত সর্বহারা বিধবাদের বুকফাটা কান্না বার বার তাঁর বুকে বেজেছে। জয়লাভের শূন্যতাবোধ কোন বিজেতার হৃদয়কে এমন করে আর ক্ষতবিক্ষত করেনি। এই মানুষটি দিনের আলোয় যুদ্ধ করেছেন। রাত্রির অন্ধকারে নিহত মানুষদের জন্য কেঁদেছেন। কুরুক্ষেত্রকাব্যের ট্রাজিডি যারা মারা গেল তাদের নয়। এ ট্রজিডি তাদের যারা যুদ্ধশেষের ভস্মরাশির তলে প্রধূমিত বেদনাবহ্নি চাপা দিয়ে নির্মম প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বেঁচে রইল।

উরুভঙ্গের পর ভূপতিত দুর্যোধনের মস্তকে ভীম বামপদের আঘাত হানলেন। তখন ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের সুকঠোর তিরস্কারের মধ্যে পাশবিক প্রতিশোধস্পৃহার বিরুদ্ধে মানবিক বিবেকের সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট দুর্যোধনের মুখের উপর ব্যথাহত দৃষ্টি স্থাপন করে যুধিষ্ঠির বললেন—হে নিষ্পাপ বীর, তুমি দুঃখ করোনা, মৃত্যু তোমার গৌরবে বরণীয়, তোমার আত্মা শোচনীয় নয়। আমরাই এখন শোচনীয়, যারা প্রত্যেক মুহূর্তে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে বেঁচে থাকব, শোকবিহ্বল বিধবাদের ধিক্কার ও অভিশাপ কুড়িয়ে বেঁচে থাকব।

মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নায়ক বা ট্রাজিক হিরো এই যুধিষ্ঠির, মহত্তম মানবিক মূল্যবোধের প্রতিভূ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, উদ্ধত বিজয়গৌরব যাঁর বিবেককে মুহূর্তের জন্যও ম্লান করতে পারেনি। কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে নিঃসঙ্গ পদসঞ্চারী ধৃতরাষ্ট্রের বিপরীতমূর্তি এই মহাকাব্যের নিঃসঙ্গ মহানায়ক। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের ভস্মশেষে জাগ্রত মানবাত্মা। বিজয়লাভের বেদনায় অবনত, মানবিকতার মহিমায় সমুন্নত বিক্ষতহৃদয় এই মানুষটিকেই মহাভারতের গ্রন্থকার ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মরাজের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একথাটি না বুঝলে মহাভারত বোঝা হয়না।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে চতুর ধৃতরাষ্ট্র কৌশলে যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্বের সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সঞ্জয়কে পাঠিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে একটি অদ্ভুত কুটিল প্রস্তাব দিয়ে। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কাছে যে বাণী বহন করে আনলেন তার সারমর্ম এই—আপনি ধর্মরাজ, ধর্ম আপনার কাছে রাজ্য ও রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। আপনি জানেন এই যুদ্ধে জয় পরাজয় সমান। যেখানে জয়লাভের কোন সার্থকতা নেই সেখানে একটা অনর্থক ধ্বংসের পথে ধার্মিক হয়ে আপনি দেশকে ঠেলে দিতে পারেন না। ধরে নিন পাপমতি দর্পিত দুর্যোধন আপনাকে ন্যায্য রাজ্যাধিকার দেবে না। তাই বলে আপনি দেশ জ্ঞাতি ও কুলের ধ্বংস ডেকে আনতে পারেন না। দুর্যোধন রাজ্য দিতে রাজী না হলে ধর্মের জন্য আপনাদের বরং ভিক্ষা করেও বেঁচে থাকা ভাল। কিন্তু যুদ্ধ করা কখনও উচিত নয়। এই নির্লজ্জ প্রস্তাবের চাতুর্য্যময় অভিসন্ধি বুঝতে যুধিষ্ঠিরের বিন্দুমাত্র দেরী হল না। তবু তিনি দ্বিধায় পড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যের দাবী ছেড়ে দিলেন। সঞ্জয়কে বললেন—আপনি গিয়ে বৃদ্ধরাজাকে বলুন আমরা রাজ্য চাই না, কিন্তু তিনি যেন শুধুমাত্র পাঁচখানা গ্রাম আমাদের ছেড়ে দেবার জন্য নিজপুত্রকে রাজী করান। যুদ্ধ হবে না। সঞ্জয়কে পাঠিয়ে দিয়েই যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হলেন না। এই অবিশ্বাস্য সর্বনিম্ন সর্তে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনকে রাজী করাবার জন্য, আপোষমীমাংসার শেষ প্রচেষ্টার জন্য তিনি কৌরব সভায় কৃষ্ণকে পাঠালেন। এ সময়ে ভীমসেনের আশাতীত ব্যবহারে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই। কৃষ্ণকে ভীম বলছেন—আমি তোমার কাছে জানু পেতে ভিক্ষা চাইছি। তুমি অকপট ও নিরলস ভাবে এ যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা কর। মনে রেখো

আমরা কেউ এই কুলক্ষয়ী যুদ্ধ চাইনা। আরো মনে রেখো, দুর্যোধন বড় অহঙ্কারী। তার অহঙ্কারে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলো না। পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কৌরবরা ধ্বংস হবে এমন ভয়-দেখানো কথা বলোনা। আমাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলোনা। নিরপেক্ষের মত কথা বলবে, দুর্যোধনের অহঙ্কার আহত হলে বিপরীত ফল ফলবে। এ যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ কর। এই অকপট মহতী শুভেচ্ছা যখন অবজ্ঞাত ও প্রতিহত হল, যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হয়ে উঠল তখন কিন্তু ভীমসেন মহাকাল-রূপী কৃষ্ণের বিশ্বস্ত সহযোগী। তাঁর কোমল সরল হৃদয় তখন কুলিশকঠোর, সেখানে শত্রুর জন্য আর একবিন্দু ক্ষমাও অবশিষ্ট নেই।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পৌঁছে বিদুরের অতিথি হলেন। বিদুর বললেন—আপনি ফিরে যান, আপনার কথা কৌরবরা শুনবেনা। আপনার অপমান হবে। অস্থানে আপনার প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। কৃষ্ণ বিদুরকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে শুধু কৃষ্ণচরিত্র নয়, মহাভারতের মূল বক্তব্যের নির্দেশও সেখানে রয়েছে—বিদুর, তুমি ঠিকই বলেছ, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ দুরাত্মা সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও মনে রাখবে—

পর্য্যস্তাং পৃথিবীং সর্বাং সাশ্বাং সরথকুঞ্জরাম্।
যো মোচয়েন্ মৃত্যুপাশাত্ প্রাপ্নুয়াদ্ ধর্মমুত্তমম্।

—এই পৃথিবীকে মৃত্যুপাশ থেকে যে মুক্ত করতে পারবে সেই লাভ করবে পরম ধর্ম। কৃষ্ণ বলে চললেন—ধর্মপ্রচেষ্টা বিফল হলেও ধর্ম নষ্ট হয় না। আমি অকপট ভাবে (অমায়য়া) মীমাংসার চেষ্টা করব। আমি পাণ্ডব কৌরব সকলেরই হিতকামনা করি। পৃথিবীর হিতকামনা করি। ধার্মিকরা যেন মনে করতে না পারেন, মূঢ় শত্রুরা যেন অপবাদ দিতে না পারে, কৃষ্ণ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারত, কিন্তু বন্ধ করার চেষ্টা করেনি।

মানুষ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা মানুষের পরম ধর্ম—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের মুখে মহাকাব্যকার সর্বকালের সর্বদেশের মানুষকে এই চিরায়ত মানবধর্মের বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু দর্পিতের উদ্ধত দর্প, লোভীর উদগ্র লালসা যদি সকল শান্তিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়, যদি যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে চায়, তবে কি নির্বিরোধী শান্তিবাদী মানুষ

অত্যাচারীর লালসাসিক্ত অহঙ্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করে বৈরাগ্যের পথ বেছে নেবে? উদ্যোগপর্বে শান্তি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর মহাভারতের সমগ্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে মহাকবি এর উত্তর দিয়েছেন। আত্মসমর্পণ নয়। লোভীর নিষ্ঠুর লোভ যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের দৃষ্টি স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত রেখে বিবেককে কলুষিত না করে যুদ্ধ করতে হবে; নিতান্ত অকপট শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কৃষ্ণের ভূমিকা আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হল। যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য ভাবে উপস্থিত হয়েছে তখন সর্বাত্মক প্রস্তুতি ছাড়া উপায় নেই। নিরলস শান্তির দূত দেখা দিলেন নির্মম ধ্বংসের হোতা হিসাবে।

মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র বুঝতে হলে একথাটি মূলতঃ বুঝতে হবে,—কৃষ্ণ মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে 'একটি চরিত্রমাত্র' নয়! কৃষ্ণ চরিত্রাতীত চরিত্র, অর্থাৎ কৃষ্ণই মহাভারত। মহাভারতের সাহিত্যিক, দার্শনিক ও মানবিক মূল্য যে গভীরতম তাৎপর্য্যের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে—কৃষ্ণ মহাভারতের সেই সমগ্র আত্মস্বরূপ। মানুষ ও পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষ করা পরম মানবধর্ম। কিন্তু স্বার্থান্ধ লালসা যদি এই ধর্মবোধকে কলুষিত করে, অবমানিত করে, ধ্বংসের পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত না হয় তা হলে মহামানব নেমে আসে মহাকালরূপে। তখন দয়া নেই, ক্ষমা নেই। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলেই তখন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মানবসভ্যতার এই মূলনীতি। এই নীতিরই মূর্তিমান্ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের বহু কর্ম আমাদের আপেক্ষিক নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার কারণ মূল নীতিকে অন্য কোন নীতি দিয়ে বিচার করা যায় না। তাহলে অনবস্থা দোষ বা infinite regress এসে পড়ে। যেমন ধরুন, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের ঈশ্বর কিন্তু স্বয়ং নিরীশ্বর, কারণ তাঁর উপর অন্য ঈশ্বর মানা হলে তিনি নিজে ঈশ্বর হতে পারেন না। তেমনি মানবের উচ্চতম নৈতিক আদর্শকে অন্য কোন আদর্শ দিয়ে মাপা যায় না—God of the theists must Himself be an atheist just as the most fundamental moral law must itself be unmoral. মানবাত্মার গৌরব পদ দলিত হলে মহামানব মহাকালরূপে আবির্ভূত হয়—মহাভারতের এই বাণীরূপই হল শ্রীকৃষ্ণ। তাই শান্তির দূত ধ্বংসের হোতারূপে আত্ম-

প্রকাশ করলেন। এই অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রাতীত চরিত্র। কৃষ্ণই স্বয়ং মহাভারত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গলিত বিকৃত শবরাশির মধ্যে গান্ধারী এসে দাঁড়িয়েছেন মাতৃজাতির প্রদীপ্ত বিবেকের প্রতিমূর্তিরূপে। নিহত পুত্রদের পাপস্খালনের জন্য গান্ধারীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পাণ্ডব বা কৌরব উভয় পক্ষের নিহত যোদ্ধাদের জন্য তিনি আকুল ক্রন্দনে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ছেন। আবার উঠে চলছেন, কৃষ্ণকে ডেকে ডেকে তাঁর ধ্বংসলীলার পরিণতি দেখাচ্ছেন আর বার বার প্রশ্ন করছেন—হে মাধব, এ কাজ তুমি কেন করলে? তারপর এক সময় শোকদগ্ধ মাতৃহৃদয় ধৈর্য্যের বাঁধ হারিয়ে ফেলল। গান্ধারী উঠে দাঁড়ালেন, চোখের জলে আগুনের শিখা জ্বলে উঠল, কৃষ্ণকে দারুণ অভিশাপ দিলেন গান্ধারী—তোমার যাদব বংশও এমনি ধ্বংস হবে। তুমি থাকবে নিঃসঙ্গ, একাকী। বনে বনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তারপর একদিন অখ্যাত, অজ্ঞাত, অলক্ষিত তুমি কুৎসিত মৃত্যু বরণ করবে। ভরতবংশের নারীদের মত যাদববংশের পুত্রহীন পতিহীন জ্ঞাতিবান্ধবহীন নিঃসহায় নারীকুলও এমনি হাহাকার করবে।

কৃষ্ণ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, ধীর গম্ভীর প্রশান্তস্বরে গান্ধারীকে বললেন—গান্ধারি, তুমি আমার কাজটাই এগিয়ে নিয়ে গেলে। এ আমি আগে থেকেই জানি। বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস তোমার অভিশাপের আগেই নির্ধারিত হয়েছে। "জানেহমেতদপ্যেবং চীর্ণং চরসি ক্ষত্রিয়ে।"

গান্ধারী নির্বিকার নির্মম মহাকালের ফাঁদেই পা বাড়ালেন। শোকে ক্রোধে প্রতিশোধস্পৃহায় উদ্‌ভ্রান্ত মাতৃহৃদয়ের বিবেক কিন্তু কলুষিত হল। মহাকবি একথাই বুঝাতে চাইলেন, ধ্বংসের পাপচক্র সম্পূর্ণ না ঘুরে থামতে জানে না। ধ্বংস ধ্বংসকে ডেকে আনে। কুরুক্ষেত্রের রক্তলীলায় ধ্বংসের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় পর্ব শেষ হবে বৃষ্ণিবংশের নিধনযজ্ঞে। বৃষ্ণিবংশ নিঃশেষিত হল'। নির্জন বনান্তে নিঃসঙ্গচারী শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধবাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কালপুরুষের কাজ শেষ হ'ল। পাণ্ডবরা বলে উঠলেন, 'কালঃ, কালঃ'। কালপুরুষ তার মাসুল সুদে আসলে আদায় করে নিয়েছে। আর নয়। এবার যাবার পালা। যে রাজ্য নিয়ে পাণ্ডবরা

একদিনও সুখের মুখ দেখেননি, বিবেকের ভারস্বরূপ সেই রাজ্যভার পরীক্ষিতের হস্তে সমর্পণ করে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথ ধরলেন। স্বর্গে গিয়ে কৌরব পাণ্ডবের মিলন হল। সেখানে শত্রুতার অবসান ঘটল এই মিলনে। এই শত্রুতার অবসান পৃথিবীতে ঘটলে মানুষের মঙ্গল হত, তবু তা ঘটল না। কেন ঘটল না? পৃথিবীতে মানুষ কি শান্তিতে থাকতে পারবেনা?—এই অনুচ্চারিত প্রশ্ন মহাভারতের মহাকবি চিরকালের মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, প্রশ্নের সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়ে গেছেন।

মহাভারতের ভূমিকাতেই দুটি শ্লোক আছে যাকে টীকাকার নীলকণ্ঠ মহাভারতের তাৎপর্য্যগ্রাহক শ্লোক বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম শ্লোকটিতে দুর্যোধনকে বলা হয়েছে "মন্যুময়ো মহাক্রমঃ", দ্বিতীয়টিতে যুধিষ্ঠিরকে বলা হয়েছে "ধর্ম্মময়ো মহাক্রমঃ"। ভারতীয় ঐতিহ্যে এ শ্লোকদুটি সুপ্রসিদ্ধ। এ ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন ভাবনার বিলাস মাত্র নয়। "মন্যু" শব্দের অর্থ এখানে ক্রোধ। টীকাকার নীলকণ্ঠ বললেন এখানে 'মন্যু' শব্দটির দ্বারা দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি দোষকেও বুঝতে হবে। এই "প্রভৃতির" মধ্যে লোভও আছে।

মহাভারতের যুদ্ধের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন। এখানে সম্পত্তি হ'ল একটা বিপুল রাজ্য। এই রাজ্যলালসাকে কেন্দ্র করেই হিংসা দ্বেষ ও অহঙ্কার প্রতিপক্ষের হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই রাজ্যাধিকার কি এতই পবিত্র, যার জন্য একটা সমগ্র মহাদেশের মানুষের জীবন ছারখার করে দেয়া চলে? পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার পবিত্র ও মৌলিক মানবিক অধিকার। কোন রাজার রাজ্যের লোভ, কোন ধনীর সম্পত্তির লোভ মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনা। দুর্যোধন মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়ে তাঁর অহঙ্কৃত রাজ্যলালসাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তার ফলেই সমগ্র দেশের জীবনে ঘোর দুর্দিন নেমে এসেছে। পাণ্ডবরা রাজ্যের দাবী ত্যাগ করেছিলন। মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কৌরবদের অপেক্ষা পাণ্ডবরা অধিক সমুন্নত। কিন্তু মহাভারতকার নিরঙ্কুশ শান্তিবাদ বা pacifismকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। একটা মহাযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও যদি দেখা যায় অত্যাচারীর নিষ্ঠুর লোভের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা ছাড়া

শান্তির আর পথ নেই, সেখানে আত্মসমর্পণ করা চলেনা। কারণ, তাতে শান্তি আসেনা। দর্পিতের দম্ভ, লোভীর লোভ আরও নিষ্ঠুর ভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় মাত্র। তখন সকল পরিণতির কথা ভেবেও সর্বাত্মক প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

দুর্যোধনের চরিত্রে ব্যক্তিগত অনেক গুণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দর্প ও রাজ্যলোলুপতার কাছে মানুষের জীবনের মূল্য তুচ্ছ। এখানেই মানুষ হিসাবে দুর্যোধনের গ্লানিময় নৈতিক পরাজয়। কিন্তু মহাকবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি দুর্যোধনের প্রতি অবিচার করেনি। দুর্যোধনের দৃঢ় বিশ্বাস রাজ্য তাঁরই প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণের শান্তি-প্রস্তাবের সময় দুর্যোধন এ বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছেন—যে পর্য্যন্ত আমি বেঁচে থাকব সে পর্য্যন্ত পাণ্ডবরা রাজ্য পাবেনা। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন আমাদের অন্ধ পিতা অন্যের কুমন্ত্রণায় আমাদেরই ন্যায়াধিকারভুক্ত রাজ্য অন্যায়ভাবে পাণ্ডবদের দান করেছেন। বিনাযুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র মেদিনীও দান করবনা। দুর্যোধন যে প্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডবদের সমূলে ধ্বংস কামনা করেছিলেন, এবং বহু কুটিল উপায়ে সে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। রাজসূয় আর অশ্বমেধ যজ্ঞের নামে যদি অন্যের রাজ্য গায়ের জোরে দখল করে নিজের রাজ্য বিস্তার করা রাজধর্মে অন্যায় বলে বিবেচিত না হয়, তবে নিজের রাজ্য নিষ্কণ্টক করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতিশত্রুকে নির্মূল করাই বা অন্যায় হবে কেন?

কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসের দিকে একটি মহাদেশকে এগিয়ে দেবার পিছনে রাজ্যলোভের সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের অহঙ্কারও একটা মস্তবড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আত্মবিস্তারকে তিনি আত্মার অঙ্গীকার বলে মনে করেছেন। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। 'বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও পাণ্ডবদের দেবনা' এই নির্মম নিশ্চয়েব পিছনে দুর্যোধনের আহত অহঙ্কার অনেকখানি কাজ করেছে। ভীমসেন দুর্যোধনের অহঙ্কারে আঘাত না করার জন্য কৃষ্ণকে বার বার সতর্ক করেছিলেন—কৃষ্ণ, তুমি মৃদু ব্যবহার করবে। কিন্তু কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত পরিষদবৃন্দ ঠিক এর বিপরীত কাজটাই করেছেন। বার বার বক্তার পর বক্তা উঠে দুর্যোধনকে শুধু ধিক্কারই দেননি, বলেছেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়পুষ্ট পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে

তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। দুর্যোধনের মর্য্যাদায় তাঁরা আঘাত করেছেন। দুর্যোধন তার উত্তরে বলেছেন, কর্ণ দ্রোণ ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে পৃথিবীতে এমন কে আছে? তা হলে একবার লড়েই দেখা যাক। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দেবনা। এ আমার শেষ কথা।

ভীমের পদাঘাতে উরুভগ্ন দুর্যোধনকে কৃষ্ণ যখন তীব্র তিরস্কার করছেন তখন নিষ্পিষ্টপুচ্ছ সর্প যেমন অর্ধেক শরীর নিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ায় দুর্যোধনও তেমনি হাতের উপর ভর রেখে অর্ধেক শরীর টান করে তুলে ধরলেন। কৃষ্ণের দিকে জ্বলন্ত দুট চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বললেন—কংসের দাসের জ্ঞাতি তুমি, তোমার লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই। কৌরবপক্ষের অন্ততঃ একটি বীরের নাম কর পাণ্ডবরা তোমার কুটিল অপকৌশল ছাড়া যাকে যুদ্ধে জয় করতে পেরেছে। কৃষ্ণ এর উত্তরে দুর্যোধনের পাপকার্য্যের একটার পর একটা ফিরিস্তি দিয়ে চললেন। দুর্যোধন প্রত্যুত্তর দিলেন—আমি পৃথিবী শাসন করেছি, ভোগ করেছি। আমি যা কিছু করেছি তা রাজধর্মে অনুমোদিত। আমি শত্রুর শীর্ষে আরোহণ করেছি। বীরের মত এবার আমি আমার জীবনপ্রান্তে পোঁছেছি। আমি স্বর্গের গৌরব অর্জন করব। তোমরা কিন্তু এই পৃথিবীর নরককুণ্ডে জীবন্ত শব রূপে বেঁচে থাকবে। দুর্যোধনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, সুগন্ধে বাতাস ভরে গেল। সিদ্ধগণের সাধুবাদ ও গন্ধর্বগণের গীতিমাধুর্যে দিগন্ত মুখরিত হল। জ্যোতি-মালায় আকাশ উদ্ভাসিত হল। বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু অসাধারণ বীরত্ব সত্ত্বেও দুর্যোধনের চরিত্রে এমন একটা ক্রূরতা ছিল যে মহাকবি তাঁকে মহত্ত্বের শিখরে উত্তীর্ণ করতে পারেননি। কৃষ্ণকে শেষ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি দুর্যোধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন তবে হয়ত বীরত্বের সঙ্গে খানিকটা মহত্ত্বের দাবীও তিনি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য তিনি ভগ্ন উরু নিয়ে আরো কিছু সময় বেঁচে রইলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে অশ্বত্থামাকে দিয়ে নিদ্রিত পাণ্ডব শিবিরে রাত্রির অন্ধকারে এক নিদারুণ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটালেন। আর এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে পরম শান্তি ও তৃপ্তিভরে বিন্দুমাত্র অনুতাপ না করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দুর্যোধন জীবনে কোনদিন বিবেকের দংশন অনুভব করেননি,

কোন কাজের জন্য অনুতাপ করেননি। তাঁর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের এমন একটা সর্বাত্মক অভাব রয়েছে, আগাগোড়া এমন একটা ক্রুর, নৃশংস ও উদ্ধত সামঞ্জস্য রয়েছে যে মহাভারতের ট্রাজিডির হিরোর মহিমা তিনি কোনদিন পেতে পারেন না।

ট্রাজিক হিরোর উদাত্ত চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য রয়েছে কর্ণের। কিন্তু কর্ণেরও একটা বিশিষ্ট সীমা রয়েছে যাকে অতিক্রম করে তাঁর মানবিকতা মহত্তম পর্য্যায়ে পৌঁছুতে পারেনি। এই উদার-হৃদয় মহাবীরের জন্মলগ্নের অভিশাপ তাঁকে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুসরণ করেছে। সমাজের উচ্চকোটিতে সদা অবজ্ঞাত এই বীরহৃদয় সামাজিক অন্যায় ও অবিচারে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুর্যোধনকৃত সমস্ত পাপাচারের বিশ্বস্ত সহযোগী হতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ একমাত্র দুর্যোধনই তাঁকে প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেননি। মাতা কুন্তীর কাছে আত্মপরিচয় পাবার পর বিক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত হতাশাক্লিষ্ট এই বীরপুরুষ সজ্ঞানে সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। সমাজের অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা এই স্বর্ণহৃদয় বীরপুরুষকে এক নিদারুণ অভিমানের মধ্যে উদাসীন আত্মকেন্দ্রিক ও নিঃসঙ্গ করে নির্বাসন দিয়েছে, যার ফলে যুধিষ্ঠিরের মত মানবজীবনের মহত্তম ভাবনার কাছে পৌঁছুবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। সমাজের বিড়ম্বনায় একটা বিরাট সম্ভাবনার অপমৃত্যু এই কর্ণচরিত্র। যিনি ঘোষণা করেছিলেন—"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্'—তিনি যেন শেষ পর্য্যন্ত নিবিড় ঔদাসীন্যে দৈবের কাছেই নিজেকে সঁপে দিলেন।

মহাভারতের বিরাট কলেবরে তৎকালীন সমাজের অনেক বিরাট পুরুষের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু মহাকবির সূক্ষ্ম সামাজিক সংবেদনা এই বিরাট চরিত্রগুলির দুর্বল রন্ধ্রগুলিকে অবারিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। ভীষ্ম দ্রোণ বিরাট পুরুষ, ভারতীয় ঐতিহ্যে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তবু এঁদের বিরাট্ত্ব নীরন্ধ্র নয়। কবির বাস্তব সমাজদৃষ্টির কাছে এদের দুর্বলতা অনাবিষ্কৃত থাকেনি। এই দুর্বলতার সামাজিক ভিত্তি কোথায় তাও এঁদের মুখ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে যুধিষ্ঠির ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও শল্যের কাছে একে একে আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন। ধর্মরাজের ধর্মবোধের তুলনা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে দুপক্ষের সৈন্যবাহিনী

সজ্জিত হয়ে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। যুধিষ্ঠির অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ করে কুরুসৈন্যের ভিতরে প্রবেশ করলেন। কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ উপহাসমুখর হয়ে উঠল—'পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বোধহয় ভয় পেয়েছে, ভীষ্মের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে চলেছে। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে এই অপ্রত্যাশিত আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন—আপনি শ্রদ্ধেয় গুরুজন। আপনার বিরুদ্ধে আজ আমরা অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হব। আপনি কৌরবের পক্ষে যুদ্ধ করুন। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমাদের অনুমতি দিন, আর আমাদের আশীর্বাদ করুন। যুধিষ্ঠিরের এই অত্যাশ্চর্য্য আচরণ বীরশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পিতামহের লজ্জাহত বিবেককে আত্মপ্রকাশের পথ করে দিল একটি অকপট স্বীকারোক্তিরূপে। ভীষ্ম বললেন—আমি আজ ক্লীবের মত তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি। কৌরবের অর্থে পরিপুষ্ট আমি অর্থদাস। পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ পুরুষের দাস নয়। তাই তোমার প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিত্।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥
অতস্ত্বাং ক্লীববদ্বাক্যং ব্রবীমি কুরুনন্দন।
ভৃতোঽস্ম্যর্থেন কৌরব্য যুদ্ধাদন্যৎ কিমিচ্ছসি॥

এই অর্থ-দাসত্বের কলুষবন্ধনই বোধ হয় ভীষ্মকে কৌরব সভায় অবমানিতা দ্রৌপদীর ব্যাকুল আবেদন কৌশলে উপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিল।

যুধিষ্ঠির তারপর একে একে দ্রোণ কৃপ ও শল্যের নিকট উপস্থিত হয়ে একই কথা বললেন, এবং প্রত্যেকে একই উত্তর দিলেন—

কৌরবের অর্থে প্রতিপালিত অর্থদাস আমি আজ ক্লীবের মত তোমার কথার উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি।

যে সমাজ অর্থের প্রভুত্ব মেনে নেয় সে সমাজে মহাবীরও দুর্বল, মহাপুরুষও পৌরুষহীন। এই সাবধানবাণী ঘোষণা করার সময় সত্যদ্রষ্টা কবি কি দিব্য চক্ষে বর্তমান ভারতবর্ষকে দেখতে পেয়েছিলেন? ধর্মরূপী বিদুর কিন্তু কৌরবের অন্ন ও অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধ পর্ণকুটীরের ক্ষুদকণাকেও অমৃত বলে গ্রহণ করেছিলেন। 'এই দাসীপুত্র কোনদিন অন্যায় ও অধর্মের কাছে মাথা নোয়াননি। বিদুরের বিবেক নিটোল, নিষ্কলুষ

নিশ্ছিদ্র। মহাভারতকার ঘোষণা করলেন—এই দাসীপুত্রই সাক্ষাৎ ধর্ম। মহাভারতের নাটকীয় ঘটনাবর্তে বিদুরের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু পরোক্ষ। তিনি নির্ভীক স্পষ্টবাদী, কিন্তু মহাকাব্যের প্রধান ঘটনাস্রোতে স্পষ্টতঃ অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর আত্মা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নায়করূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই মহাভারতের উপাখ্যান বলছে—স্বয়ং ধর্ম দাসীপুত্র বিদুররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মের আত্মজ।

প্রত্যেকটি চরিত্রে মহাকবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, ঘটনার গতির সঙ্গে চরিত্রগুলির সঞ্চারপদ্ধতিকে যে ভাবে তিনি মেলাতে পেরেছেন, একটা সমগ্র মহাদেশের সমগ্র যুগব্যাপী বিপুল ঘটনা-স্রোতের মধ্যে যে ভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে তিনি অবাধে ঘোরাফেরা করেছেন তাতে শুধু বিস্ময় বোধ করাই যথেষ্ট নয়, বিনম্র শ্রদ্ধায় অভিভূত অন্তরে এই মহাকবিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যপ্রণেতা বলে প্রণাম করতে হয়।

একদিকে ক্ষত্রিয় হিসাবে দুর্যোধনের অতিসীমিত আপেক্ষিক বিকৃত মূল-বোধ, অন্যদিকে যুধিষ্ঠিরের মহত্তম সর্বাত্মক মানবিক মূলবোধ—মহাভারতের সংঘর্ষের মূলভিত্তি এই বিপরীতমুখী মূল্যবোধের বিরোধ। মহাভারতের ভূমিকায় একেই 'মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ' এবং 'ধর্মময়ো মহাদ্রুমের' বিরোধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভূমিকা থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত এই বিরোধেরই বিস্তার পরিণতি ও উপসংহার। এই ভাবে সমগ্র মহাভারতের একটা একটানা সাধারণ সঙ্গতি আছে, একটা ভাবগত ঐক্য আছে, বক্তব্যের একটা সহজ অক্লিষ্ট সামঞ্জস্য আছে কোন দৃষ্টিশীল সমালোচক যাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। লোভের গ্রাস থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে, বিদ্বেষের বিষবাষ্প থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে, মানুষ ও পৃথিবীকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত করতে হবে—এই হল মহত্তম মনুষ্যত্ব। কিন্তু তবু যদি ধ্বংস নেমে আসে, প্রস্তুত হও, মহামানবের মহাকাল-রূপ দেখে ভয় পেওনা। তখন যেন শ্মশান-বৈরাগ্য না আসে। অর্জুন বিশ্বরূপকে দেখেছিলেন লোকক্ষয়কারী কালরূপে। অর্জুন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নেমে বললেন, আমি ধ্বংস চাইনা, যুদ্ধ করতে পারব না। এ বৈরাগ্য নয়, বিহ্বলতা। মুহূর্তমাত্র পূর্বে হতাশহৃদয় ধর্মরাজকে প্রবোধ দিয়ে বীরদর্পে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে রথ ছুটিয়ে এসেছেন। এখন কি তিনি

নূতন করে আবিষ্কার করলেন যে যুদ্ধে ধ্বংস হবে? ধ্বংস জেনেও যুদ্ধ করতে হবে। অন্যায়ের কাছে মাথা নুইয়ে মানুষ বিবাগী হতে পারে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এ যুদ্ধে বিজেতা শান্তি পাবেনা। ভয়ঙ্কর বিনাশের মধ্য দিয়ে জয়লাভ করলে তার বেদনা যেন বিজেতার বিবেককে আঘাত করে। না হলে মানুষ পশুতে পরিণত হবে। এই বিবেকের মহত্তম ঐশ্বর্য্য ছিল যুধিষ্ঠিরের। তাই তিনি ধর্মরাজ, অসুখী ধর্মরাজ, বিজয় গৌরবে উদ্ধত শক্তিমদমত্ত রাজা নন তিনি। তিনি বিজয়ের বেদনায় অবনত, মানবিক মহিমায় সমুন্নত ধর্মরাজ। এই বিবেক বেঁচে থাকলে বর্তমান ধ্বংসের মধ্যেও ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্বের বাঁচার আশা আছে। ভবিষ্যতের মানুষ তখন দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বাত্মক ধ্বংসকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। কুরুক্ষেত্রের রক্তমেধ পার হয়ে পৃথিবীতে শান্তি আসেনি। তবু এ রক্তমেধ সেদিন বন্ধ করা যায়নি। কুরুক্ষেত্রের নির্মম হানাহানির পর মানবাত্মার মিলন হ'ল পরপারে। সম্পদলোভীর লোভকে সংযত করে, শক্তিমান দর্পিতের দর্প খর্বিত করে এ পৃথিবীতেই কি বিদ্বেষ-বিষমুক্ত মানুষের মিলন ঘটানো সম্ভব হবে না? মহামানবকে আর কতবার মহাকালের রূপ ধারণ করতে হবে? —মহাভারতের মহাকবি এই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা সুদূর অতীত থেকে বর্তমানের মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন।

# ভাষার দর্শন

কথায় বলে বোবার শত্রু নেই, এর কারণ বোধ হয় বোবার সমাজ নেই। মানুষের সমাজে শত্রুতাও একটা সামাজিক সম্বন্ধ। কিন্তু ভাষা ছাড়া কোনো সামাজিক সম্বন্ধই গড়ে উঠতে পারে না। যাত্রাগানে দুই পক্ষ যুদ্ধ করার আগে রৌদ্ররস ও বীররস সৃষ্টি করার জন্য ক্রোধোদ্দীপ্ত বীরদর্পিত ভাষণের দ্বারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে আসর গরম করে নেয়। তারপর আরম্ভ করে ঘোরতর যুদ্ধ। তখন সরল হৃদয় শিশুদর্শকের মনে আবির্ভূত হয় ভয়ানক রস। কিন্তু উন্নাসিক আধুনিক সেয়ানা দর্শক উপভোগ করেন হাস্যরস। সাহিত্যরসিকের আসরে যাত্রাগান কতখানি রসোত্তীর্ণ সে আলোচনা বন্ধ থাক। কিন্তু মনে করা যাক রঙ্গমঞ্চে যুযুৎসু দুইপক্ষের কুশীলবগণ কোনো কথা না বলে কেবল স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইল, আর কতক্ষণ পরে হঠাৎ মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। তখন মল্লযুদ্ধটা মঞ্চের কুশীলবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ তাদের রুদ্ধবাক যুদ্ধলীলা দর্শকদের মুখর করে তুলবে, মল্লক্ষেত্রে টেনে আনবে। এখানে কিন্তু বোবারও শত্রু আছে। আসরের দর্শকবৃন্দ ও মঞ্চের কুশীলববৃন্দের একত্র উপস্থিতির পিছনে একটা সুগভীর সামাজিক প্রত্যাশা রয়েছে। একদল আনন্দ দান ক'রে আনন্দ পাবে, আর এক দল আনন্দের দান গ্রহণ করবে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে যদি প্রত্যাশিত সম্পর্কের ছেদ ঘটে তবে স্বভাবতই তার স্থান গ্রহণ করবে একটা বিরূপ সম্পর্ক। যাদের কাছে থেকে আশা করা গিয়েছিল অনর্গল ভাষা, তারা যদি অহেতুক এই আশাভঙ্গ ক'রে বোবার মতন ব্যবহার করে, তাহলে এই নকল মৌনের মধ্যে যে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে তাই সৃষ্টি করে তিক্ততা ও শত্রুতা। আপাতদৃষ্টিতে ভাষার অভাবটাই এখানে বিরূপতার কারণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। যারা কথা বলছে না তারা কথা বলতে জানেনা এটা সত্য বলে মনে করতে পারলে দর্শকরা মারমুখো হয়ে উঠত না। কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথা বলছে না, অথচ লোক ডাকা হয়েছে কথা শোনাবার জন্য। বিক্ষোভের

আসল কারণ তাই। ভাষার অভাবের পিছনে ভাষা বলার এই অপ্রযুক্ত-ক্ষমতাটাই তিক্ততার কারণ। সংসারে পরমাত্মীয়ও অনেক সময় অভিমান-ভরে কথা বন্ধ করে দেয়। এখানেও অভিমান প্রকাশের কারণ ভাষার অভাব নয়। কিন্তু অবরুদ্ধ ভাষার পিছনে ভাষা প্রয়োগের ভাবমূলক ক্ষমতাটাই অভিমান প্রকাশের কারণ। অপর পক্ষের পাল্টা অভিমানের পালাটাও এই জন্যেই। বোবা স্বামীর উপর স্ত্রীও অভিমান করে না। কিন্তু বোবাকেও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে টেনে আনার জন্য ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গিমার ভাষা শিক্ষা দেয়া দরকার হয়।

শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা করতে গেলে তার সঙ্গে ভাবের ক্ষেত্রে একটা মিলের প্রয়োজন। শত্রুর কথা ও আচরণের এমন একটা সাধারণ ভাষা আছে যার ভাবার্থ উভয় পক্ষই সমানরূপে উপলব্ধি করতে পারে। উপলব্ধির এই সমানভূমিতে দাঁড়াতে না পারলে শত্রুকেও শত্রু বলে চেনা যায় না। এই সমানভূমি হল মূলতঃ ভাষার ভূমি। মানুষের সম্পর্ক অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক, সবই সামাজিক সম্পর্ক। এইরূপ সকল সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক বিন্যাসকেই বলা যেতে পারে মানুষের সমাজ। ভাষা ছাড়া এ সমাজ গড়ে উঠত না, বাঁচতে পারত না, চলতে পারত না। এ কথাটা এত সহজ যে বলাটাই বোধ হয় অপরাধ। কিন্তু ভাষা কি ক'রে সমাজ গড়ে, কি ক'রে মানুষকে সামাজিক করে এ আলোচনাটা বোধহয় অপরাধ নয়। কারণ এ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত দার্শনিকদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক চলে এসেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডী বললেন—ভাষা না থাকলে লোকযাত্রা অসম্ভব হত, জগৎ-সংসার অন্ধকারের অন্ধতায় ডুবে থাকত। ভাষা এক অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক আদর্শ। সাধারণ আদর্শ শুধু সম্মুখে উপস্থিত বস্তুকেই প্রতিবিম্বিত করতে পারে। কিন্তু এই বাঙ্ময় আদর্শ যা কিছু অনুপস্থিত তাকেও প্রতিবিম্বিত করে।

অনুপস্থিতকে উপস্থিত করতে পারা, অতীত ও ভবিষ্যতকেও বর্তমানের বুকে দাঁড় করাতে পারার এই বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্যই ভাষা অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত সমগ্র সমাজকে একটি সাধারণভূমিতে ধারণ করতে পারে। যে আমার সামনে উপস্থিত তাকে আমি একটি নাম দিয়ে সনাক্ত করতে

পারি। এই সনাক্তীকরণ নামের একটি গৌণ ব্যাপার মাত্র। কিন্তু আর একটি বৃহৎ ব্যাপারের উপায় হিসাবে কাজ করে বলেই এই গৌণ ব্যাপারটির অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে। উপস্থিতকে নাম ধরে ডাকার জন্যই নামকরণ করা হয়নি। যে অনুপস্থিত তার নাম ধরে যখন অন্যের অভিজ্ঞতা ও বোধের ভিতরে তাকে উপস্থিত করতে পারি তখনই নামকরণের চরম সার্থকতা। শিশু আঙুল দিয়ে দুধের বাটি দেখিয়ে দেয়। এই অঙ্গুলিনির্দেশ সে মায়ের কাছ থেকে দেখে শিখেছে। প্রথম অবস্থায় এটা একটা অনুকরণ মাত্র। পরে এই অঙ্গুলিসংকেত আর নিছক অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ অনুকরণটাই সংকেত নয়। অঙ্গুলি-সংকেতের দ্বারা শিশু যখন মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার দুধের পিপাসা মাকে জানায় তখন যান্ত্রিক অনুকরণ সার্থক সংকেতে পরিণত হয়। এই অঙ্গুলি-সংকেতের স্তর অতিক্রম করে শিশু যখন ভাষার সংকেত শিখতে পারে, তখন তার চেতনাও একটা নূতন স্তরে উন্নীত হয়। নিজের বুদ্ধির ভিতরে দুধকে দুধের বাটি থেকে আলাদা করা বুদ্ধি-বিকাশের প্রথম পর্য্যায়েই সম্ভব নয়। আধার থেকে আধেয়কে আলাদা করে বোঝার এই ক্ষমতা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। দুধকে 'দুধ' বলে চিনতে পারা তখনই অর্থপূর্ণ, যখন দুধের অনুপস্থিতিতেও শব্দটি উচ্চারণ করে শিশু মাকে তার জৈবিক প্রয়োজন ও মানসিক অভিপ্রায় জানাতে পারে। যে পর্য্যন্ত ভাষাজ্ঞান বস্তুর উপস্থিতিতে শব্দটি উচ্চারণ করতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সে পর্য্যন্ত শব্দটি একটি সনাক্তীকরণের চিহ্নমাত্র, কোন বস্তুর উপস্থিতির দ্বারা উদ্দীপিত একটু উচ্চস্তরের জৈবিক প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু শিশু যেদিন তার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্ত করার জন্য সামনে দুধ না দেখেও মাকে দেখে 'দুধ' বলে কান্না জুড়ে দিতে পারে, সেদিন তার শব্দজ্ঞান চিহ্ন থেকে সংকেতে উন্নীত হয়েছে, তার চেতনায় তখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। শিশু সেদিন নিজের চেতনাকে মায়ের চেতনায় সঞ্চারিত করার উপায় খুঁজে পেয়েছে। অন্যের ভিতরে নিজের আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য শব্দের দ্বারা নিজের অভিপ্রেত অর্থকে অন্যের চেতনায় উপস্থিত করার এই বিস্ময়কর ক্ষমতাই শব্দ-জগতকে মানুষের চেতনার এক সাধারণ ভূমিতে পরিণত করে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার একই সমান চেতনায় এই মিলন সম্ভব করে মানুষের ভাষা। সমাজ মানেই

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার, চেতনার সঙ্গে চেতনার এই সমকেন্দ্রিক মিলন। মানুষের চেতনার এই সাধারণীকরণকেই বলা যেতে পারে মানুষের সমাজীকরণ।

আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে নামের মহিমা কীর্তনের জন্য নাম ও নামীর অভেদতত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে। এই তত্ত্বের আধ্যাত্মিক রহস্য আমাদের অজ্ঞাত। আমরা এ আলৌকিক রহস্যে দীক্ষিত নই। তবু এই তত্ত্বের একটা লৌকিক দার্শনিক দিক্ রয়েছে যা আমাদের বিচারবুদ্ধির একান্ত অগোচর নয়। যার নাম দেবদত্ত, তার কোন নাম না থাকলেও অনামা হয়ে সে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু মানুষটি কাছে না থাকলেও তার সম্পর্কে অন্যকে কিছু বুঝাতে হলে তার একটা শব্দাত্মক নাম, অগত্যা একটা বর্ণনাত্মক নামের প্রয়োজন আছে। নামের অর্থ যদি নিছক ব্যক্তিটিই হত তবে অন্যের কাছে দেবদত্তকে বুঝাবার জন্য সব সময়ই দেবদত্তকে ধরে এনে হাজির করার প্রয়োজন পড়ত। নামের অর্থ আর নামী ব্যক্তিটি এক হলে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে শুধু নামের দ্বারাই অর্থের বোধ জন্মানো যেত না। অর্থটি বক্তা ও শ্রোতার কাছে সাধারণ, কিন্তু ব্যক্তিটি অসাধারণ। বক্তা ও শ্রোতার চেতনায় সমানভাবে বিধৃত এই অর্থটিকে কিন্তু নাম থেকে আলাদা করা যায় না। নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত না হয়ে কোন অর্থই জ্ঞানের ভিতরে ধরা পড়ে না। অর্থের সঙ্গে নামের এই একাত্মতাকেই নাম-চিহ্নিত ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মতা বলে একটা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এই ভ্রান্তির মূল কারণ হল শব্দনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও শব্দার্থকে এক বলে মনে করা। বক্তা ও শ্রোতা, লেখক ও পাঠকের সমান চেতনাবিধৃত একটি সাধারণ অর্থের সঙ্গে শব্দের এই একাত্মতাকেও প্রকারান্তরে নাম ও নামীর অভেদ বলা যেতে পারে। শব্দ যে সাধারণ অর্থটিকে শ্রোতার কাছে উপস্থিত করে, সেই প্রকাশযোগ্য অর্থসামান্যকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নামী বলা উচিত। কারণ নাম সাক্ষাৎভাবে তাকেই প্রকাশ করে। এই অর্থেই নাম ও নামী অভিন্ন, কারণ নাম ও অর্থ একাত্মক। যে ভক্তি-দর্শনের মতে ঈশ্বর এক অলৌকিক বিরাট ব্যক্তিবিশেষ তার পক্ষে 'ঈশ্বর' এই নামের সঙ্গে নামী ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করা লৌকিক বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ঈশ্বর বলতে যদি এক নৈর্ব্যক্তিক সর্বাত্মক চেতনাকে বুঝি, তাহলে আমরা আস্তিকই হই আর

নাস্তিকই হই, আমাদের বুদ্ধির সীমানার মধ্যে এক সাধারণ অর্থবোধের ভিত্তিতে নাম ও নামীকে একাত্ম বলে কল্পনা করতে পারি। এই অর্থবোধের সমভূমিতে আমার চেতনাকে 'ঐশ্বরিক' চেতনা থেকে আলাদা করতে পারিনা। এই দিক থেকে বিচার করলে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' মূলক ভক্তিদর্শনের তুলনায় ভর্তৃহরির বৈদান্তিক শব্দাদ্বৈতবাদ মানুষের বিচারবুদ্ধির অনেক বেশী কাছাকাছি। অবশ্য আমাদের এই কথাগুলিকেই শব্দাদ্বৈতবাদের সার ও শেষ সিদ্ধান্ত বলে কেউ যেন ভুল না করেন। যে দর্শনের ভিতরে অনেক কিছুই বিচারবুদ্ধির অগোচর, তাকেও যতখানি বুদ্ধির সীমানায় টেনে আনা সম্ভব ততখানিই চেষ্টা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখা উচিত, যাকে বাক্য ও মনের অতীত বলে মনে করা হয় তাকে বাক্যময় মননের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করলে অনেকখানি বিকৃতিও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই বিকৃতি মেনে না নিলে কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।

আমরা অনেক সময় 'সমাজমানস' কথাটি ব্যবহার করি। ভাষা ছাড়া সমাজমানস গড়ে উঠতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অনেক ব্যক্তিবাদী আধুনিক দার্শনিক এই জাতীয় কথাগুলিকে অর্থশূন্য বিমূর্ত কল্পনা মাত্র বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। সমাজের কোন দুই ব্যক্তিই যখন এক নয়, তখন সকলের মনকে একত্র করে একটি পিণ্ডাকার 'সমাজমানস' কি করে তৈরী করা সম্ভব ? কতকগুলি সোনার টুকরো গলিয়ে মিলিয়ে নিয়ে একতাল সোনা তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু কতকগুলি মন গলিয়ে মিলিয়ে একতাল মন কি তৈরী করা যায় ? তাহলে 'সমাজমানস', 'বিশ্বমানস' এগুলি ফাঁকা কথা, কারণ এদের কোনো অভিধাশক্তি নেই। অভিধাশক্তি শুধু সেই জাতীয় শব্দেরই সম্ভব যে গুলি সাক্ষাৎ উপস্থিত তত্ত্বটিকে মাত্র নির্দেশ করতে পারে। যেমন এক পোঁচ লাল রং দেখে বললাম, '(এই) লাল'। এই মুহূর্তে পেটে ব্যথা অনুভব করে বললাম, '(এই) পেট ব্যথা'। এমনি সোজাসুজি ইন্দ্রিয়াহৃত প্রাথমিক অর্থকে নির্দেশ করাই শব্দের অভিধাশক্তি। এখানে তীর যেন একেবারে সোজা গিয়ে লক্ষ্যভেদ করছে। কিন্তু এজাতীয় শব্দ নিয়েও গোল বেধে যায়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক ক্ষণের এক একটি অখণ্ডিত অভিজ্ঞতার বুকে যদি এক, দুই, তিন ক'রে নম্বর এঁটে দেয়া যেত, তাহলে বোধহয় শব্দের অভিধাশক্তির

নির্ভেজাল নিদর্শন মিলত। তবে মুস্কিল হত এই যে কারুর কথাই কেউ বুঝত না। ধরুন আপনার 'রক্তিম' অভিজ্ঞতার নাম ১ নম্বর এবং আমার 'রক্তিম' অভিজ্ঞতার নাম ২ নম্বর। আপনার অভিজ্ঞতা আপনার, আমার অভিজ্ঞতা আমার, এই দুই-এর মধ্যে মুখ দেখাদেখির কোন প্রশ্নই ওঠেনা। আপনি ২ নম্বরের মানে জানেন না। আমিও ১ নম্বরের মানে জানিনা। অথচ 'এক দুই' এই সংখ্যাগুলির অর্থগ্রহণ পরস্পর আপেক্ষিক। তাই নম্বরের কথা বাদ দিন। মনে করুন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের অসংখ্য কোটি বিন্দু বিন্দু অভিজ্ঞতার জন্য অসংখ্য কোটি সংকেত তৈরী করলাম। তাহলেও আপনার সঙ্গে আমার কথা বলা বন্ধ করতে হবে। কারণ আপনার আমার সংকেতগুলি পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য। তখন একান্তই কথা বলতে হলে নিজের কাছে নিজের কথা বলতে হবে। পৃথিবীর সব মানুষ শুধু আপন মনে বিড় বিড় ক'রে চলবে। নিরঙ্কুশ ব্যক্তিবাদী দার্শনিক তাহলে পৃথিবীকে একটা পাগলা গারদে পরিণত করবে, যেখানে ডাক্তার ও চৌকিদার সবাই পাগল। অথবা মনে করুন, বিধাতা এমন একটি নাটক লিখেছেন যার প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রত্যেকটি কথাই স্বগতোক্তি এবং যার একটি উক্তির সঙ্গে আর একটি উক্তির কোনো সম্পর্ক নেই।

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্ববাদী দর্শন হিসাবে বৌদ্ধ দর্শনের জুড়ি মেলা ভার। নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্লিপ্ত, আত্ম-সম্পূর্ণ নিরন্তর স্রোতোবাহী ক্ষণিক ব্যক্তিসমষ্টি এই জগৎ। বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় শুদ্ধ ক্ষণিক ব্যক্তিকে বলা হয় স্বলক্ষণ। স্বলক্ষণ মানে যা নিজেই নিজের লক্ষণ। অর্থাৎ স্বলক্ষণ মানে অলক্ষণ, কোন শব্দের দ্বারা যার লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ দর্শনের মতে যা সত্য তা শব্দের দ্বারা 'অনভিলপ্য'—অনির্দেশ্য ও অপ্রকাশ্য, কারণ শুদ্ধ ক্ষণিক ব্যক্তিবিশেষই একমাত্র সত্য। একথা মানতেই হবে যে আধুনিক ব্যক্তিত্ববাদী দর্শনের তুলনায় বৌদ্ধ দর্শনের নৈয়ায়িক দৃষ্টি অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন। আধুনিক যথাস্থিতিবাদ বা Positivism এবং অস্তিত্ববাদ বা Existentialism পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তি-প্রাধান্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব অর্পণ করে। যথাস্থিতিবাদের মতে ব্যক্তির মধ্যে আমি তুমি বা উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের স্থান নেই। ব্যক্তি বলতে 'আমি', 'তুমি' এমন কি আমরা যাকে 'সে' বলে নির্দেশ করি তারও কোনো

স্থান নেই। বিশুদ্ধ ব্যক্তি বলতে বুঝি 'ইহা' বা 'তাহা'—It বা This ও That। 'আমিত্বহীন', 'তুমিত্বহীন' এই শুদ্ধ 'ইহা-ময়' ব্যক্তিসমষ্টিই জগৎ। আমার আমিত্ব বা তোমার তুমিত্ব মুছে ফেললে এবং গাছ, পাহাড়, নদী, সাগর, মানুষ, পশু সব কিছু থেকে বৃক্ষত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সাধারণ ধর্মগুলিকে বিমূর্ত কল্পনা বা abstraction বলে ছাঁটাই করে দিলে যা বাকী থাকে, তাই হ'ল শুদ্ধব্যক্তি,—নিছক 'ইহামাত্র'। এই হ'ল মূর্ত ব্যক্তি বা Concrete Particular। এখানে বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে যথাস্থিতিবাদের চমৎকার মিল রয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ থেকে বৌদ্ধ দার্শনিকরা যে স্বাভাবিক ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত টেনেছেন যথাস্থিতিবাদীরা তা পারেন নি। বৌদ্ধ দার্শনিক ঠিকই বুঝেছিলেন যে বিশুদ্ধ ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভাষাতীত। এদিকে পজিটিভিষ্ট দার্শনিক বলছেন--নিছক ব্যক্তিসত্তা মানুষের সাধারণ ব্যবহারিক ভাষার অতীত সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে না এমন কোনও নূতন ধরণের নৈয়ায়িক বা গাণিতিক সংকেত সৃষ্টি করা সম্ভব, যা দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তিকেও নির্দেশ করা যেতে পারে। এ ধরণের সংকেত সৃষ্টির বিপদ আমরা একটু আগেই দেখিয়েছি। তা হলে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি ক্ষণিক অভিজ্ঞতার জন্য এক একটি আলাদা সংকেত সৃষ্টি করতে হবে, যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যদি বা সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায়, তাহ'লেও মানুষে মানুষে, এমন কি এই বিশুদ্ধ দর্শনে দীক্ষিত পণ্ডিতদের মধ্যেও পরস্পর বাক্যালাপ বন্ধ করতে হবে। যে যার নিজ নিজ সংকেতের মধ্যে ডুবে থাকবে। একের অভিজ্ঞতাকে অন্যের অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয়া যাবে না।

বৌদ্ধ দার্শনিকরা এ সম্বন্ধে খুবই সচেতন। কোন সংকেতই শুদ্ধ ব্যক্তিকে বুঝাতে পারে না। কারণ শব্দ মাত্রই একটি সাধারণ ধারণাকে সংকেতিত করে যার সঙ্গে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার কোনো বাস্তব সম্বন্ধ নেই। এই সাধারণ বিমূর্ত্ত ধারণার পারিভাষিক নাম 'সামান্য' যা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সমান, অথচ যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এমনকি যে 'স্বলক্ষণ' শব্দটি শুদ্ধ ব্যক্তিকে নির্দেশ করে বলে মনে হতে পারে, তাও প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ব্যক্তিবাচী নয় কিন্তু সামান্যবাচী। এ শব্দটিও কোনো বিশেষ একটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে না। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে নির্বিশেষে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 'যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ' বললেই ব্যক্তিসত্তাকে

অতিক্রম করে যেতে হয়। ব্যক্তিবিশেষ এবং 'যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ' এক কথা নয়। আধুনিক দার্শনিক পরিভাষায় দ্বিতীয় কথাটি একটি variable, constant নয়। বৌদ্ধ দার্শনিক বলবেন, প্রতীক বা সংকেত মাত্রই variable, constant value সংকেতের দ্বারা অনির্দেশ্য ও অপ্রকাশ্য—ইহা 'অনভিলপ্য'। ইংরেজী 'a' বা 'any' শব্দটি variable, কিন্তু "Socrates" হ'ল constant, পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের এই ভেদরেখা বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রে অগ্রাহ্য। আমি আর আপনি এক নই, সুতরাং আমার ও আপনার বোধ ও অভিজ্ঞতাও এক নয়, কাজেই আমার বোধবিধৃত সক্রেটিস থেকে আপনার সক্রেটিস আলাদা। শুধু তাই নয়, আপনার বা আমার দুই ক্ষণের দুইটি অভিজ্ঞতাও এক নয়। এদিকে যাকে এক সক্রেটিস ব্যক্তি বলে মনে করা হয় তিনিও এক ব্যক্তি নন, পূর্বাপরক্ষণবাহী বহু সদৃশ ক্ষণিক ব্যক্তির সন্তান বা প্রবাহকে কল্পনায় ঐক্যবদ্ধ ক'রে সক্রেটিসকে মিথ্যাই এক বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়। ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন এই সক্রেটিস বক্তা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতা অনুসারে জনে জনে 'vary' করছে। তাই 'Socrates'ও variable মাত্র। তেমনি It, This, That প্রভৃতি যে কোনো demonstrative pronounও variable। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে পাশ্চাত্ত্য ন্যায়শাস্ত্রের 'Logical Proper Name' মোটেই proper name নয়, সবই general name। বৌদ্ধদের 'স্বলক্ষণ' শব্দটিও কোনো বিশেষ বিশুদ্ধ ব্যক্তিসত্তার নাম বা লক্ষণ নয়। শুদ্ধ ক্ষণিক অদ্বৈত সত্তাকে কোনো নামের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, এই নেতিবাচক ধারণাকে ধারণ করার জন্যই স্বলক্ষণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং বৌদ্ধ মতে 'সমাজ-মানস' 'বিশ্ব-মানস', প্রভৃতি শব্দগুলি নিরর্থক নয়, সম্পূর্ণ সার্থক, কিন্তু বস্তুহীন। এইরূপ বস্তুহীন সাধারণ ধারণাই হ'ল শব্দের অর্থ। এর পারিভাষিক নাম হ'ল বিকল্প। বস্তুহীন ধারণার আকারে বিকল্পিত হয় বলেই শব্দার্থকে বিকল্প বলা হয়। শব্দার্থ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের প্রসিদ্ধ নীতি-বাক্যটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ—'শব্দের উৎস বিকল্প, বিকল্পের উৎস শব্দ, শব্দ ও বিকল্প পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু এরা কেউই শুদ্ধসত্তাকে স্পর্শ করতে পারে না।' পজিটিভিষ্টদের ভ্রান্তি এইখানে যে তারা abstract শব্দকে নিরর্থক বলেছেন এবং শুদ্ধ ব্যক্তিসত্তাকেও সার্থক সাংকেতিক শব্দের

দ্বারা নির্দেশযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন। বৌদ্ধরা দেখিয়েছেন যে যত সূক্ষ্মতম সংকেতই তৈরী করি না কেন শব্দ মাত্রেরই অর্থ হ'ল abstraction ; সুতরাং abstract শব্দ নিরর্থক নয়। কারণ abstractionই হ'ল শব্দের সার্থকতা। কিন্তু যা সার্থক তা বস্তুহীন। বস্তু কখনো শব্দার্থ হতে পারে না।

অস্তিত্ববাদী বা Existentialist দার্শনিকরা পজিটিভিষ্টদের বিপরীত দিক থেকে সুরু ক'রে ব্যক্তিত্ববাদের ওপর জোর দিয়েছেন। এরা উভয়েই ব্যক্তিত্ববাদী, কিন্তু বিপরীত অর্থে। বলা যেতে পারে পজিটিভিষ্টরা ব্যক্তিবাদী, কিন্তু 'ব্যক্তিত্ব'বাদী নয়, অপরপক্ষে অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তিত্ববাদী কিন্তু ব্যক্তিবাদী নয়। পজিটিভিষ্ট দর্শন জগতের বস্তুসত্তা থেকে person ও personality-কে নির্বাসন দিয়েছে, যা জমা রইল তা concrete individual নয়, কিন্তু concrete particular—ব্যাকরণের ক্লীবলিঙ্গ প্রথম পুরুষ একবচন। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তি মানে concrete individual, person বা personality। তাদের দার্শনিক ব্যাকরণে উত্তম পুরুষ এক বচনের প্রাধান্য। অস্তিত্ববাদের অহং-পুরুষ কস্তুরীমৃগ সম আপন গন্ধে পাগল হয়ে সংসার-অরণ্যে ঘুরে বেড়ায়। আপনা থেকে আপন বিচ্ছেদে আত্মহারা এই আত্মপুরুষ জগত থেকেও বিচ্ছিন্ন। এই দ্বিগুণ বিচ্ছেদ-জ্বালায় জর্জরিত আত্ম-পুরুষের আত্ম-জিজ্ঞাসার তাই কোনো বিরাম নেই। নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ নিত্য নূতন সমস্যা ও সামঞ্জস্যের দাবী নিয়ে অখণ্ড আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করছে। এই আত্মপুরুষ যেখানে নিঃসঙ্গ একাকী সেখানে তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা তুরীয় ভাবে ভোগ করার উপায় নেই, কারণ সমাজ সংসারের কলরব নিরন্তর এসে সেখানে আঘাত করছে। এই আঘাতকে স্বীকারও করা যায় না, অস্বীকারও করা যায় না। সুতরাং আত্মাও যেন দ্বিধায় পড়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। বাইরের সমাজ সংসার আত্মারই নেতিবাচক দিক, শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব তার ইতিবাচক দিক। আত্মা নিজে যা এবং যা নয় এই Being ও Nothing নিয়ে হল সত্তা বা Existence. Nothing মানে বস্তুহীন অভাব মাত্র নয়, একে ভারতীয় নৈয়ায়িকদের "অন্যোন্যাভাব" বলা যেতে পারে। গরু মানুষ থেকে আলাদা। মানুষের অভাব রয়েছে গরুতে। গরু অভাবের আধার, কিন্তু নিজে অবস্তু নয়। বিশুদ্ধ Being বা আত্মপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মেতর বহির্জগতকে এই

বিচ্ছেদের আধার হিসাবে Nothing বলা হয়েছে। তেমনি বহির্বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন মানবাত্মাকে ঐ একই বিচ্ছেদের আধার হিসাবে Nothing বলা যেতে পারে। এ অর্থে Being ও Nothing একই সত্তার দ্বৈতচরিত্র মাত্র ; Nothing সংজ্ঞাটি এখানে অভিধার্থে ব্যবহার করা হয় নি, হয়েছে লাক্ষণিক অর্থে। আধেয়ের দ্বারা আধারকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এই লক্ষণা নিষ্প্রয়োজন নয়। আত্মেতর থেকে আত্মার বিচ্ছেদের উপর গুরুত্ব অর্পণ করতে হলে একটি নৈতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত। এই বিচ্ছেদের গুরুত্ব প্রকাশ করার প্রয়োজনেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মেতর জগৎ বস্তুহীন নয় বলেই Nothing-এর অভিধার্থ এখানে বাধিত হচ্ছে। মুখ্যার্থ বাধিত হলেই লক্ষণার প্রয়োগ অনিবার্য। সুতরাং এই লক্ষণার সঙ্গে সঙ্গে Nothing শব্দটি দ্বারা অস্তিত্ববাদী দর্শনে 'আত্ম-বিচ্ছেদের' গুরুত্ব ধ্বনিত হচ্ছে। আত্মেতর জগৎ বোঝাতে Nothing শব্দটির লক্ষণা, আত্ম-বিচ্ছেদের গুরুত্ব প্রকাশ করতে ব্যঞ্জনা, একই শব্দের এই দুইটি শক্তি এখানে অনস্বীকার্য্য।

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষার সাহায্যে এই ভাবে সর্বাধুনিক অস্তিত্ববাদকে বুঝবার প্রচেষ্টা অনেকের কাছে আপত্তিকর হতে পারে। অস্তিত্ববাদের 'আত্ম দর্শন' অপরোক্ষানুভূতি বা intuition-এর উপর নির্ভরশীল হলেও একে বুঝতে হলে ব্যাখ্যা করতে হলে বিচার বুদ্ধির আলোকপাত ছাড়া উপায় নেই। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষাগুলি এত পরিচ্ছন্ন যে এখানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ কোন অর্থে কোন পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যান্য দর্শন থেকে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই দর্শন নৈয়ায়িক বিচার বুদ্ধি ও তর্ক বিতর্কের ধার ধারেনা। ফলে একই শব্দ কোথায় অভিধার্থে, কোথায় লাক্ষণিক অর্থে, কোথায় বা ব্যঞ্জনাগত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা বোঝা দুষ্কর। যেখানে ন্যায়শাস্ত্রের বিচার নেই এমন দর্শন সাহিত্যে পরিণত হতে বাধ্য। আর দর্শন সাহিত্যে পরিণত হলে, সাহিত্যের সাহিত্য melodrama-র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও, তর্কবিহীন দর্শনের সাহিত্য melodramatic হতে বাধ্য। তাই সার্ত্রের Being and Nothingness চিরাচরিত দর্শন-রসিকদের নিকট এক খণ্ড বিপুলকায় metaphysical

melodrama বলে মনে হবে। নৈয়ায়িকসুলভ-বিশ্লেষণবিহীন অপরূপ বাচনভঙ্গিমায় একই কথার বিভিন্ন আকারে এমন একঘেয়ে পুনরুক্তি মনন-ধর্মী দর্শনপাঠকের দার্শনিক রুচিকে পীড়িত করে। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু এক নয়। অথচ এ দুই-এর মধ্যে একটা দুরপনেয় সম্বন্ধ রয়েছে এই সহজ কথাটি বুঝানো হল এই ভাবে :

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ রয়েছে। অথচ চেতনা যা সে নয় সব সময় তারই কাছে উপস্থিত হয়। যা সে নিতান্তই নয় তাকে এড়িয়ে চেতনার অস্তিত্বই অসম্ভব। এর অর্থ হ'ল যা সে নয় তাই দিয়েই চৈতন্যের পরিচয়। এই নাস্তিত্ব নিয়েই চেতনার আবির্ভাব। অনন্ত বিচ্ছেদ নিয়ে যার আবির্ভাব অনন্ত বিচ্ছেদই তার পরিচয়। এই বিরহযাতনার কোনোদিন বিরাম নেই। তাই আমার অস্তিত্বের ভিতরে সব সময়ই একটা নাস্তিত্বের আর্ত্তনাদ আছে। অতএব জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়ের বিচ্ছেদ আমারই অন্তর্বিচ্ছেদের নামান্তর, কারণ নাস্তিত্ব আমার অন্তরঙ্গ সত্তারই একটা অঙ্গ। এই বিচ্ছেদ ঘুচোনোই আমার সমস্যা ; আমি যা আছি তা আমি হতে চাই না, যা নই তাই আমি হতে চাই। আমি এখন হোটেলের পরিচারক, কিন্তু এই পরিচারকই আমি নই। ধরুন আমি চাই সাংবাদিক হতে বা মন্ত্রী হতে। এর অর্থ, এই 'পরিচারক আমি'র নিকট থেকে আমাকে আমি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে, যা আমি নই সেই ভাবী মন্ত্রী বা সাংবাদিক রূপে আমাকে আমি পুনর্গঠিত করতে চাই। এই ভাবে ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমান আমিত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে নিত্য নূতন ক'রে আমাকে আমি পুনর্গঠিত করি। আমি এখনো যা হয়ে উঠিনি কি ক'রে তা হয়ে উঠতে পারি আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এই পুনর্বিন্যাসের নিরন্তর প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই পুনর্বিন্যাস কোনো দিন পূর্ণ হবে না। আমার বিচ্ছেদ চিরন্তন। আমার নাস্তিত্বস্বরূপ দুরতিক্রম্য।

সহজকে সুগম্ভীর করা, obviousকে profound করার এই নিদর্শন মেনে নিয়েও দার্শনিক বিচারে একটা কথা হেঁয়ালি বলেই মনে হয়। আমি গরু নই সত্য, কিন্তু গরুর নাস্তিত্বটা আমি হলাম কি ক'রে? 'আমি গরু নই, এই সরল বাক্যটির এ জাতীয় দুর্বিষহ গম্ভীর অর্থ করলে সার্বজনীন ভাষাবোধের দুরন্ত ব্যভিচার করা হয়। আমি রাজা নই, রাজা হতে চাই,

ভাল কথা। যদি রাজা হতে পারি, সাংখ্য দর্শন বলবে, বর্তমান আমির মধ্যে রাজা হবার সুপ্ত শক্তি ভবিষ্যতে জাগ্রত ও অভিব্যক্ত হবে। এ কথা বুঝতে পারি। কিন্তু যখন আমি রাজা নই, তখন ভবিষ্যৎ রাজার বর্তমান নাস্তিত্বটাই আমার আমিত্ব, এটা দার্শনিক বিচারের কথা নয়, দর্শনের আকারে বুদ্ধির ওপর হেঁয়ালিপনার দৌরাত্ম্য। মাটি থেকে ঘট তৈরী হবার আগে পর্যন্ত ঘটের যে অভাব রয়েছে নৈয়ায়িক তার নাম দিয়েছেন 'প্রাগভাব', অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হবার পূর্ব পর্য্যন্ত বস্তুর অভাব। ঘটের প্রাগভাব মাটিতে আছে বটে, কিন্তু ঘটের প্রাগভাবটাই মাটি নয়, বা ঘটের প্রাগভাব দিয়ে মাটিটা তৈরী হয়নি। উপনিষদ 'নেতি নেতি' বলে আত্মতত্ত্ব বুঝাতে চেয়েছে। কিন্তু নাস্তিত্বটাকেই আত্মস্বরূপ বলেনি। প্রথম দিকে ভারতীয় দর্শনের পরিভাষার মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদকে আমরা যেভাবে বুঝতে চেয়েছি সে ভাবে হয়ত কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু অস্তিত্ববাদীর নিজের ভঙ্গীতে যা বলার চেষ্টা করা হল ওটা বোধ হয় অপচেষ্টারই সামিল। সাত্র্র Being and Nothingness-এর ইংরেজী অনুবাদের ভাষা তাঁর দর্শনের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয় (ফরাসী জানিনা বলে বলছি)। অর্থাৎ এই ভাষা ভাষার কাজ করেনা, লেখক ও পাঠককে সমান বোধ, সমান চেতনার অংশীদার করে না, বরং অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির সমস্ত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে লেখক ও পাঠকের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্বিষহ ব্যবধান গড়ে তোলে। দর্শন থেকে দার্শনিকের এই বিচ্ছেদ মর্মান্তিক। যে দর্শন জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ককে একটা দুঃসহ দুর্লঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ ব'লে ভূমিকা সুরু করেছে এবং একটা নিঃসহায় নাস্তিত্বকে ব্যক্তিপুরুষের স্বরূপ ব'লে ধরে নিয়েছে, সে দর্শনকে অস্তিবাদী বলা বিপরীত লক্ষণার নামান্তর মাত্র, কারণ মুখ্যার্থের বিচারে এর নাম হওয়া উচিত ছিল নাস্তিত্ববাদী দর্শন।

সাত্র্ যে ভাবে মানবচেতনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা থেকে চেতনাকে স্বপ্রকাশ বা পরপ্রকাশ কোনটাই বলা যায় না। সাত্র্ বলেন জ্ঞেয় থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লেই জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিচ্ছেদকে যখন জ্ঞানের স্বরূপ বলে ধরা হয়েছে তখন যার থেকে বিচ্ছেদ তাকে বাদ দিয়ে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, তাই জ্ঞেয় বিষয়কে বাদ দিয়ে জ্ঞানের স্বরূপ লাভও সম্ভব নয়। এই অর্থেই জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এখন জ্ঞানের

আবির্ভাব স্বরূপলাভ বা প্রকাশ একই কথা। তাই নিরন্তর পরনির্ভরশীলতার জন্য জ্ঞান স্বপ্রকাশ হতে পারে না। এ জাতীয় 'বিচ্ছেদ-যাতনা'-মুখর ভাষা ব্যবহারের বিপদ হল এই যে কেউ অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করে বলতে পারেন—গরু গণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছেদ গরুর আত্মস্বরূপ। সুতরাং গো-স্বরূপ গণ্ডারের ওপর নির্ভরশীল। অস্তিত্ববাদী এর উত্তরে বলবেন—আমি যে বিচ্ছেদের কথা বলেছি তা শুধু চেতনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, চেতনা-বহির্ভূত বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজ্য নয়। কিন্তু এ যুক্তির কথা নয়, অনুশাসনের কথা।

জ্ঞান পর-প্রকাশ ও নয়। জ্ঞেয় জগৎ থেকে জ্ঞানের অনুমান করা যায় না। কিন্তু জ্ঞান থেকেই জ্ঞেয় জগতের অনুমান করা সম্ভব। এর অর্থ জ্ঞানের দ্বারাই বিষয় প্রকাশিত হয়, প্রকাশিত হয় বলেই তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাত্র্ পাঠকদের সতর্ক ক'রে দিলেন—এর মানে এই নয় যে জ্ঞান জ্ঞেয় অপেক্ষা স্বাধীন বা প্রাচীন। কিন্তু জ্ঞান বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে চ'লে যায়, ( transcends the world ), জ্ঞান নিজেই একটা প্রকাশযোগ্য বিষয় নয় ( not itself a phenomenon )। জ্ঞান পরবর্তী কোনো জ্ঞান অর্থাৎ অনুব্যবসায় বা introspection দ্বারাও প্রকাশ্য নয়। ভারতীয় নৈয়ায়িক বলেন—জ্ঞান পরবর্তী অনুব্যবসায় দ্বারা প্রকাশিত হয়। আমার বর্তমান কালীন ঘট-জ্ঞান পরক্ষণে 'আমি ঘট জানি' এইরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানেয় বিষয় রূপে প্রকাশিত হয়। এর উত্তরে স্বপ্রকাশবাদী বলেন—তাহলে অনবস্থা দোষ বা infinite regress অপরিহার্য্য। এই দ্বিতীয় জ্ঞান আত্মপ্রকাশের জন্য তৃতীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করবে, তৃতীয় জ্ঞান চতুর্থ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখবে। সুতরাং কোনো জ্ঞানই কোনো দিন প্রকাশিত হবেনা। সাত্র্ পর-প্রকাশবাদীদের বিরুদ্ধে এই একই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

জ্ঞান স্বপ্রকাশও নয়, পর-প্রকাশও নয়, কিন্তু প্রতিক্ষণে নিজকে নূতন করে পুনর্বিন্যস্ত করছে—এর দ্বারা জ্ঞানতত্ত্ব যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। এই নাস্তিরূপী অস্তিবাদের রহস্য আরও ঘনীভূত হয় যখন ভাষার সঙ্গে চেতনার মিল্ লোপ পায়। অস্তিত্ববাদীর মতে আমি যখন গরু দেখছি তখন দর্শন-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই 'আমি গরু নই' এই নাস্তিত্বও আমার

'আত্মস্থ' হয়ে গেল। এর অর্থ দাঁড়ায় আমার গরু দেখা আর আর 'আমি গরু নই' একই কথা। কারণ চেতনামাত্রই নাস্তিরূপে জগতে আবির্ভূত হয়। তা হলে 'আমি গরু দেখছি' এবং 'আমি গরু নই'—এই দুটি বাক্য সমার্থক। যদি বলা হ'ত দ্বিতীয় বাক্যার্থটি প্রথম বাক্যার্থ দ্বারা ব্যঞ্জনা শক্তির মাধ্যমে ধ্বনিত হচ্ছে তা হ'লে হয়ত বিশেষ আপত্তিকর কিছু ছিল না। কিন্তু তাহলে অস্তিত্ববাদ মূলেই নির্মূল হয়ে যেত। অস্তিত্ববাদের গোড়ায় কথাই হ'ল—নাস্তিরূপ ছাড়া চেতনার প্রকাশ বা আবির্ভাবই সম্ভব নয়। সুতরাং 'আমি গরু দেখছি' আর 'আমি গরু নই' এ দুটো একই জ্ঞান। অতএব বলতেই হবে 'আমি গরু দেখছি' এবং 'আমি গরু নই' এই বাক্য দুটি মুখ্যার্থের দিক থেকেও সমার্থক। যদি অস্তিত্ববাদী বলেন—'এই আমার তর্কাতীত অনুভূতি', এর উত্তরে পাঠক শুধু বলতে পারেন—'আমার অনুভূতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার আপনার মধ্যে কোনো সাধারণবোধ্য ভাষার মাধ্যম নেই। আপনি যদি বলেন যে আপনি মুরগী খাচ্ছেন, আমি কখনো মনে করতে পারব না যে আপনি আমাকে বুঝাতে চাইছেন যে আপনি নিজে একটা মুরগী নন। আর যদি প্রত্যেকের নিজস্ব অনুভূতি ভাষাতীত হয় তাহলে হতচ্ছাড়া মানব সমাজ একদিনও টিঁকত না। সমাজ সংসার সবই মিছে হত। সকল ভাষার কলরব একদিনে মুছে যেত।

সার্ত্রের সাহিত্য যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরা যদি তাঁর গুরুগম্ভীর দার্শনিক গ্রন্থ বুঝতে না পারেন, তবে সমস্ত দোষটা পাঠকের বোধ-দৈন্যের উপর চাপিয়ে দেয়াটা সঙ্গত হবে না। সাহিত্যের মত দর্শনশাস্ত্রও অনুভূতি মাত্রই নয়, কিন্তু ভাষার সাধারণ মাধ্যমে অনুভূতির সার্থক প্রকাশ। সার্ত্রের দর্শনে এই প্রকাশ কেন ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিক থেকে তা আলোচনা করা যাক। আমার কাছে আমি ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ, কিন্তু আপনি মধ্যম পুরুষ। আবার আপনার কাছে আপনি উত্তম পুরুষ, কিন্তু আমি মধ্যম পুরুষ। এক ব্যক্তি-পুরুষ যখন অন্য কোন ব্যক্তি-পুরুষের চেতনার বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়, তখনই উত্তমপুরুষ মধ্যমপুরুষের চরিত্র অর্জন করে। অর্থাৎ একই জ্ঞাতৃপুরুষ একাধারে বিষয় ( object ) ও বিষয়ী ( subject )। কিন্তু অস্তিত্ববাদের মূল সূত্র অনুসারে আমার বহির্জগতে আপনি রয়েছেন এবং আপনার বহির্জগতে আমি রয়েছি, এবং চেতনা ও চেতনার বহির্ভূত বিষয়-

জগতের মধ্যে রয়েছে এক দুস্তর ব্যবধান। সুতরাং আপনার ও আমার মধ্যেও দুর্নিবার বিচ্ছেদ স্বীকার ক'রে নিতে হবে। তা'হলে মানুষে মানুষে যোগাযোগটা কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? Solipsism বা স্ব-বিজ্ঞানবাদের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি? মানবদরদী অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মানবিক সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন না, তাই Solipsism স্বীকার করতে পারেন না। তাঁকে ঘোষণা ক'রে বলতে হয়—আমি নিজেই যে অন্যের চেতনার বিষয় এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, অথচ আবার বলতে হয়—আমি যখন অন্য এক চেতন ব্যক্তিকে জানি, বুঝি, ভালবাসি বা ঘৃণা করি, তখন আমি তার শুদ্ধ বিষয়ী স্বরূপটিকে ( subjectivity ) জানি না, তার বিষয়-স্বরূপটিকেই ( objectivity ) জানি। কিন্তু চেতনের সঙ্গে চেতনের সম্পর্ক চেতন ও অচেতনের সম্পর্ক থেকে স্বতন্ত্র। এটা ঠিক বস্তুজগতের সম্পর্ক নয়। ব্যক্তি-চেতনা অচেতন বস্তুর উপর নির্ভরশীল হয়েও বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে, কারণ এই নির্ভরশীলতা এক মৌলিক বিচ্ছেদের আকারে আকারিত হয়। এই অর্থে আমার ব্যক্তিত্ব transcendental বা অতিক্রান্তিশীল। এখন আমি নিজেই যদি অন্য এক চেতনার বিষয় হয়ে পড়ি, তা হ'লে সেই অপর বিষয়ী চৈতন্য আমার অতিক্রান্তিশীল সত্তাকেও অতিক্রম করে যাবে, কারণ বিষয়কে অতিক্রম করাই বিষয়ীর স্বভাব। সুতরাং চেতনের সঙ্গে চেতনের সম্পর্ক ( inter-subjective relation ) হল অতিক্রান্তিকে অতিক্রম করার সম্পর্ক, double transcendence বা double negation.

এখানে ঘনগম্ভীর আড়ম্বর ক'রে যা বলা হ'ল তা কিন্তু সামান্যই। চেতন মানুষের সম্পর্কটা যে unique বা স্বতন্ত্র অন্য বস্তুজাগতিক সম্পর্কের মত নয়, সে কথাটাই ঘটা ক'রে বলা হ'ল। চেতন মানুষই অচেতন বস্তুকে জানে, অচেতন চেতনকে জানে না। কিন্তু দুজন মানুষ একে অন্যকে জানে। পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই জ্ঞাতা, প্রত্যেকেই জ্ঞেয়। এই সহজ সত্যটিকে 'Transcendence is transcended' এ জাতীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জমকালো ভাষার চাপরাস চাপিয়ে আচ্ছাদিত করা হ'ল কেন? জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্পর্ককে প্রথম থেকেই মিলন-প্রধান সম্বন্ধ না ব'লে, বিচ্ছেদ-প্রধান সম্বন্ধ ব'লে কল্পনা করাটাই এই আড়ম্বরের কারণ। বিচ্ছেদের অন্ত নেই বলেই মিলন প্রচেষ্টার শেষ নেই। কিন্তু যারা জ্ঞাতা সেই মানুষই যখন পরস্পর

জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, তখন সম্বন্ধটা বিচ্ছেদভিত্তিক ব'লে ধারণা করা খুবই কষ্ট কল্পনা। স্পষ্টতই মানবিক সম্বন্ধগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনার সাদৃশ্য বা মিলনকে ভিত্তি ক'রেই অনুভূত হয়। কিন্তু অস্তিত্ববাদী 'স্বসিদ্ধান্ত-হানির' ভয়ে একথা বলতে পারেন না। সুতরাং বিভিন্নতাকে বিচ্ছিন্নতার পর্য্যায়ভুক্ত ক'রে নিয়ে মানবিক সম্বন্ধের মধ্যেও বিচ্ছেদমূলক নাস্তিত্বপ্রাধান্য আমদানী করতে হয়েছে। এর ফলেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের পাতায় পাতায় separation, alienation, discontinuity, transcendence, double transcendence প্রভৃতি negative terminologyর একঘেয়ে মিছিল চলেছে।

যাই হোক, অস্তিত্ববাদী দর্শন solipsism-এর হাত থেকে ব্যক্তি-মানুষকে কি ক'রে রক্ষা করতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধানটাও একটা সম্বন্ধ, এ কথা ব'লে solipsism দূর করা যায় না। অথবা 'আমি অন্যকে জানি এবং অন্যে আমাকে জানে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ'—একথা একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ঘোষণা হতে পারে, কিন্তু বিঘোষিত বিশ্বাসটাই যুক্তি নয়। অথবা 'বস্তুতে বস্তুতে যে সম্বন্ধ এবং চেতনের সহিত অচেতন বস্তুর যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ তা থেকে মানুষে মানুষে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্পর্কটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র' —এই স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণাটাও অকাট্য প্রমাণ নয়, বিশেষ ক'রে যেখানে মূল দার্শনিক প্রত্যয়টা বিচ্ছেদমুখীন। সার্ত্রের গভীর সংবেদনশীল মানবদরদী হৃদয় এবং দার্শনিক মননশীল মানস—এ দুইয়ের ভিতরে একটা বৈপরীত্য রয়েছে। বিশ্লেষণী যুক্তির কাছে মানুষ ও বস্তুজগৎ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে 'বিশ্লেষ'টাই বড় হ'য়ে দেখা দেয়। শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 'বিশ্লেষ' মর্মান্তিক ভাবে হৃদয়কে আঘাত করে। হৃদয়ের দাবী,—মিলতে হবে। নিজের মধ্যে অপরের নাস্তিত্বরূপটাকেই মানুষের শেষ কথা বলে হৃদয় মেনে নিতে পারে না। মেলবার ও মেলাবার প্রচেষ্টা হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মনন ও সংবেদনের এই বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে গিয়ে মানব-দরদী অস্তিত্ববাদী দর্শন একটা চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে—'অন্তহীন বিচ্ছেদের মধ্যে বিরামহীন মিলন প্রচেষ্টা—এই মানুষের ভাগ্য। বিচ্ছেদের শেষ নেই, তাই মিলনের পূর্ণতা নেই'—'Man is condemned to be free'

—'Liberty is lack of being in relation to given being and not the emergence of a positive being'.

মানুষের স্বাধীনতার এই অদ্ভুত ধরণের negative definition বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপস্থিত বর্তমানকে মানুষ চায়না, এই না চাওয়ার ক্ষমতাটাই মানুষের স্বাধীনতা। এখানেই তার দায়িত্ববোধ ও কার্যকলাপের উৎস। অনীপ্সিত বর্তমানকে অতিক্রম করে ঈপ্সিত ভবিষ্যতের মধ্যে মানবসত্তার যে পুনর্বিন্যাস সেই অস্তিবাচক দিকটা বাস্তব নয়, সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু অনীপ্সিত বর্তমান থেকে মানবাত্মার যে বিচ্ছেদ-বাসনা সেই নাস্তিবাচক চরিত্রটাই হ'ল স্বাধীনতার বাস্তব সত্তা ( facticity )।

মানুষের স্বাধীনতার দার্শনিক লক্ষণ নির্ণয়ে negative চরিত্রটাকে যদি প্রধান ব'লে ধরে নিতে হয়, তবে মানুষের ব্যক্তিসত্তার গভীরতা খুঁজতে হয় একটা নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যে। অনীপ্সিতকে না চাইতে পারাটাই স্বাধীনতা, সেই emergence of a positive being, ঈপ্সিতের অস্তিধর্মী আবির্ভাব স্বাধীনতার অন্তরঙ্গ সত্তা নয়, এর ন্যায়সংগত অর্থ দাঁড়ায়—একটা নিঃসীম শূন্যতার নিরাবরণ হাহাকারই হ'ল আত্মিক স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। যদি বলা যায়, যা নাই তাইতো আমি চাই, সুতরাং এই শূন্যতা-বোধটাই তো মুক্তির মূলমন্ত্র, তাহলে একটা মারাত্মক দার্শনিক ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়। কি আমি চাই তার positive ধারণা না থাকলে কি আমার নাই তার বোধ হতে পারে না। তাই নৈয়ায়িক বলেছেন—যা positive সেই 'প্রতিযোগী'র বোধ ছাড়া negation-এর বোধ থাকতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধ negation কোন সত্তার স্বরূপ লক্ষণ হতে পারে না। নিষ্কৃতিই মুক্তি নয়, positive-এর প্রাপ্তিই মুক্তি। নিষ্কৃতি মাত্রকে মুক্তি বললে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি সেই অপাদান কারকটির মধ্যেই সমস্ত positive content সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, নূতনের সঙ্গে যোগটাও দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়ে না। সুতরাং কর্তৃকারকরূপী মানুষটির উভয় প্রান্তেই বিচ্ছেদ জমে ওঠে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এক নিরালম্ব নিরাধার নিঃসঙ্গ 'স্বাধীন' ব্যক্তিসত্তা—যার অপর নাম solipsism। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক solipsism মানেন না। অথচ তাঁর সমস্ত সংজ্ঞা ও পরিভাষা-শাস্ত্রে নাস্তিত্ববাচক শব্দসম্পদের প্রাধান্য, নাস্তিধর্মী চরিত্রের উপর অর্পিত অকাতর গুরুত্ব এই solipsism বা 'স্ব-সংবেদনবাদের'

দিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায়। এজন্যই অস্তিত্ববাদী দর্শনের আশাবাদের ভিতরেও মাঝে মাঝে অবসন্ন নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদর্শন 'স্ব-সংবেদন'কেই একমাত্র প্রামাণিক সত্তা বলে স্বীকার করেছে। তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা কি করে সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ তাঁর যুক্তির প্রতি একনিষ্ঠ নিষ্ঠা রেখে উত্তর করলেন—এই যোগাযোগটা পারমার্থিক সত্য নয়, ব্যবহারিক সত্য মাত্র, বৌদ্ধ পরিভাষায় 'সাংবৃত সত্য'। তাহ'লে অহিংসা, প্রেম, মৈত্রী, করুণা, সৌভ্রাত্র, কার জন্য? সংঘের শরণ নিয়েই বা লাভ কি? এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য বৌদ্ধ দার্শনিক প্রস্তুত ছিলেন। উত্তর করলেন, ব্যবহারিক সত্য পারমার্থিক সত্যের সোপান হিসাবে কাজ করে। সবাই মিলে সবাইকে ভালবাসব এইজন্য, যাতে সবাই মিলে উপলব্ধি করতে পারি যে পারমার্থিক সত্যের ভূমিতে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিল নেই, এক-ক্ষণের আত্মার সঙ্গে পরক্ষণের আত্মারও কোনো মিল নেই, এক স্থির আত্মা বলে কিছু নেই, আছে শুধু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নিরন্তর প্রবাহবাহিত এক একটি নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ক্ষণিক বিজ্ঞান। এ নৈরাত্ম্য-ভাবনাই নির্বাণের সাধনা। হিংসা-দ্বেষ-বৈরিতা এই অদ্বৈত নৈরাত্ম্য-সাধনায় বিঘ্নসৃষ্টি করে। মানুষকে আত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই নিরাসক্তভাবে প্রেম মৈত্রী করুণা ও সংঘের উপাসনা প্রয়োজন। সাধনাটা ব্যবহারিক সত্য, নৈরাত্ম্য পারমার্থিক সত্য। উপনিষদও বলেছে—'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে', ভর্তৃহরি বলেছেন—'অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে'।

বলা বাহুল্য, অস্তিত্ববাদী দার্শনিক এ জাতীয় চরম মতবাদ চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু কেন করেন তার কোন ন্যায়শাস্ত্রসম্মত দার্শনিক যুক্তি দেখাতে পারেন না। ফলে এই দার্শনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সদর দরজা দিয়ে না হলেও খিড়কি দুয়ার দিয়ে solipsism অনুপ্রবেশ করে। এখানে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শন এবং শব্দাদ্বৈতবাদী ভর্তৃহরি-দর্শনের একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। আমরা পারমার্থিক চিন্তাটা স্থগিত রাখলাম। ব্যবহারিক জগতের ব্যবহারিক জীব হিসাবেই যদি আমরা চিন্তা করি, ব্যবহারিক সত্যকেই যদি সত্য ব'লে মেনে চলি তা হ'লে solipsism-এর হাত থেকে যা আমাদের শত হস্ত দূর রাখে সে হ'ল মানুষের ভাষা। মানুষের ভাষাই

হল solipsism-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রমাণ ও প্রতিবাদ। ভাষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখেও ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মিলিত করে। সুতরাং ভাষার ক্ষমতাই মানুষের transcendence-এর ক্ষমতা। যেখানেই ভাষার ব্যবহার সেখানেই ব্যক্তির নির্ব্যক্তীকরণ বা de-personalisation অবশ্যম্ভাবী। না হ'লে পরস্পর বিভিন্ন দুইটি বি-ষম মানুষ সমার্থবোধের অংশীদার হ'তে পারত না। মানুষ বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়, তার প্রধান প্রমাণ,—মানুষ বাঙ্ময়। মনের সঙ্গে মনের মিলনের প্রথম নিদর্শন বক্তা ও শ্রোতার মিলন। আপনি গাছ বললে আমি গাছ বুঝি, আমি পাথর বললে আপনি পাথর বোঝেন। আমাদের কথাগুলো গাছ পাথর কাঁধে নিয়ে ব'য়ে বেড়ায় না, আপনার আমার মগজের মধ্যেও গাছ পাথর গজায় না। তবুতো আমরা পরস্পরকে বুঝি। তা হ'লে গাছ পাথর সম্পর্কে এমন একটি সাধারণ ধারণা বা concept আছে যেখানে আমি আপনি তফাৎ নই। অর্থবোধক শব্দ এই concept-এর বাহন। বাহন বললেও ঠিক বলা হল না। বাহন থেকে আরোহীকে আলাদা করা যায়। কিন্তু শব্দ থেকে concept আলাদা করা যায় না। একেই বলে শব্দার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। শব্দ যখন অসাধারণ ব্যক্তিকে সাধারণ করে তখন সে নিজকেই নিজে সাধারণ করে। আমি যখন ভাষার অর্থ বুঝি তখন ভাষাকেও আর বায়ু-তরঙ্গের অভিঘাতসমষ্টি হিসাবে গ্রহণ করিনা, গ্রহণ করি সাধারণ অর্থবোধের অন্তরঙ্গ অঙ্গ হিসাবে। সুতরাং ভাষার সাধারণীকৃতি ত্রিমুখী। প্রথমতঃ—ভাষা আমাদের চেতনাগ্রাহ্য বস্তু ব্যক্তিকে একটা সাধারণ ধারণা, concept, universal বা 'সামান্যে'র আকারে রূপায়িত করে। এই সমানীকৃত সামান্যই চেতনাকে রূপ দান করে, অর্থজ্ঞানকে আকার দান করে। দ্বিতীয়তঃ—এই সামান্য বা universal-এর সমান ভূমিতে বক্তা ও শ্রোতার ব্যক্তিচেতনা পরস্পর মিলিত হয়। এই অর্থে বক্তা ও শ্রোতার ব্যক্তিসত্তারও সাধারণীকরণ সম্পাদিত হয়। তৃতীয়তঃ—শব্দও তার বায়ু-তরঙ্গরূপ বস্তু-ব্যক্তিত্ব অতিক্রম ক'রে সাধারণ অর্থের মধ্যে সাধারণ্য প্রাপ্ত হয়। এই তিন ধরণের সাধারণীকরণ তিনটি পৃথক ব্যাপার নয়। একই সাধারণীকরণের তিনটি দিঙ্‌নির্দেশ মাত্র। প্রকৃত পক্ষে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান একই সাধারণী-করণের ভিতরে একাত্মতা লাভ করে।

এই একাত্মতা প্রতিষ্ঠা দার্শনিক ভর্তৃহরিকে সর্বকালের এক অলোক-সামান্য চিন্তানায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বিষয়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে ভর্তৃহরির শব্দাদ্বৈতবাদের অনেকাংশে গুরুতর প্রভেদ রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিক যখন বললেন, বিশুদ্ধ ব্যক্তি বা 'স্ব-লক্ষণ' শব্দাতীত, তখন প্রকারান্তরে একথাই মেনে নেয়া হল যে মানুষের ব্যবহারিক জগতে solipsism বা 'স্ব-সংবেদনবাদ' অগ্রাহ্য। মানুষের চেতনায় শব্দ কখনো অর্থকে বিশুদ্ধ ব্যক্তিরূপে উপস্থিত করতে পারেনা, উপস্থিত করে বিভিন্ন মানুষ কর্তৃক সমানভাবে গ্রাহ্য 'সামান্য' রূপে। অসামান্যকে সামান্যে পরিণত করার শক্তিই শব্দশক্তি। কিন্তু অর্থের সামান্যীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও 'সমানীভবন' মেনে নিতে হয়। বৌদ্ধ দার্শনিক এই 'সামান্যের' বাস্তব সত্তা স্বীকার কনেন না, কিন্তু 'সংবৃতি সত্তা' স্বীকার করেন। 'সংবৃতি-সত্তা' শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক সত্তারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। 'সামান্য' বিকল্প বা abstraction হলেও, এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে ব্যবহারিক যোগাযোগ সাধিত হয়। যে মুহূর্তে শব্দার্থ বস্তু-ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সেই একই মুহূর্তে মানুষ-ব্যক্তিও তার 'দ্বীপধর্মিতা' বা insularity অতিক্রম করে। ব্যক্তি মানসের ঊর্ধ্বে সমাজ-মানসের অস্তিত্বও এই জন্যই স্বীকার করতে হয়।

এখন প্রশ্ন উঠবে abstraction কি বাস্তব? যার বস্তুসত্তা নেই, কিন্তু শব্দানুপাতী একটা সাধারণ' ধারণা মাত্র আছে তারই নাম দেয়া হয়েছে 'বিকল্প'। বৌদ্ধ দার্শনিক প্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ধর্মকীর্তি। তিনি শত শত পৃষ্ঠা ধরে শাণিত যুক্তি ও বিস্ময়কর বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সামান্য বা universal বিকল্প মাত্র, বাস্তব নয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তব নয়। কিন্তু মানুষের ভাষার এমনি মহিমা যে বস্তুজগতে যা নেই তাকেও সামান্যাকারে মানবিক ধারণার মধ্যে বর্তমানরূপে উপস্থিত করে। মানুষের ভাষা নাস্তিকে অস্তিরূপে মানবচেতনায় প্রতিফলিত করে। এ জন্যই সামান্যকে বাস্তব বলা যায় না, অথচ ব্যবহারিক জগতে এর উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না। এই বলেই সুনিপুণ দার্শনিক সতর্ক হয়ে গেলেন—এ জাতীয় বিকল্প ধারণা যে মানুষের চেতনায় উপস্থিত হয়, সেই উপস্থিতিকে তো অবলুপ্ত করা যায় না। বিকল্পের সত্তা নেই, তার মানে

কি এই যে ধারণার উপস্থিতিটাই মিথ্যা? একথা বললে ত স্ব-সংবেদন-রূপী স্ব-লক্ষণটিও মিথ্যা হয়ে যাবে। তখন বলতেই হল—বিকল্প স্বরূপগত ভাবে মিথ্যা নয়, কিন্তু তার বস্তু-নির্দেশ-সম্বন্ধ বা referential relationটি মিথ্যা। বিকল্প স্বাতিরিক্ত কোনো বস্তুকে নির্দেশ করে না। অর্থাৎ শব্দার্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধটা শব্দ ও বিকল্পরূপী সামান্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিকল্পাতিরিক্ত কোনো বস্তু শব্দার্থ নয়।

কিন্তু একথা ব'লে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শন এক বিপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য। বিকল্প বা সামান্য স্বরূপগতভাবে মিথ্যা নয়, একথা স্বীকার করলেই আমাদের বর্তমান আলোচনার দার্শনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বিকল্প স্বরূপগত ভাবে সত্য--এর দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিক বোঝাতে চেয়েছেন, আপনার চেতনাধৃত সাধারণ ধারণাটি আপনারই আয়ত্ত, আমার নয়। এবং আমার চেতনাধৃত সাধারণ ধারণাটি আমারই আয়ত্ত, আপনার নয়। কিন্তু এতো পারমার্থিক প্রবক্তার কথা হল, 'সাংব্যবহারিকের' কথা নয়। বিজ্ঞানবাদীর পারমার্থিক তত্ত্ব আমরা আলোচনা করছি না, ব্যবহারিক তত্ত্বই আলোচনা করছি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধমত গ্রহণ করলে একথাও মানতে হয় যে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অর্থবোধের কোনরূপ সমতা নেই। দুজনে একই শব্দ বা বাক্যের দ্বারা একই অর্থ বোঝেন না। মানুষের ভাষা থাকা না থাকা একই কথা। ভাষাটা পেটের ভিতরে appendix-এর মত একটা বর্জনীয় বাহুল্যমাত্র। কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন 'বইখানা দিন', আমি বই খানাই দিই, আপনি যা চেয়েছেন তাই পেয়ে খুসী হন। তেমনি আমি টাকা চাইলে যদি আপনার কাছ থেকে টাকা পাই, আমিও খুসী হই। দুজনের সাধারণ ধারণার মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে, তাহলে ভাষা ব্যবহারের পর বস্তু সম্পর্কিত ব্যবহারে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঐক্য কি করে সম্ভব হল। বৌদ্ধ বললেন, আপনার আমার ধারণা এক নয়, কিন্তু অনুরূপ। কিন্তু কি করে বুঝব অনুরূপ? আমরা দুটি ব্যক্তি নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত—স্বতন্ত্র পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি 'সাধারণ ধারণা' নিয়ে নিজ নিজ গুহার মধ্যে আত্মরাম হয়ে বসে আছি। তবু একথা বুঝতে পারছি যে আমাদের দুজনের ধারণা এক না হলেও অনুরূপ বটে। এই আনুরূপ্যের বোধটা কোথা থেকে আমদানী হল? দুটি ধারণাকে অনুরূপ বলে বুঝতে হলে এমন একটি অতিক্রান্তিশীল

ধারণা-রূপ দরকার, যার ভিতরে আনুরূপ্যটা প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয়। আবার সেখানেও যদি আনুরূপ্যের প্রশ্ন ওঠে, অনবস্থা দোষ বা Infinite regress অপরিহার্য্য। সুতরাং যখনই বলি স্বরূপগত-ভাবে বিকল্প সত্য, তখনই স্বীকার করতে হয় বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বিধৃত সাধারণ ধারণাটি দুটো বিকল্প নয়, কিন্তু এক ও অখণ্ড। এর অর্থ, abstraction মিথ্যা নয়, ঘোরতর সত্য। চেতনাবহির্ভূত ধারণা অসম্ভব। তাই ধারণার ঐক্য মানে চেতনার ঐক্য। এই ঐক্যকে অস্বীকার করা আর মানুষের ব্যক্তি-সত্তাকে দ্বীপান্তরে নির্বাসন দেয়া একই কথা। এই জন্যই মানুষের ভাষার ভিত্তিতে যে সমাজমানস গঠিত হয়, তা মিথ্যা abstraction নয়। সে abstraction-এর এমন এক বাস্তব সত্তা রয়েছে, যাকে শুধু বিমূর্ত ভাবনা বা metaphysical non-sense বলে উড়িয়ে দিলে মানুষের বনিয়াদকেই উড়িয়ে দিতে হয়। একে Idealism-ই বলুন আর Materialism-ই বলুন, নিজের সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্যকলাপকে অস্বীকার না করে একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

বেশ কিছুদিন থেকে আমরা এমন একটা অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি যে 'concrete' বললেই যেন একটু প্রশংসার স্পর্শ পাই আর 'abstract' বললেই বিরূপ হয়ে ভাবি, 'গালাগালি দিচ্ছে'। শব্দের ব্যবহারে আমরা অনেক সময়ই অনিচ্ছাকৃত ব্যভিচার ঘটিয়ে থাকি। concrete মানেই বস্তু-গৌরবে মহীয়ান এক উজ্জ্বল সত্য নয়। আর abstract মানেই বস্তুহীন অগৌরবের ধূম্রমায়া নয়। বরং দার্শনিক বিচারে এ কথাই সত্য যে concrete-কে যে পর্য্যন্ত abstract-এ পরিণত করিতে না পারি সে পর্য্যন্ত কোন কিছুই জানা সম্ভব নয়; ভাষার মাধ্যমে concrete যদি abstract হয়ে না উঠত, মানুষে মানুষে মুখ দেখাদেখি হত না। এমন কি মার্কস যখন আহ্বান জানালেন 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও', তখনো এই আহ্বানের দার্শনিক ভিত্তি ছিল abstract labour-এর ধারণা। মানুষের শ্রমকে শুধু concrete হিসাবে দেখলে শ্রমিক ঐক্যের কোনো সাধারণ ভিত্তি থাকে না। abstract মানে মিথ্যা হলে শ্রমিক ঐক্যও মায়া।

মানুষ যেদিন কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই মানবিক চেতনার ঐক্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। সমাজের ভিতরে বিরোধ, সংঘাত, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, সব কিছু নিয়েও এই ঐক্য আরও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ভাষার সমৃদ্ধি ও

গভীরতা এবং এই ঐক্যের পরিব্যাপ্তি দোসররূপে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাষার এই সাধারণীকৃতির অসাধারণ গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সাহিত্যে আমরা যে সাধারণীকৃতির কথা আলোচনা ক'রে থাকি তা এই সাধারণ মানুষের সাধারণ ভাষার মৌলিক সাধারণীকৃতিরই এক উন্নততর, গভীরতর রূপ। ভিত্তি ছাড়া ইমারত হয় না। বহু আধুনিক কাব্যসাহিত্য যে রসোত্তীর্ণ হয় না, তার কারণ মানবিক ভাষা-ভিত্তিই সেখানে স্খলিত ও বিপর্য্যস্ত। শূন্যোদ্যান হয়ত বেবিলনে ছিল, কাব্যে সাহিত্যে কোনদিন ছিল না।

# দার্শনিক হিরাক্লিটাস

[ বিশ্বশান্তি সংসদ ১৯৬১ সালে যে সমস্ত জয়ন্তী পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন তার মধ্যে গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিক হিরাক্লিটাস অন্যতম। তাঁহার ঐ সার্দ্ধদ্বিসহস্রতম জন্মবার্ষিকী এই বিশেষ প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ]

বিশ্ববৈচিত্র্যের ব্যাখ্যানপদ্ধতিতে 'দ্বন্দ্ব'-সূত্রের প্রথম প্রবক্তা হিরাক্লিটাস ছিলেন গ্রীকদর্শনের প্রভাতীযুগের দার্শনিক। থেলিস থেকে হিরাক্লিটাস পর্য্যন্ত আনুমানিক ৬২৫-৪৭৫ খ্রীঃপূর্বাব্দ-ব্যাপী গ্রীকদর্শনের আদিপর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বলিষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিকতা। অবশ্য গ্রীকদর্শনের প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে প্রথম যুগের সীমারেখা টানা হয়ে থাকে লিউকিপ্পাস্ বা ডিমোক্রিটাস পর্য্যন্ত (বার্ণেট ও য়্যুবারবেগ)। এ যুগবিভাগের নিশ্চয়ই একটা সংগত কারণ আছে। লিউকিপ্পাস ছিলেন কণাদ-কল্প দার্শনিক—অর্থাৎ পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে পরমাণুবাদের প্রথম সূত্রকার। ডিমোক্রিটাস্ এই পরমাণুবাদের পরিপূর্ণ রূপকার। এরিষ্টোটলের 'মেটাফিজিক্স' অনুসারে ইনি বোধহয় ছিলেন প্রবীণ লিউকিপ্পাসের ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী। পরমাণুবাদ বস্তুবাদের একটি সুনিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ বিকাশধারা। আদি পরমাণুবাদের পরের যুগটি প্রধানতঃ প্লেটো-এরিষ্টোটলের যুগ। এই দুই যুগের সন্ধিকাল পূর্ণ করেছেন প্রোটাগোরাস ও তাঁর সোফিষ্ট সম্প্রদায় এবং স্বয়ং সক্রেটিস।

ডিমোক্রিটাস্ ছিলেন থ্রেসের অধিবাসী, সোফিষ্টদের ও সক্রেটিসের সমসাময়িক। এথেন্সে তিনি একবার এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল অপরিচয়ের অবজ্ঞা। খাস গ্রীসের শিক্ষাসংস্কারের মধ্যেও বোধহয় তাঁর দার্শনিক প্রতিভাকে অঙ্গীকার করার মত উপযুক্ত প্রস্তুতি তখন ছিল না। পরবর্তীকালে প্লেটো তাঁর দুর্ধর্ষ বস্তুবাদ বরদাস্ত করতে পারেননি, তাই

মনে হয়, ঘৃণায় তাঁর নামটা পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নি, তাঁর গ্রন্থগুলি আগুনে সৎকার করার সংবাসনা প্রকাশ করেছিলেন বলেও শোনা যায়। কিন্তু প্লেটোর কল্পলোকবিহারী উত্তুঙ্গ দর্শনের অনস্বীকার্য্য প্রভাব সত্ত্বেও গ্রীকদের বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করা সম্ভব হয়নি। এরিষ্টোটলের সর্বতোমুখী বিস্ময়কর মনীষা অন্ততঃ প্লেটোর "ভাব-নগরের" ( World of Ideas ) বিশুদ্ধ নাগরিকদের বিশেষ সম্মান দেখাতে রাজী হয়নি। এরিষ্টো-টলের পরে আর একজন মহান্ মনীষী ইপিকিউরিয়স ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক মানবিকতার আবেদন-সংবাহী এক সুনিয়ন্ত্রিত নীতিশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। আর এক দিকে, প্রাচীন পিথাগোরাস যে বিশুদ্ধ 'গণিত'শাস্ত্র প্রবর্তন কবেছিলেন তারই ধারা ধারণ করে গণিতবিজ্ঞান নব নব শাখায় বিকাশ লাভ করে এবং বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে বস্তুমুখী গ্রীক প্রতিভা সুদূরপ্রসারী সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু ডিমোক্রিটাসের পরে গ্রীকদর্শনে বস্তুবাদী চিন্তাধারায় সাময়িক ছেদ ঘটেছিল বলেই, এবং বস্তুবিমুখ বিশুদ্ধ ভাববাদী দর্শনের চূড়ামণি প্লেটোর শাণিত তর্ক-তরবারির আঘাতেই প্রধানতঃ এই ছেদ ঘটানো সম্ভব হয়েছিল বলেই দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে থেলিস্ থেকে ডিমোক্রিটাস পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক আড়াইশ বছরের এই কালখণ্ডকে গ্রীক দর্শনের প্রথম পর্য্যায় বলে চিহ্নিত করা মোটেই অসংগত নয়। স্বয়ং এরিষ্টোটল এই যুগ-বিভাগের সাক্ষী। তথাপি থেলিস থেকে হিরাক্লিটাস্ পর্য্যন্ত আনুমানিক দেড়শ বছরের একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ, হিরাক্লিটাস ছিলেন গ্রীকদর্শনে বস্তুবাদী ডায়লেক্‌টিক্সের শীর্ষবিন্দু। আর থেলিস ছিলেন পুরাকল্পকাহিনীর অযত্নসিদ্ধ স্থূল বস্তুতন্ত্র থেকে মননশীল বস্তুবাদে উত্তরণের প্রথম সোপানভূমি। নিরন্তর দ্বান্দ্বিক গতিবাদী হিরাক্লিটাসের পর যে প্রধান পুরুষ দর্শনের দরবারে অবতীর্ণ হলেন তার নাম পারমেনাইডিস। তিনি প্রচার করলেন এক গতিহীন নিষ্কম্প অদ্বৈততত্ত্ব—গতি মিথ্যা, বহু মিথ্যা, দ্বন্দ্ব মিথ্যা, এক শ্বাশত স্থিতিশীল অখণ্ডসত্তাই একমাত্র সত্য। গ্রীকদর্শনে হিরাক্লিটাস পর্য্যন্ত প্রবাহিত বস্তুবাদী মননধারার পর পারমেনাইডিস হলেন সর্বপ্রথম বিপরীত ব্যতিক্রম। এ ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ,

কিন্তু সাময়িক। পারমেনাইডিসের জীবন শেষ না হতেই সিসিলি দ্বীপের আক্রোগাস অধিবাসী, তৎকালীন গণতান্ত্রিক শিবিরের বিশিষ্ট নেতা এমপিডোক্লিস গ্রীক চিন্তাধারায় বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যাবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রহস্যবাদী পিথাগোরীয় ধর্মমতের প্রভাব থেকে মুক্ত না হলেও বিশ্ববীক্ষণ পদ্ধতিতে হিরাক্লিটীয় দর্শনের গভীর বস্তুদৃষ্টি এমপিডোক্লিসের দার্শনিক মতকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল। তাছাড়াও এরিষ্টোটলের মতে ইনি ছিলেন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং "গেলেনে"র মতে ইনি ছিলেন ইতালীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তথাপি বস্তুবাদী চিন্তাধারায় পারমেনাইডিস সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট ও পরিপূর্ণ ব্যতিক্রম এ কথা চিন্তা করে থেলিস-হিরাক্লিটাস যুগটিকে গ্রীক দর্শনের আদিপর্ব বলে চিহ্নিত করাই যুক্তিসংগত। "The Earlier Ionic Natural Philosphy" য়্যুবারবেগের এই নামকরণ যথার্থ। এ নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য্য হ'ল এই যে বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুতান্ত্রিক বীক্ষণ ও ব্যাখ্যান প্রচেষ্টাতেই দর্শনের আদি অভ্যুদয়। বলা বহুল্য আদিপর্বের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ বস্তুমুখী ও বিজ্ঞানমুখী হলেও প্রাথমিক অনুসন্ধিৎসার সময়ে চিন্তানায়কদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু পরিমাণে অকপট অবৈজ্ঞানিক স্থূলতা অপরিহার্য্য।

তথাপি হিরাক্লিটাস ছিলেন এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, যাঁর সূক্ষ্ম বস্তুদৃষ্টি এই সহজ স্থূলতাকে বহুদূর অতিক্রম করেছিল, যার কাছে বিশ্ববিবর্তনের মৌলিক সূত্র সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল। হিরাক্লিটাস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জগতের অব্যর্থ নিয়ামক সূত্র ঘোষণা করলেন—বিপরীতের অন্তর্বিরোধের উপরেই ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। এই ক্রমান্বয়ী ক্রমবিকাশশীল অন্তর্বিরোধ নিরবচ্ছিন্ন জাগতিক গতির নীতিসূত্র। এই গতিসূত্রের ভিত্তিতেই নব নব উন্মেষশালিনী বস্তুপ্রকৃতি নিত্য নূতন সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু এক অস্থির প্রবাহে প্রবাহিত। একই নদীতে দুবার নামা যায় না, একই সূর্য্য দুদিন ওঠে না। হিরাক্লিটাস বর্তমানযুগের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অসম্পূর্ণ আদিসূরি। তাঁর দ্বান্দ্বিক গতিসূত্রকে, কোন কোন অংশে, সাংখ্যদর্শনের সহিত তুলনা করার কথা মনে হতে পারে। কেবল মাত্র গতির দিক থেকে বিচার করলে বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ, কেবল মাত্র

দ্বন্দ্বের দিক থেকে বিচার করলে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পরিণামবাদ আংশিকভাবে হিরাক্লিটীয় দর্শনের সাদৃশ্যবাহী বলে ধারণা হতে পারে। কিন্তু সাংখ্য ও বৌদ্ধ যোগ করলেই হিরাক্লিটাস হয় না, দ্বন্দ্ব আর গতি যোগ করলেই দ্বান্দ্বিক গতি হয় না। বস্তুর স্বাভাবিক অন্তর্বিরোধ বস্তু-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধতর্কের ( formal logic ) পরিধির মধ্যে বাঁধা পড়েনা বলে বৌদ্ধ সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনটি বিভিন্ন বিভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন পূর্বাপর ক্ষণসমূহের মধ্যে কোন অন্বয় বা বাস্তব যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারল না। আর ক্ষণিকবাদের অর্থ দাঁড়াল—প্রকৃতি discrete ও discontinuous, সূক্ষতম অসংখ্য বস্তুক্ষণের নিরন্বয় সমষ্টিমাত্র। প্রবাহবিধৃত এ সমষ্টিও বাস্তব নয়, "বিকল্পের" বিলাস মাত্র। তাই শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকারণ সম্পর্কের কোন বাস্তব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মননশাস্ত্রে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ একটা "বিকল্প" বা বুদ্ধি-নির্মিত ধারণামাত্রে পর্য্যবসিত হল। অদ্বৈত বেদান্ত পারমেনিডিসের মত গতি ও পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ব্যাখ্যার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল। সাংখ্য বস্তুনিহিত দ্বন্দ্ব ও গতিকে স্বীকার করে অনেক দূর অগ্রসর হয়েও শেষরক্ষা করতে পারল না, পরিবর্তন স্বীকার করেও নূতন বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করতে পারল না। কিন্তু হিরাক্লিটাসের সার্থক বস্তুদৃষ্টি বস্তুনিরপেক্ষ "বৌদ্ধ-ন্যায়ের" ( formal laws of thought ) কাছে নতি স্বীকার করল না। তিনি নিরন্তর দ্বান্দ্বিক শক্তির মাধ্যমে নূতনের উদ্ভব-সূত্র উদ্ভাবন করলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মূলতঃ বস্তু বুদ্ধিকে অনুসরণ করে না। কিন্তু বুদ্ধিই বস্তুকে অনুসরণ করে। ঠিক একথাটি তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত পংক্তিগুলির মধ্যে ঘোষণা করেন নি। কারণ, জেনোর Paradox-এর দুষ্ট সরস্বতী তখনও জাগ্রত হয়নি। প্লেটোর বিচার-দ্বন্দ্বের কূট পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, এবং এরিষ্টোটলের ন্যায়শাস্ত্র তখনও জন্মলাভ করেনি। তাহলে হিরা-ক্লিটাস স্পষ্ট ভাষায় বলে যেতে পারতেন—Contradiction যখন বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ধর্ম ( The Natural Law of Things ) তখন সেখানে এরিষ্টোটলের Law of Contradiction সামগ্রিক দৃষ্টিতে অচল ও অক্ষম।

এরিস্টোটল তাঁর মেটাফিজিক্সের প্রথম খণ্ডে প্লেটো-পূর্ব দার্শনিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন—থেলিস থেকে আরম্ভ করে আদিপর্বের দার্শনিকদের মধ্যে একটা বিষয়ে ঐক্য সুস্পষ্ট। এরা সবাই মনে করেন যে বস্তু থেকে বস্তুর উৎপত্তি। বস্তুতেই বস্তুর লয়। বস্তুই বস্তুর আদি কারণ, বস্তুজগতের উৎপত্তি ও গতির জন্য এই জগতের বহির্ভূত কোন দ্বিতীয় বা নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন নেই। অবশ্যই এরিষ্টোটল এই মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে, আদি দার্শনিকদের এই মত থেকে কেউ মনে করতে পারেন যে বস্তুজগতের উৎপত্তি ও গতির জন্য উপাদান-কারণই যথেষ্ট, কোন সর্বশেষ সাধারণ নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে একটা চেতন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন অনুভূত হল। কাঠ নিজের থেকেই পালঙ্ক তৈয়ার করেনা, ব্রোঞ্জ নিজের থেকেই মূর্তি গড়ে না। অর্থাৎ উপাদানের অতিরিক্ত একজন চেতন কারিগরের প্রয়োজন। সুতরাং বস্তুজগতের নিমিত্তকারণ হিসেবে মূল বস্তুতে অন্ততঃ প্রাথমিক গতি-সঞ্চার করার জন্য এক শাশ্বত সত্তার উপস্থিতি আবশ্যক, যে নিজে গতিহীন, কিন্তু গতিসঞ্চারী। চেতন নিমিত্তকারণের স্বপক্ষে এরিষ্টোটলের এই যুক্তির সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে শংকর-প্রযুক্ত যুক্তির সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য, শয্যানির্মাণের উদাহরণটিতেও বিস্ময়কর মিল রয়েছে।

এরিষ্টোটল কর্তৃক সমালোচিত এই আদি বস্তুতন্ত্রের শিরোমণি সূত্রকার হিরাক্লিটাস ঘোষণা করেন—"সর্বসাধারণের এই বস্তুজগৎ কোন দেবতা বা মানুষ সৃষ্টি করেন নি। বস্তুজগৎ এক চিরঞ্জীব অগ্নিস্বরূপ—চিরকাল ছিল, বর্তমানে আছে এবং চিরকাল থাকবে। এ আগুন প্রতিমুহূর্তে সমভাবে জ্বলে আর নিভে" (অর্থাৎ প্রজ্বলন আর নির্বাপণ একই প্রক্রিয়ার দুইটি সমান্তরাল প্রকাশভঙ্গী)। হিরাক্লিটাসের বাচনরীতি অনেকটা সংক্ষিপ্ত সূত্রাকার দৈববানীর মত, আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময়। তখনকার ধর্মবিশ্বাসে দৈববাণীর প্রতিষ্ঠা বোধহয় হিরাক্লিটাসের বাক্য-বিন্যাস-রীতির উপর অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তথাপি বিশ্বের সারবস্তুকে এক অনির্বাণ অগ্নিরূপে কল্পনা করার ভিতরে কোন অতিপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় রহস্য লুকিয়ে নেই। এই কল্পনার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতি-

মুহূর্তে পুরাতনের মৃত্যু ও নূতনের অভ্যুদয়, অথচ প্রবাহরূপে এক অনির্বাণ অবিচ্ছিন্ন ঐকিক সত্তা,—এই বস্তুবাদী অদ্বৈত ধারণাকে প্রকাশ করার পক্ষে অগ্নিশিখা অপেক্ষা সার্থকতর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানপ্রবাহ ও বস্তুপ্রবাহের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য অগ্নিশিখার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, হিরাক্লিটাস নদীর স্রোতের দৃষ্টান্তও টেনেছেন। তাহলে থেলিসের মত আদি বস্তুকে জল বলে কল্পনা করতে বাধা কোথায়। এখানেই অগ্নিকল্পনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে বস্তু মানুষের ধ্যানধারণার উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তা হল সূর্য। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ। সূর্য্য একটি প্রজ্বলিত অগ্নি-পিণ্ডরূপেই প্রতিভাত—"উজ্জ্বলতম, বিশুদ্ধতম, উত্তপ্ততম অগ্নির আধার এই সূর্য্য।" আকাশের অগণিত নক্ষত্রকেও এক একটি অগ্নিময় বস্তুলোক বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক। হিরাক্লিটাসের দর্শন ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পরবর্ত্তী যুগে থিওফ্রেস্টাস বলেছেন—হিরাক্লিটাসের মতে সূর্য্য যেন একটা প্রজ্বলিত অগ্নিপাত্র; তার অনাবৃত মুখের দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো; সাগরের উত্তপ্ত নিশ্বাস শুষে নিয়ে সেই মুখ দাউ দাউ করে জ্বলছে। বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এই মহাগ্নিকে সর্ববস্তু সর্বতেজ ও সর্বশক্তির আধার বলে কল্পনা করা হিরাক্লিটাসের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক। বস্তুজগৎ এই অনাদি অগ্নির প্রজ্বলিত প্রবাহ। জরাথুষ্ট্রীয় ধর্মমতে অগ্নির ঐশ্বর্য্য প্রতিফলিত। ঋগ্বেদের প্রারম্ভ অগ্নিতেজে দীপ্তিমান্। ঈশোপনিষদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন—"হে সূর্য্য, তোমার সত্যের মুখ স্বর্ণপাত্রে ঢাকা। এই মুখ তুমি খুলে দাও, আমাদের সত্যদৃষ্টি অবারিত হোক।" স্পষ্টতই প্রভাতের সূর্য্যকে সমগ্র-তেজে আবির্ভূত হবার জন্য এ উদাত্ত আবেদন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ঈশোপনিষদের শাংকরী ব্যাখ্যায় অনেক কষ্ট-কাল্পনিক অপব্যাখ্যার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এই সূর্য্যপ্রার্থনার ঠিক পূর্বের শ্লোকটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন—"সৃষ্টি ও ধ্বংসকে যে একই সঙ্গে জানে সে ধ্বংসের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির দ্বারা অমৃত ভোগ করে।" ঠিক এর পরেই সূর্য্যের স্বর্ণাবরণ অবারিত করার প্রার্থনা। ঈশোপনিষদের বহু শ্লোকে বস্তু-জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক চিন্তার ইঙ্গিত রয়েছে।

হিরাক্লিটাস ছিলেন এশিয়া মাইনরের গ্রীক উপনিবেশ এফিসাসের অধিবাসী। গ্রীকদর্শনের আদিপর্বের বস্তুবাদী দার্শনিকগণ কেহই মূল গ্রীসের অধিবাসী ছিলেন না। থেলিস, এনাক্সিমেণ্ডার, এনাক্সিমেনিস্‌ ও হিরাক্লিটাস এঁরা সকলেই ছিলেন আয়োনিয়ার অধিবাসী। এশিয়া মাইনরের উপকূলভাগ ও তার সমীপবর্তী দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যে গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তখন তার নাম ছিল আয়োনিয়া। পিথাগোরাস, পারমেনিডিস, এমপিডোক্লিস, লিউকিপ্পাস, ডিমোক্রিটাস, প্রথম যুগের এইসব বিশিষ্ট দার্শনিকরাও কেহই খাস গ্রীসের অধিবাসী ছিলেন না। এনাক্সাগোরাসের জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা আয়োনিয়ায়, যদিও পরে তিনি পেরিক্লিসের আমন্ত্রণে এথেন্সে বসবাস করেছিলেন। পিথাগোরাস সামোস থেকে দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে চলে যান। লিউকিপ্পাস আয়োনিয়ার নগরী মিলেটাসের অধিবাসী, যেখানে থেলিস গ্রীক দর্শনের গোড়াপত্তন করেন। গ্রীক দর্শনের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের এই স্থানগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য। বিশেষ করে গ্রীকদর্শনের প্রথম চারণভূমি এথেনীয় গ্রীস না হয়ে আয়োনিয়া হ'ল কেন এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক।

মার্ক্সীয় দর্শন যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সূচনা করেছে, সেই মতে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন সেই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের পরোক্ষ প্রতিচ্ছবি। এই মত বর্তমানকালে ব্যাপকতম স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য দর্শনের গবেষণায়, বিশেষত প্রাচীন দর্শনের ইতিহাস বীক্ষণে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন হঠকারী যান্ত্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ারী থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে যে, সমাজে শ্রেণীবিভাগের আবির্ভাবের পূর্বে ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী দর্শনের আবির্ভাব সম্ভব নয়। বস্তুজগৎ সত্য না বস্তুনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানসত্তাই সত্য, বস্তু ও জ্ঞানের দ্বন্দ্ব-বন্ধুর এই তর্কময় তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রথম আবির্ভাব তখনই সম্ভব যখন সমাজে বিপরীতমুখী স্বার্থ-দ্বন্দ্বের প্রতিনিধিস্থানীয় দুইটি শ্রেণী আবির্ভূত হয়েছে; যখন একদিকে এজাতীয় তত্ত্বনির্ণয়ে কালক্ষয় করার মত অবসরভোগী পরশ্রমোপজীবী এক শাসক ও শোষক শ্রেণী, অপরদিকে এই পরভুক শ্রেণীর বিলাসব্যসন ও বাঁচার উপকরণ উৎপাদনে

ব্যস্ত শ্রমমাত্র সম্বল এক শাসিত ও শোষিত শ্রেণী আবির্ভূত হয়েছে। সমাজের ইতিহাসে একথা সত্য বলেই প্রমাণিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু বলা প্রয়োজন যে শুধু ভাববাদী দর্শন কেন, দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ যে বস্তুবাদী দর্শন তারও উৎপত্তি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ছাড়া সম্ভব নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশ্ববীক্ষণ ব্যতীত কোন চিন্তাকে দার্শনিকচিন্তা বলা যায় না। এ জাতীয় চিন্তায়, তা যতই প্রাথমিক স্তরের হ'ক না কেন, কিছু-পরিমাণে যুক্তি ও সূক্ষ্মমননের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্ম মননের উপযোগী ব্যাকরণের নিয়মনিয়ন্ত্রিত ভাষাবিন্যাস-কৌশলও আয়ত্তে থাকা আবশ্যক। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণের ( universalisation ) দ্বারা বিমূর্ত ভাবধারণার ( abstract concepts ) সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। হিরাক্লিটাসের সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত গ্রন্থের পংক্তি কয়টির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, এজাতীয় জটিল ভাবনার অভ্যুদয় প্রাচীনতম শ্রেণীহীন সমাজে কল্পনা করা যায় না। কঠোর কায়ক্লেশে কোনও রকমে জান্তব জীবন বাঁচিয়ে রাখার দায় থেকে মুক্ত এক পরভুক অবসরভোগী শ্রেণীর উদ্ভব না হলে প্রথম যুগের বস্তুবাদী মনন ও ভাবনাও সম্ভব হতনা। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার ভিতরেই সূক্ষ্ম মননের উপযোগী অবসর মেলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

আদি দর্শনের উৎপত্তির প্রশ্নটি অন্য এক দিক থেকেও বিচার করা যেতে পারে। প্রথম যুগের তত্ত্বজিজ্ঞাসার স্বরূপ কি? মূলতত্ত্ব বস্তু না জ্ঞান—এ আদিযুগের জিজ্ঞাসা নয়। বিশ্বপ্রকৃতির মূলবস্তুতত্ত্ব এক না বহু, এই ছিল প্রাথমিক জিজ্ঞাসার রূপ। একথা যেমন গ্রীক দর্শন সম্পর্কে তেমনই ভারতীয় দর্শন সম্পর্কেও সত্য। এক বিজ্ঞানস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্বের তুলনায় এক মূল-বস্তুতত্ত্ব থেকে বহুর উৎপত্তির ধারণা প্রাচীনতর। সে তত্ত্ব বস্তু না বিজ্ঞান এ পরবর্তীকালের প্রশ্ন। লক্ষ্য করার বিষয় যে অদ্বৈতবাদী পারমেনিডিসও তার অদ্বৈততত্ত্বকে কোথাও বিজ্ঞানস্বরূপ বলেননি। অবশ্য গতি, পরিবর্তন ও বহুত্বকে অস্বীকার করার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে বস্তুজগতও বিলুপ্ত হয়, তখন অদ্বৈততত্ত্বে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। পারমেনিডিস নিজে তাঁর মতবাদের এই যৌক্তিক পরিণতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিনা জানা যায়না। আদিম

শ্রেণীহীন গোষ্ঠীসমাজে যেমন বস্তু ও জ্ঞানকে বিভক্ত করা সম্ভব ছিল না তেমনি এক ও বহুকেও পৃথকভাবে বিচার করা সম্ভব ছিল না।" শ্রম বিভাগ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন, পণ্যের উৎপত্তি, মুদ্রাপ্রচলন ও লৌহনির্মিত যন্ত্র-পাতির আবির্ভাবে যখন আদিম গোষ্ঠীসমাজে ভাঙন ধরল, একের ভিতরে যখন শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হল, এক যখন দ্বিধা ত্রিধা বহুধা বিভক্ত হল, তার পূর্বে সমাজমানসে এক ও বহুর দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়নি। একের অন্তরে বহুর আবির্ভাবের এই সামাজিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা বহুদিন ধরে সমাজমানসে সঞ্চিত হয়েছে আর তারই তাত্ত্বিক রূপ এক ও বহুর সম্বন্ধজিজ্ঞাসায় বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষণে প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্রোঞ্জযুগ ও মিশরীয় সভ্যতার অবসানে নূতন গ্রীক সভ্যতা লৌহ হাতিয়ারের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মলাভ করল। শ্রেণীভেদ ও শ্রমবিভাগ তীব্রতর হল। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ বহুপরিমাণে বেড়ে গেল, পণ্যের বাজার বিস্তৃতি লাভ করল, মুদ্রার প্রচলন ব্যাপকতর হল, অভিজাত ভূস্বামী, দাস ও স্বাধীন কারিগরের সঙ্গে বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল। এই নূতন পণ্য-সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠল গ্রীক উপনিবেশ আয়োনিয়া। খাস গ্রীসের তুলনায় আয়োনিয়ায় এই সভ্যতা বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশী। বেবিলন, লিডিয়া, পার্শিয়া, ফিনিসিয়া ও মিশরের সহিত আয়োনিয়ার প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই অর্থনৈতিক যোগাযোগ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করে দিল। মিশর ও বেবিলনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সঙ্গে আয়োনিয়ার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটল। ক্রমবিস্তারশীল পণ্য-সভ্যতার অন্তরালে আয়োনিয়ান সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রকট হয়ে উঠল। এ সভ্যতা ছিল মূলত দাস শ্রমের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ সভ্যতার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার কথা একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। একদিকে অভিজাত ভূস্বামীদের সঙ্গে ধনস্ফীত বণিকশ্রেণীর সংঘাত, অন্যদিকে শ্রমজীবী নিপীড়িত শ্রেণীর অসন্তোষ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ আয়োনিয়ান নগরীগুলিতে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এইভাবে মিশর বেবিলনের প্রাচীন বস্তুবিজ্ঞানের সহিত এক অন্তর্দ্বন্দ্বাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নূতন পণ্য-সভ্যতার মিলনভূমি হিসেবে গড়ে উঠল গ্রীক আয়োনিয়ার সমাজমানস। প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজে

বহুমুখী ভাঙাগড়ার পটভূমিতেই আয়োনিয়ান গ্রীকমানসে বস্তুতান্ত্রিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল।

এক সমন্বিত আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে বহুধাবিদীর্ণ দাসশ্রমভিত্তিক সমাজে উত্তরণের এই দীর্ঘ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সমাজমানসের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমাজবাস্তবের এই বিবর্তন প্রক্রিয়া হিরাক্লিটাসের দ্বান্দ্বিক দর্শনের বিশ্ববীক্ষায় পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, বলা বাহুল্য এক মূর্ত্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার এই বিমূর্ত্ত সাধারণীকরণ ঘটেছিল অলক্ষ্যে, দার্শনিক-মনের অবচেতন অন্তরালে। তথাপি একহিসেবে হিরাক্লিটাস ছিলেন আদিপর্বের দার্শনিকদের মধ্য সবচেয়ে সমাজ-সচেতন। আয়োনীয় দার্শনিক সম্প্রদায় কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হিরোডোটসের মতে থেলিস সমগ্র আয়োনিয়াকে নিয়ে, টিয়স্ নগরীকে রাজধানী ক'রে, একটি যৌথরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। থেলিসের মৃত্যুর পর আয়োনিয়ার রাজনৈতিক জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। দাস ও প্রভুর মৌলিক সংঘাতের পরিধির অভ্যন্তরে অভিজাত ভূস্বামীশ্রেণী ও পণ্যবাহী বণিকতন্ত্রের সংঘর্ষ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। হিরাক্লিটাস এ সংঘাতের নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র ছিলেন না। তিনি অভিজাত প্রতিক্রিয়ার পক্ষে এবং গণতন্ত্র ও জনসাধারণের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। গণতন্ত্র, বণিকতন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও শ্রেণী-বিদ্বেষ ছিল অপরিসীম। নিজ শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই সংঘাতের তাৎপর্য্য বুঝতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর অভিজাত শ্রেণীকে বাঁচতে হলে তীব্র সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই বাঁচতে হবে। এফিসিয়া থেকে তাঁর ভ্রাতার নির্বাসনের পর গণতন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও প্রবল হয়ে উঠল। শুধু আয়োনীয় সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বই নয়, তিনি তাঁর জীবনে পারস্যের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আইয়ো-নিয়ান গ্রীকদের সফল বিদ্রোহও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুতরাং বস্তুজগতের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে একটা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলনা। এই তত্ত্বকে তিনি তাঁর শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজজীবনে প্রতিফলিত হতে দেখে-ছিলেন। বস্তুপ্রকৃতির গতিধর্ম ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তার পূর্ববর্তী মিলেশীয় দার্শনিক-দের ধারণাতেও ধরা পড়েছিল। মিলেশীয় এনাক্সিমেণ্ডারও বিপরীতের

দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি এই দ্বন্দ্বকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বকে অন্যায় মনে করতেন এবং সমন্বয়ের ভিতরে দ্বন্দ্বের অবসানের পথ খুঁজেছিলেন। কিন্তু হিরাক্লিটাস অন্তর্দ্বন্দ্বকে অনতিক্রমণীয় বস্তুস্বভাব হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে ঐক্য সাময়িক ও আপেক্ষিক, কিন্তু সংঘর্ষ সর্বাত্মক। তাই সংঘর্ষই ন্যায়ধর্ম। সমাজের মূল সংঘর্ষ যে প্রভু ও দাসের ভিতরে এ উপলব্ধি তাঁর ছিল। "যুদ্ধ সকলের পিতা, সকলের প্রভু। যুদ্ধই দেবতা ও মানুষ সৃষ্টি করেছে। স্বাধীন মানুষ ও দাসদের সৃষ্টি করেছে"—এ উক্তি হিরাক্লিটাসের। বস্তুজগতে বিপরীতের বিরোধকে তিনি যুদ্ধের নৈতিক ন্যায্যতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। হোমার যুদ্ধের অবসান কামনা করেছিলেন বলে হিরাক্লিটাস তাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। "হোমার বুঝতে পারেন নি যে তিনি জগতের ধ্বংসের কামনা করছেন, তাঁর প্রার্থনা চরিতার্থ হলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।" "হোমারকে চাবুক মারা উচিত।" বিশ্বমনীষার ইতিহাসে হিরাক্লিটাস যে অমোঘ দার্শনিক সত্য আবিষ্কারের প্রথম গৌরব অর্জন করেছিলেন, তাঁর নিজ শ্রেণী-স্বার্থের কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গী সেই সত্যকে অপব্যাখ্যার স্তরে টেনে নামিয়েছিল। বিপরীতের অন্তর্দ্বন্দ্বই যে একদিন শ্রেণীহীন যুদ্ধহীন উচ্চতম মানবিক সভ্যতা গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হবে এ বিশ্বাস ও দূরদৃষ্টি সে যুগের হিরাক্লিটাসের কাছ থেকে আশা করা অন্যায় অতিরিক্ত ও অসঙ্গত।

হিরাক্লিটাসের সূক্ষ্ম সমাজ চেতনার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। বার্ণেট ও টমসন উভয়েই এই সূত্রটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—"অগ্নির বিনিময়ে সকল বস্তু, সকল বস্তুর বিনিময়ে অগ্নি; যেমন স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য, পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা।" সূত্রের উপমাটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। পণ্যসঞ্চারী সমাজে সহস্র পণ্যের সঞ্চালনশক্তি মুদ্রাতে কেন্দ্রীভূত, কারণ মুদ্রা পণ্যমূল্যের ঘনীভূত প্রকাশভূমি। এই সর্বশক্তিময়ী আধারশক্তি থেকে পণ্যসমূহ আপন গতি শক্তি আহরণ করে। বিনিময়-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুদ্রাদেবী যেন আপনাকে সহস্ররূপে বিকশিত করে। তেমনি বিশ্ববিবর্তনের মূল গতিশক্তি অগ্নিতে কেন্দ্রীভূত। বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্নি আপনাকে অজস্ররূপে অনাদিকাল ধরে প্রকাশ করে চলেছে।

হিরাক্লিটাসের মতে এক ও বহু উভয়েই সত্য। প্রতিক্ষণে পুরাতনের

মৃত্যু ও নূতনের অভ্যুদয় ঘটছে—তাই বস্তু বহু ও অনন্ত। আবার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহবিধৃত সমষ্টি হিসাবে বস্তু একও বটে। "তাই আমরা একই নদীতে নামি আবার নামি না"—এখানে হিরাক্লিটাস বৌদ্ধমতের একদেশী দৃষ্টিকে অতিক্রম করেছেন। বৌদ্ধমতে সন্তান বা প্রবাহ মূলত সত্য নয়। উহা সংবৃতি, বিকল্প বা বস্তুশূন্য বুদ্ধিনির্মিত ধারণামাত্র। প্রবাহপতিত এক একটি বস্তুক্ষণই শুধু সত্য। তেমনি অবয়ব বা অংশগুলিই একমাত্র সত্য, অবয়বী, অংশী বা সমুদয় (the whole) মিথ্যা। সুতরাং বৌদ্ধমতে organic unity-ও বিকল্প মাত্র। হিরাক্লিটাসের মতে একটি বস্তু ঐ একই ক্ষণে এক ও বহু। কারণ, বিপরীতের দ্বৈত-দ্বন্দ্ব ছাড়া একের ঐক্য সম্ভব নয়। একের অভ্যন্তরেই উন্মেষমুখী নূতনের সাথে পুরাতনের বিরোধ আরম্ভ হয়। বৌদ্ধমতে একক্ষণের বস্তু সম্পূর্ণ এক ও অদ্বৈত। পূর্বক্ষণ কখনও পরক্ষণের বস্তুকে গর্ভে ধারণ করে না। এই নিরন্বয় ক্ষণবাদ দ্বান্দ্বিক দর্শনের বিরোধী। হিরাক্লিটাস বলেন "Men do not know how what is at variance agrees with itself. It is an attunement of opposite tensions like that of the bow and the lyre" ( fragment—45 ). "Couples are things whole and things not whole, what is drawn together and drawn asunder, the harmonious and the discordant. The one is made up of all things and all things issue from the one" ( fragment—59 )" যাহা মৃত্যুশীল তাহা অমর, যাহা অমর তাহা মৃত্যুশীল। একের মৃত্যুতে অন্য বাঁচে, একের বাঁচায় অন্য মরে" ( fragment—60 )। বস্তুর অন্তরে বিপরীতের বিরোধ এবং বিরোধের মারফত প্রতিমুহূর্তে বস্তুর পরিবর্তন—এই বস্তুনীতি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত। পরিবর্তনের তিনটি ধারা—ধর্মপরিণাম অবস্থাপরিণাম ও লক্ষণ-পরিণাম সম্পর্কে যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তথাপি সাংখ্যযোগদর্শন পুরাতনের মৃত্যু ও নূতন বস্তুর জন্ম স্বীকার করতে পারল না। পরিবর্তন মানে পুরাতনের নিত্য নূতন প্রকাশভঙ্গী মাত্র। যাহা অব্যক্ত ছিল তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। এই দুর্বলতা, "formal law of thought"-এর নিকট দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই নতিস্বীকার সাংখ্যদর্শনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ থেকে সরিয়ে রাখল। ( চৈতন্য-স্বরূপ বহু আত্মার প্রসঙ্গ আর তুলছিনা। )

বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের এই দ্বিবিধ দুর্বলতা হিরাক্লিটাসকে স্পর্শ করেনি। তিনি পিথাগোরাসের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু দার্শনিক ও ধর্মীয় মতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বহু বিষয়ের জ্ঞান থাকা ভাল। কিন্তু বহুর জ্ঞান থাকলেই লোক বিজ্ঞ হয় না। বিশ্ববিবর্তনের মূল নিয়ামক সূত্র সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি অর্জন করাই বিজ্ঞতা ( fragments—16, 17, 18, 19 )। এই নিয়ামকসূত্রকেই তিনি বলেছেন logos, যার ইংরেজী অনুবাদ করা হয়ে থাকে word, ( fragments—1, 2 )। সে যুগে বহুল প্রচারিত ডায়োনেশীয় ধর্মমতের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপকে তিনি তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেছেন ( framents 126—130 )। আয়োনিয়ার দার্শনিকগণ প্রথম থেকেই মূল গ্রীসের তুলনায় ধর্মীয় সংস্কার থেকে অনেক বেশী মুক্ত ছিলেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সকল কয়টি সূত্র প্রাচীন হিরাক্লিটাসের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রাথমিক রূপকার, প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে অব্যর্থ বস্তুসত্যের সার্থকতম নমস্যতম আবিষ্কারক। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন নিগৃহীত নিপীড়িত মানবের মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা, আর প্রাচীন যুগের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রথম সূত্রকার ছিলেন লাঞ্ছিত জনতার শত্রুশিবিরের সদস্য ও সমর্থক—এও বোধ হয় ইতিহাসে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার এক চমৎকার অভিব্যক্তি।

# বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ

"আমি সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এই নয় যে সমাজতন্ত্রকে আমি একটা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করি, কারণটা এই যে উপবাস করার চেয়ে আধখানা রুটি মেলাও ভাল।

"অন্য সব সমাজব্যবস্থাই পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ। এই অবস্থাটাকেও একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক : আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত এর নূতনত্বের জন্যই একবার পরীক্ষা করা দরকার। একই মানুষের দল সব সময় সুখ বা দুঃখ ভোগ করে যাবে ; তার চেয়ে বরং সুখদুঃখের একটা পুনর্বণ্টন হওয়াই ভাল ! ভাল-মন্দের মোট পরিমাণ পৃথিবীতে সব সময় একই থাকে। নূতন নূতন ব্যবস্থার দ্বারা জোয়ালটা কাঁধ বদল করে মাত্র, আর কিছু নয়।

"সমাজের নীচেকার লোকটিও এই দুঃখময় পৃথিবীতে একটু সুদিনের মুখ দেখুক। এর ফলে এই তথাকথিত সুখাস্বাদের অভিজ্ঞতা পার হয়ে এরা সবাই এসে শেষ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের শরণ নেবে ; এই পৃথিবী, তার গভর্ণমেণ্ট, তার আর যত সমস্যা সম্পর্কে এদের সকল মিথ্যা মায়ামোহ তখন কেটে যাবে।" ( Swami Vivekananda—Comeplete Works, Vol. VI—Sixth Edition, 1956. pp 381—82 )

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির ভিতরে বিবেকানন্দের মানসপরিধি, তার ভাবনার স্বরূপ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যে চিঠিখানা থেকে এই উদ্ধৃতিটি দেওয়া হল তার প্রারম্ভ ও পরিণতির সঙ্গতিটা অবশ্য লক্ষণীয়। বাস্তব সমাজব্যবস্থাটাকে উন্নত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একদিন আমাদের সকল দুঃখের অবসান ঘটবে এই ধারণাটা যে ভুল সে কথাটা প্রমাণ করাই চিঠিখানার মূল উদ্দেশ্য।

"আর একটা মস্তবড় ভুল আমরা করে থাকি এই ভেবে যে পৃথিবীতে মঙ্গলের পরিমাণটা ক্রমবর্ধিষ্ণু এবং অমঙ্গলের পরিমাণটা ক্রমক্ষয়িষ্ণু। এর থেকে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে যে, অমঙ্গলটা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে

লোপ পেয়ে যাবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গলটাই শুধু থাকবে।…কিন্তু সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল যত বাড়ছে, অমঙ্গলও ততই বেড়ে চলেছে।'' ( ঐ পৃঃ ৩৭৯-৮০ )। এই হল চিঠিখানার গোড়ার কথা। উপসংহারের দিকটা আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করেছি। এখন উপক্রম ও উপসংহার মিলিয়ে দেখুন। সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক বা বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির ধারা মানুষের সমস্যার শেষ সমাধান করতে পারে না। চিত্ত ও চেতনাকে ঈশ্বরভাবে ভাবিত করে তবেই মানুষের নিষ্কৃতি।

অথচ, একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে এই চিঠিখানারই মধ্যপথে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের ক্রমান্বয়ী আধিপত্যের ভিত্তিতে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। একথা অকুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করা চলে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তবাসী এই সাধক-সন্ন্যাসীই ভারতীয় মনীষীদের ভিতরে সর্বপ্রথম শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে কতটা অসম্পূর্ণ সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের মূল সূত্রের ভিতরে তিনি যে শ্রেণীস্বার্থের সন্ধান পেয়েছেন এবং সে-কথা যে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন ভারতীয় সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর এই মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।

তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি শব্দের ব্যঞ্জনাগত ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এর দ্বারা সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রথম স্তরটিকে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বলে সামগ্রিক ভাবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত কিনা সে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত সন্দেহ থাকলেও, এবং ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে উন্মেষমুখী ক্ষাত্রসভ্যতার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছবার ধারণাটিকে একটি অতিসরলীকৃত সূত্র বলে অগ্রাহ্য করলেও বৈশ্য ও শূদ্র সভ্যতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা বলেছেন তা আধুনিক সভ্যতার মর্মভেদী এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

বৈশ্য শাসনের মূলগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন—"It is awful in its silent crushing and blood-sucking power."

এখানে "silent" কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ মোটেই মার্কসবাদী ছিলেন না একথা মনে রাখলে এই শব্দটির ব্যঞ্জনাময় বৈশিষ্ট্য আমাদের আরও বেশী বিস্মিত করে। মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানী সমাজ-বাস্তবের আরও সুনিপুণ বিশ্লেষণ করে এই কথাই অন্তভাবে বলতেন— পণ্যপ্রধান পুঁজিবাদী সভ্যতায় শ্রমিকের শ্রমজাত Surplus value বা উদ্বৃত্ত মূল্য মুনাফার আকারে নিঙ্‌ড়ে নেয়ার এমন একটি কৌশল আছে যে শ্রমিকের মোট শ্রমের কত অংশ তার নিজের জন্য, আর কত অংশ মালিকের মুনাফার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে নিয়োজিত হচ্ছে সে হিসাব করা শ্রমিকের পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। ভূমিপ্রধান ক্ষাত্রযুগে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থমুখী শ্রম ও মালিকমুখী শ্রমের পারিমাণিক পার্থক্যটা যত সহজে চোখে পড়ে পণ্যপ্রধান বৈশ্য সভ্যতায় তত সহজে চোখে পড়ে না। মার্কস যাকে commodity fetishism বলেছেন সেই পণ্যময়ী জুজুমূর্তির অন্তরালে শ্রমিকের শ্রমসঞ্জাত মূল্য-পরিমাণটা ঢাকা পড়ে যায়। পণ্যের বিনিময় যে মূলতঃ শ্রমশক্তির মূল্যের বিনিময়, আর সেই মূল্যের একটা বিরাট অংশ যে উদ্বৃত্ত হয়ে মুনাফার আকারে শোষণ করে নেয়া হয়— উৎপাদনের এই সামাজিক ইতিহাসটা চাপা পড়ে যায়। ( Thus the determination of the magnitude of value by labour time is a secret hidden away beneath the manifest fluctuations in the relative values of commodities. ( Capital 1 p. 49. Everyman's Edition )

এইজন্যই পুঁজিবাদী আমলে শোষণটা চলে নিঃশব্দে, কারণ শোষণকে শোষণ বলে চেনা যায় না, এবং এই শোষণের পরিমাণটাও নিঃশব্দে বেড়ে চলে। পণ্যের গায়ে তার মূল্যোৎপত্তির ইতিহাসটা ব্যাখ্যা করে লেখা থাকে না—"value does not wear an explanatory label." ( ঐ পৃঃ ৪৭ )। এতটা বিশ্লেষণী চিন্তার ভিত্তিতে বিবেকানন্দ ও-কথাটি বলেননি। কিন্তু একটা ব্যাপার তিনি পরিষ্কারভাবেই লক্ষ্য করেছেন, পণ্যবাহিনী বৈশ্যসভ্যতার আড়ালে মানুষের রক্ত শোষণ চলে নিঃশব্দে, এবং এই শোষণ আরো বেশী ভয়ঙ্কর।

বৈশ্য-সভ্যতায় মূল্যনিরূপণে বিবেকানন্দ একদেশদর্শী ছিলেন না।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিপুল পরিমাণ পণ্যসঞ্চালনের মারফত মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেছে এই বৈশ্য-সভ্যতা, এবং একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান কৃষি ও সভ্যতার অমূল্য সম্পাদরাশি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে।

( The wisdom, civilisation and arts that accumulated in the heart of the social body during the Brahmin and Kshatriya supremacies are being diffused in all directions by the arteries of commerce to the different market places of the Vaisya. But for the rising of this Vaishya power who would have carried to-day the culture, learning, requirements and articles of food and luxury of one end of the world to the other.—"Modern India" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )।

কিন্তু ঠিক এর পরই তিনি প্রশ্ন করছেন—"যাদের শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা ও বৈশ্যের সম্পদ সম্ভব হয়েছে তারা কোথায়? সব দেশে সব যুগে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে "নীচু জাতি," "অন্ত্যজ," অথচ যারাই হল আসলে সমাজের শরীর, তাদের ইতিহাসটা কি? উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র অধিকার-কবলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটু ভাগ বসাবার অপরাধে ভারতবর্ষে যাদের জন্য জিহ্বা ও মাংস উপড়ে নেওয়ার মত কোমল শাস্তি বিধান করা হয়েছে ভারতের সেই চলন্ত শবগুলি, বিশ্বের সেই ভারবাহী পশুগুলি, সেই শূদ্র জনসাধারণ, তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে?" ( Modern India )

বৈশ্য সভ্যতার উন্নামক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এর এমন একটি সাধারণ চরিত্র লক্ষ্য করেছেন যা যে কোনও মার্ক্সবাদী সানন্দ-বিস্ময়ে সমর্থন করবেন। তিনি বললেন—ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে ক্ষমতা করায়ত্ত করার সময়ে বৈশ্যদের এমন কোন সদিচ্ছা ছিলনা যে ক্ষমতাটা শূদ্রশ্রেণীর হাতে পড়ুক। ( That the royal power may not any-how stand in the way of the inflow of his riches, the merchant is ever careful. But for all that, he has never the least wish that the power should pass on from the Kingly to the Shudra

Class—Modern India)। এই একই প্রবন্ধের প্রারম্ভে তিনি দেখিয়েছেন যে শাসনক্ষমতায় জনসাধারণের প্রকৃত অধিকার ভারতবর্ষে কোন দিন ছিল না—না ব্রাহ্মণযুগে, না ক্ষত্রিয়-বৌদ্ধযুগে। ইতস্তত: পরোক্ষভাবে, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে জনসাধারণ আত্মপ্রকাশের জন্য সংগ্রাম করেছে। কিন্তু তারা নিজেদের ভিতরে কোন সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে নি। শিক্ষাদীক্ষা যখন সবই ছিল ঋষিদের হাতে তখন স্বভাবতই জনতার পক্ষে এমন কোন শিক্ষালাভের সম্ভাবনা ছিল না যার দ্বারা তারা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, মানুষের সামগ্রিক ও সাধারণ মঙ্গলের জন্য একতাবদ্ধ হতে পারে। এদিকে কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হ'ল। এই ধরণের ঐক্যের সহজাত পাপ হিসেবে এরা সবাই মিলে জনসাধারণের রক্তশোষণ, শত্রুর উপর প্রতিহিংসা, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করার কাজগুলি চালিয়ে যেতে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমাগত মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে সস্তা ও সহজ শিকারে পরিণত হল। শোষিত জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সমাজেতিহাসের এমন স্পষ্ট বিচার বিবেকানন্দের পূর্বে অন্য কোনও ভারতীয় মনীষী করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অক্টোবরের রুশ বিপ্লবের সঙ্গে পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির মৌলিক পার্থক্য দেখাতে গিয়ে মার্ক্সবাদী দার্শনিকরা বলেছেন—পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলিতে একদল শোষকশ্রেণীর জায়গায় আর একদল শোষকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র, শোষিত শ্রেণীর হাতে কোন দিনই ক্ষমতা আসেনি। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবই হল পৃথিবীর প্রথম বিপ্লব যা শোষিত শ্রেণীকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিবেকানন্দ "শূদ্র-বিপ্লব" দেখে যান নি, কিন্তু প্রাক্-শূদ্র--বিপ্লবগুলিতে শেষ পর্য্যন্ত যে শোষকশ্রেণীর হাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহাল রয়েছে এ-ঘটনা তা'র সন্ধানী চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

সমকালীন পশ্চিমী সমাজের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে আসন্ন "শূদ্র-বিপ্লব" সম্পর্কে বিবেকানন্দ নিঃসংশয় ছিলেন—"সোশ্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম এবং এই জাতীয় অন্যান্য মতবাদগুলি আসন্ন সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত" ( Modern India )। "শূদ্রের আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী, কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না" They must have it, none can resist it"—( Works—Vol. VI P. 81. )

বিবেকানন্দের সমাজদৃষ্টির আর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে সমালোচকের দৃষ্টি উন্মুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। বিপ্লবী শ্রমিক-সংগঠনে অভিজ্ঞ সচেতন রাজনৈতিক কর্মীমাত্রেই জানেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে পঙ্গু করে রাখার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর একটা চিরাচরিত অপকৌশল আছে। নিপীড়িত শ্রেণীর ভিতরে যদি কেউ বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণগরিমায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, চতুর পুঁজিপতিশ্রেণী তাকে ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা দিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে সে আপন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করে, পুঁজিবাদের স্বার্থে নিজশ্রেণীর উপর নিজের বিস্তীর্ণ প্রভাবের অপব্যবহার করে, এবং বিপ্লবের পথ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিনিবৃত্ত করে। বিলাতের র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোলাণ্ড থেকে আরম্ভ করে দেশে দেশে এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের এই স্বধর্মচ্যুতি ও স্বশ্রেণী-দ্রোহিতা দেখতে পেয়েছেন।

"শূদ্রকে ধনসঞ্চয়, জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভের কোনও সুযোগই দেয়া হয়নি বললেও চলে। এই সামাজিক বঞ্চনার সঙ্গে আরও একটা অসুবিধা এনে যোগ করে দেয়া হল। শূদ্রশ্রেণীর ভিতরে অসাধারণ গুণাবলী ও প্রতিভা নিয়ে কেউ যদি জন্মগ্রহণ করত তখনই সমাজের উচ্চতর প্রভাবশালী শ্রেণীগুলি তার উপর সম্মান ও উপাধির পুষ্পবৃষ্টি করত, এবং তাকে তার আপন শ্রেণীর পরিধি থেকে টেনে তুলে নিয়ে উচ্চতর গোষ্ঠীচক্রের মধ্যে স্থান করে দিত। তার সম্পদ ও প্রজ্ঞাশক্তি তখন নিয়োজিত হত একটি বিজাতীয় শ্রেণীর স্বার্থে। তার আপন শ্রেণীর জনসাধারণ তার বিদ্যাবুদ্ধি ও সম্পদ থেকে কোন সাহায্যই পায় নি।" এই স্বধর্মচ্যুতি ও স্বশ্রেণীদ্রোহের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেকানন্দ যে নামগুলি উপস্থিত করলেন তা শুনলে ভারতীয় ঐতিহ্যবিলাসী যে কোন উদার ব্যক্তিও চমকে উঠবেন। এঁরা হলেন বশিষ্ঠ, নারদ, জাবাল সত্যকাম, ব্যাস, কৃপ, দ্রোণ এবং কর্ণ। শ্রেণী-আভিজাত্যের দিক থেকে এদের প্রত্যেকেরই জন্মকাহিনী, পিতৃপরিচয় বা মাতৃপরিচয় সন্দিগ্ধ রহস্যে আবৃত। "জ্ঞান বা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ এঁরা কেউবা ব্রাহ্মণ সমাজে কেউবা ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হলেন।"

বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন—"এদের এই সামাজিক উর্ধ্বগতির ফলে গণিকা, দাসী, মৎস্যজীবী বা শটটচালক সম্প্রদায়ের কি যে উপকার হল তা বোঝা দুষ্কর।" ( Modern India )। ব্যাস, বিদুর ও জাবাল সত্যকামের উদাহরণ দেখিয়ে যখন আমরা প্রাচীন ভারতের উদার আদর্শের জয়গানে আবেগে আত্মহারা হই তখন বিবেকানন্দ দেখালেন, শোষিত শ্রেণীকে পঙ্গু করে রাখার অভিপ্রায়ে শোষকশ্রেণীর এই স্বার্থগন্ধী উদারতায় বিমুগ্ধ আত্মপ্রসাদ অনুভব করার কোনো অবকাশ নেই। এই চমকপ্রদ ব্যাখ্যার ভিতরে অনেকটা কল্পনা ও অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে এমন সন্দেহের অবকাশ থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-বাস্তবের বিশ্লেষণে সুপ্রযুক্ত একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা এবং একটি সংস্কার-নির্মুক্ত সতর্ক চেতনা আমাদের আধুনিক মনকেও সচকিত করে তোলে, নূতন করে ভাববার রসদ যোগায়।

শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যান-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এ-কথাই প্রমাণ করে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জন্য শূদ্র জনসাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের বহুশ্রুত উদাত্ত আহ্বান-বাণী শুধু একটা উচ্ছল হৃদয়াবেগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্রই ছিল না, এই আবেগের পিছনে ক্লান্তিহীন গবেষকের সাধনা, মননধর্মী বাস্তব চেতনা ও যুক্তিস্নাত ভাস্বর ভাবনা সমন্বিত সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু দার্শনিক যুক্তি যখন কল্যাণধর্মী আবেগের আর্দ্রতাকে শতহস্ত দূরে রেখে এড়িয়ে চলতে চায় তখন সেই বিশুদ্ধ বিশুষ্ক পাণ্ডিত্যের চাপে মানুষের হৃদয় অতলে তলিয়ে যায়। আমরা সকলেই জানি দার্শনিক দিক থেকে বিবেকানন্দ ছিলেন শঙ্কর-বেদান্তের অনুগামী। তথাপি বলতে দ্বিধা করলেন না—"রামানুজ শঙ্কর, এরা শুধু পণ্ডিত মাত্রই ছিলেন, এঁদের হৃদয় ছিল অতি সঙ্কীর্ণ। কোথায় সেই ভালবাসা, পরের দুঃখে কাঁদে কোথায় সেই হৃদয়?"

( Works—Vol. VI, p. 394 )

র‍্যাথবোনের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় চিঠির কথা আমরা জানি। কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের ধিক্কারও কম জ্বালাময় ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে অবাক লাগে এই ভেবে যে অমন সুতীব্র আবেগেও তাঁর বুদ্ধির দীপ্তিকে কলুষিত করতে পারেনি। মিস মেরী হেলির

কাছে লেখা একখানা চিঠি আরম্ভ করলেন এই বলে—"আধুনিক ভারতে বৃটিশ শাসনের কেবল একটা মাত্রই মাঙ্গলিক চরিত্র আছে, যদিও এই চরিত্রটি এসে পড়েছে বৃটিশের অজ্ঞাতসারে ("though unconscious")। এই শাসন আর একবার ভারতবর্ষকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে টেনে বার করেছে, বহির্জগতের সংস্পর্শে আসতে তাকে বাধ্য করেছে" "কিন্তু রক্ত শোষণ করাই যে-শাসনের মূল উদ্দেশ্য সে শাসন দেশের মূলত কোন মঙ্গল করতে পারে না···শিক্ষাবিস্তার আর বরদাস্ত করা হবেনা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে, (অবশ্য বহু আগেই আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে)···কয়েকটি নিরীহ সমালোচনামূলক কথা লেখার জন্য তৎক্ষণাৎ যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হয়েছে, অন্যদের বিনাবিচারে আটক করা হয়েছে, কেউ জানে না এদের মাথা কয়টা কখন কেটে ফেলা হবে···ইংরেজ সৈনিকরা আমাদের পুরুষদের হত্যা করেছে, নারীদের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে। আর এরই পুরস্কার হিসাবে আমাদের পয়সায় এই সৈনিকদের পথ-খরচা ও পেন্সন দিয়ে বিলাতে পাঠানো হচ্ছে···মনে করো তুমি আমার এই চিঠিখানা প্রকাশ করে ফেলেছ—তাহলে ভারতবর্ষে এই মাত্র যে আইন পাশ হয়েছে সেই আইনের বলে ভারতীয় ইংরেজ সরকার এখান থেকে আমাকে টেনে হিচড়ে ভারতে নিয়ে যেতে পারবে, এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করতে পারবে···দরকার হলে রয়টারের প্রতিনিধি হুকুম মাফিক খবর তৈরী করে ঠিক উল্টা খবর প্রকাশ করবে···যে ঈশ্বর সকলের পিতা, দুর্বলের রক্ষার জন্য যিনি সবলকে ভয় করেন না, যাঁকে ঘুস দিয়ে কেনা যায় না এমন একজন ঈশ্বর কি কোথাও আছেন?" (Works—vol. III p 475-477) চিঠিখানার তারিখ ৩০শে অক্টোবর ১৮৯৯ সন। এরই সঙ্গে আবার মিলিয়ে দেখুন—"যীশু আর বাইবেল দিয়ে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ জয় করেনি। ভারতবর্ষ জয় করেছে সেই ইংল্যাণ্ড ফ্যাক্টরীর চিমনি যার রণপতাকা, পৃথিবীর বাজার যার রণক্ষেত্র। (Modern India)।

বিবেকানন্দের ভাবনার ভিতরে স্বদেশ-চেতনা ও শ্রেণীচেতনা কিরূপ একাত্মতা লাভ করেছিল তার দৃষ্টান্ত হিসাবে আর একটা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। চিকাগো থেকে তিনি দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখেছেন—"ইতিহাসের কোনকালে, কবে কোথায়

তোমাদের ধনিক জমিদার পুরোহিত ও রাজরাজড়ার দল গরীবের জন্য একবারও ভেবেছে? অথচ এদের মাথাগুলো গুঁড়ো করেই ত তাদের শক্তির জীবন-শোণিত তৈরী হয়েছে!…ভারতের দরিদ্রশ্রেণীর ভিতরে এত বেশী মুসলমান কেন বলতে পার? তরবারির জোরে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে একথা অর্থহীন। জমিদার ও পুরোহিতের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাতেই তারা মুসলমান হয়েছে। এরই ফলে দেখতে পাচ্ছ বাংলাদেশের কৃষকশ্রেণীর ভিতরে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান অনেক বেশী, কারণ বাংলাদেশে জমিদারের সংখ্যাটা অনেক বেশী।" ( Works, vol. VIII P. 330 )। এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি বা না করি, সন্ন্যাসীর ইতিহাস-চেতনায় শ্রেণীচেতনার প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। বিবেকানন্দ অন্যত্র একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে শোষিত শ্রমজীবী জনসাধারণ শোষকশ্রেণীর করায়ত্ত রাজশক্তির সমর্থনে দাঁড়াবার মত কোনও উৎসাহ অনুভব করেনি বলেই ভারতবর্ষ বারবার বিদেশীশক্তির পদানত হয়েছে।

॥ ২ ॥

নিপীড়িত মানুষের মর্মসন্ধানী ভাবনার দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত হিসাবে এ-জাতীয় অজস্র লেখা বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী থেকে তুলে ধরা যেতে পারে। এজন্য সমাজবিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতবাসীমাত্রেই এই মহামনীষীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এই সকৃতজ্ঞ স্মৃতিপূজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনা-স্বরূপের যে একটা সুনির্দিষ্ট সীমা ছিল সেদিকেও লক্ষ্য না রাখলে আমাদের আলোচনা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই যে চিঠি থেকে একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি তার ভিতরে বিবেকানন্দের সমাজ-দৃষ্টির সীমারেখাটাও স্পষ্ট করে চোখে পড়েছে। ঐ চিঠির ভিতরে তিনি বলছেন, "সবশেষে আসবে শ্রমজীবীর প্রভুত্ব। এর একটা সুফল ফলবে, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পুনর্বণ্টন হবে, সঙ্গে সঙ্গে এর একটা কুফলও বোধ হয় দেখা দেবে, সংস্কৃতির মান নীচে নেমে যাবে। সাধারণ শিক্ষা বিপুলভাবে প্রসার লাভ করবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালীদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাবে।" যুগ থেকে যুগান্তব্যাপী একটানা বঞ্চনার প্রতিক্রিয়া

হিসাবে "শূদ্র-বিপ্লব" অবশ্যম্ভাবী। বিবেকানন্দ তাঁর দিনে এই অনাগত ও আসন্ন বিপ্লবকে ভবিষ্যতের অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। ন্যায়নীতি ও সমাজনীতি উভয় দিক থেকেই এ বিপ্লব অপরিহার্য্য একথা তিনি বুঝেছিলেন। তথাপি এ বিপ্লবের দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব যে দুর্বার পদক্ষেপে অগ্রগামী হবে এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না, এ বিপ্লবের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভের সমস্যা সমাধান হবে এমন আশা তিনি পোষণ করতেন না। "শূদ্র-চরিত্র" সম্পর্কে একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশা এই অবিশ্বাসের মূলে কাজ করেছে। দেওয়ান হরিদাস দেশাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে তিনি আমেরিকার নিগ্রোদের ভিতরে অনৈক্য, পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও চক্রান্ত দেখে জ্বালাময় দুঃখ ও অবসন্ন হতাশা প্রকাশ করেছেন। প্রতিপত্তিশালী উচ্চশিক্ষিত নিগ্রোও উচ্চবর্ণের মধ্যে ঠাঁই লাভ করে "জাতে ওঠার" লোভে স্বজাতিকে ভুলে যায় এমন আত্মবিস্মরণের দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাই "বর্তমান ভারত" প্রবন্ধে তিনি বললেন "শূদ্র-শ্রেণীর" অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু শূদ্র জাগবে তার শূদ্রত্ব নিয়ে।" ( with their Shudrahood"—এই কথাটির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন ) "শূদ্রত্ব" বলতে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন তাও ব্যাখ্যা করেছেন। "স্মরণাতীত কাল থেকে অত্যাচারের চাপে বিচূর্ণিত এই শূদ্র শ্রেণী ন্যক্কারজনক দাসমনোবৃত্তি গ্রহণ করে কুকুরের মত উচ্চবর্ণের পদলেহন করে এসেছে, আর না হয়ত অমানুষ নিষ্ঠুর পশুতে পরিণত হয়েছে। তাদের আশা ভরসা বার বার ধূলিসাৎ হয়েছে। লক্ষ্যানুসন্ধানের দৃঢ়তা, ও কর্মক্ষেত্রে অবিচল অধ্যবসায় বলতে তাদের কিছুই নেই।" বিবেকানন্দ যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন সে-স্বপ্ন যে কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে এমন ভরসা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের সংগঠনী প্রতিভা ও শূদ্রের সাম্যনীতির সমন্বিত স্বরূপই ছিল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই বলিষ্ঠ কল্পনাকে তিনি একটি সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়ে সমাপ্ত করলেন—"কিন্তু সে কি সম্ভব?" ( Works—Vol. VI, P. 381 )। তাঁর জীবনে এ জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনি। দ্বিধা-কণ্টকিত সমাজে জীবনের এই নিরুত্তর জিজ্ঞাবা, ব্যথিত আবেগের এই আশাহীন ব্যাকুলতাই বোধ হয় তাঁকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পথে সকল

সমস্যার চরম বিশ্রান্তি খুঁজতে বাধ্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হবে, শ্রমজীবীর আধিপত্যের ভিতর দিয়ে মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে—ইতিহাসের এই অমোঘ অনুশাসন লঙ্ঘন করার উপায় নেই। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাই সব শেষে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে—এও যথেষ্ট নয়, এহ বাহ্য। আরও আগে চলতে হবে। সামাজিক ও ব্যবহারিক উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেও শেষ রক্ষা হবে না। তখন মানুষ বুঝতে পারবে—আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যই সব চেয়ে বড় কথা। যাকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, যাকে পেলে আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না, যার আলোতে চন্দ্র-সূর্য্য আলো দেয় সেই পরমেশ্বরের ঐকান্তিক আরাধনাই চরম মুক্তির পরম পন্থা। প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত চিঠিখানার এই হল মর্মকথা। স্বচ্ছ দৃষ্টি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিজ্ঞানীসুলভ বিশ্লেষণী শক্তি, নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ-কামনায় উদ্বেলিত এক দুরন্ত আবেগ, এ সব কিছুই যেন কোন এক অবসন্ন সন্ধ্যায় চূড়ান্ত অবসান খুঁজেছে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের পরম প্রশান্তির মধ্যে। যে-ঈশ্বর মানুষের মুখে রুটি যোগাতে পারে না সে-ঈশ্বরে বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু রুটি যেদিন জুটবে সেদিন মানুষও বুঝবে রুটির চেয়ে ঈশ্বর অনেক বড়, এই ছিল সমাজবাদী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদী বিশ্বাস। "Not by bread alone" কথাটির অর্থ "even without bread" হতে পারে এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না, কিন্তু ফাঁপা রুটির ফাঁকগুলো "ঈশ্বর" দিয়ে ভর্তি করতে হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

"শূদ্র-বিপ্লবে"র আত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে একটা হতাশাক্লিষ্ট সংশয়ই শুধু তাঁকে ঈশ্বর-প্রত্যাশার স্নিগ্ধ সান্ত্বনার বুকে টেনে নিয়েছে—একথা অর্দ্ধসত্য-মাত্র। একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার নবজাগৃতির ঋত্বিককুলের উপর ঔপনিষদিক ব্রহ্ম-বাদের প্রভাব ছিল অসামান্য। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ বীর-সিংহের সিংহ শিশু ঈশ্বরচন্দ্র, যিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নতজানু হওয়ার প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করেননি। তিনি যেমন "সোহং"-বাদও প্রচার করেননি, তেমনি মানুষের অনেক রকম দাসত্বের মধ্যে আবার ঈশ্বরের দাসত্ব আমদানী করলে কারুর কোন মঙ্গল হবে এমন কোন ধারণাও পোষণ

করেননি। বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত সমাজচেতনাও ব্রহ্মবিজ্ঞানের ধারাস্নানে আত্মশুদ্ধি করেছে।

শক্তি ও সভ্যতার উচ্ছ্রিত অহঙ্কারে প্রমত্ত এক বিজাতীয় শাসন ভারতবর্ষকে নাগপাশে বেঁধেছিল। শ্বাসরুদ্ধ পরাধীন জাতি তখন আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোকস্নাত বাংলার মনীষা তখন স্বদেশী ঐতিহ্যের মধ্যে এমন একটা বিরাট আদর্শের সন্ধান করেছে যার উপর নির্ভর করে স্বদেশ আবার আত্মসমীক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হবে এবং সভ্যতাগর্বী পশ্চিমী সমাজও যাকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ স্বভাবতই এমন একটা আদর্শের সন্ধান দিয়েছে। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে Monism বলে, মানুষের মনন ধারার উপর তার বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য। এই Monism বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ হলে মার্কসবাদেও পর্যবসিত হতে পারে। Monism-এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোন বাংলা তর্জমা মনে আসছে না বলে মার্কসবাদের একটা নামকরণ করা যেতে পারে বস্তুতান্ত্রিক অদ্বৈতবাদ। লেনিনের মতে যে গ্রন্থ একপুরুষ ধরে রুশিয়ার মার্কসবাদীদের শিক্ষিত করেছে, প্লেখানভ তাঁর সেই প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন "The Development of the Monistic View of History"। আবার বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তরলোকেই যখন সেই একক সত্যের সন্ধান করা হয় তখন Monism পরিণত হয় শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে, যে মতে—এক দ্বৈতহীন নিরাকার বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য—বাকী সব মিথ্যা, একটা অনাদি ভ্রান্তিবিলাস মাত্র।

সুতরাং অদ্বৈতবাদকে আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করবেন তাঁর উপর আপনার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও তার দর্শনকে অদ্বৈতবাদী বলেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। অনন্ত বিজ্ঞানক্ষণের বিশ্রামহীন স্রোতের মধ্যে বিলীয়মান এক একটি ক্ষণিক বিজ্ঞান, এই একমাত্র সত্য, এক মুহূর্তে সে একক যদিও সাকার, শঙ্কর-সম্মত বিজ্ঞানের মত নিরাকার নয়। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উপর ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রভাব অনেকে লক্ষ্য করেছেন। বাহির্জগতের

অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের দিক থেকে এই সাদৃশ্য কতখানি যুক্তিসহ অবশ্যই তা বিচার্য্য বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দুয়ের মধ্যে যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি না দিলে একদেশদর্শিতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ পূর্ণতা বা সমগ্রতাকে স্বীকার করেনি। যা "সমগ্র" তা সত্য নয়, অংশটাই একমাত্র সত্য, যে অংশ নিরংশ অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে যার ভিতরে আর কোন অংশের ধারণা করা যাবে না তাই সত্য। তাই একক্ষণের বিজ্ঞানটুকুই একমাত্র সত্য, বিজ্ঞান-ক্ষণের সন্তান অর্থাৎ স্রোত বা প্রবাহটা সত্য নয়, ওটাও বিকল্প মাত্র। আচার্য্য ধর্মকীর্তি তাঁর "প্রমাণবার্তিকের" পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে অবয়বীর অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন, অবয়বটাকেই সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। একটা সামগ্রিক ঐক্যের ধারণা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অপর-দিকে, অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎসংসার একটা সূত্রে বাঁধা, বৈচিত্র্যের পিছনে কোথাও একটা সুনিবিড় ঐক্য বর্তমান, বহু মানুষের বহু অভিজ্ঞতা, বস্তুজগতের বহু খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তি সব কিছুর পিছনে একটা সামগ্রিক ঐকিক সত্তা কাজ করে যাচ্ছে, উপনিষদের প্রথম পাঠকের মনেও এই প্রাথমিক ধারণা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বুদ্ধের বাণী শুনলে যে ধারণাই হোক না কেন, দিক্‌পাল বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচয় হলে এই সামগ্রিক ঐক্যের ধারণাটা অবলুপ্ত হতে বাধ্য। এই পূর্ণতম ঐক্যের ধারণাকে আমরা অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি। শংকর-সম্মত নিরাকার ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদ, রামানুজ-প্রদর্শিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এমন কি হেগেলীয় সমগ্রতাবাদ দিয়েও এর ব্যাখ্যা করা চলে। এই দার্শনিক ঐক্যানুভূতির সঙ্গে মার্ক্সবাদেরও কোনো মৌলিক বিরোধ নেই।

সেই প্রাচীন যুগেও বিশ্বপ্রকৃতিকে যতটুকু পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল তার ভিতর দিয়েও একটা সুবিন্যস্ত বিধিবদ্ধতা, একটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নিয়মানুবর্তিতার ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। আর একদিকে প্রাচীন আর্য্যসমাজের জটিলতাবর্জিত ঐকিক অন্তঃপ্রকৃতিও একটা সামগ্রিক ঐক্যানুভূতির ভিতরে মানুষের সমাজকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এগিয়ে নিয়েছিল, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সন্ধানে মানুষকে অনুপ্রেরিত করেছিল। আমাদের বহুমুখী অভিজ্ঞতায় যে ঘটনাপুঞ্জ বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড আকারে দেখা দেয় তার

ভিতরে একটা সাধারণ নিয়মসূত্রের অস্তিত্ব অনুসরণ করা, এক অখণ্ড পূর্ণতার সন্ধান করা বোধহয় মানব-সভ্যতার সৃষ্টি ও অগ্রগতির প্রধান উৎস। "যিনি এক তিনি বহু হলেন" এ শুধু শঙ্কর-বেদান্তের কথা নয়। এ বস্তুবাদী মার্ক্সবাদের ও মূলকথা। কারণ, এ মননশীল মানবমনে প্রতিফলিত বস্তু-সত্যের প্রথম প্রকাশ। কিন্তু বহুরূপে পরিব্যাপ্ত সেই একের স্বরূপ কি? সে কি এক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, সে কি এক নিরাকার বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, সে কি এক অব্যর্থ অন্ধ নিয়তি, এক সর্বগ্রাসী মহাকাল, অথবা সে এক মূল বস্তুপ্রকৃতি (primordial matter) যা আপন নিয়মে বহু ধারায় বিভক্ত ও বিবর্তিত হয়ে এই বিচিত্র বস্তুজগতে পরিণতি লাভ করেছে? আধুনিক বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বস্তুবাদ এই শেষের সূত্রটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

তা হলে সমগ্রতা ও একতাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করা হবে তার উপর দার্শনিক মতের মূলগত ভেদটাও অনেকটা নির্ভর করছে। একটা অপেক্ষাকৃত স্থূল উদাহরণ দেয়া যাক। উপনিষদের একটা বহুজন-শ্রুত বাণী—"মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্"। এর তাৎপর্য্যার্থ অনেকরকম কল্পনা করা যেতে পারে। মনে করুন প্রাচীন আর্য্যদের যৌথ সমাজব্যবস্থার শেষদশায় যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিন্দু বিন্দু বিকাশ আরম্ভ হয়েছে তখন একথাটি ব্যক্তিগত লোভের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে। কার ধন? কারুর একার নয়, কিন্তু সকলের। সুতরাং লোভ করবে না। আবার শ্রমজীবি মানুষের বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই একই কথার তাৎপর্য একেবারে উল্টে যাবে। মনুসংহিতার সমাজে এর অর্থ হবে শূদ্রের প্রতি কঠোর হুঁসিশারী। মনু বিধান দিয়েছেন শূদ্রের ধনসঞ্চয়ের অধিকার নেই। কাজেই শূদ্র যদি সমাজে তার শ্রমের ন্যায্য ফল দাবী করে, মনুর মতে সে হবে অন্যের ধনে লোভ করার সামিল। শোষক শ্রেণীর লোভকে গোপন করার জন্য শোষিত শ্রেণীকেই লোভী বলে চিত্রিত করার এ এক বিচিত্র প্রয়াস। অনেকদিন আমাদের এমন তর্ক শুনতে হয়েছে কমিউনিষ্টরা ছোট-লোকদের স্বাভাবিক লোভ, ঈর্ষ্যা ও পরশ্রীকাতরতায় ইন্ধন যুগিয়ে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করছে। শ্রেণীবিদ্বেষ যার রক্তে ও অস্থিমজ্জায় মিশে আছে সেই মালিকশ্রেণীর পক্ষে শ্রেণীসাম্য প্রচারের কি অপূর্ব চাতুরী! আবার রবীন্দ্রনাথের মত স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষী উপনিষদের এই প্রখ্যাত কথাটির প্রাচীন-

তম তাৎপর্যে ফিরে গেলেন। বর্তমানযুগে ধনিকশ্রেণীর দুরন্ত মুনাফালোভকেই তিনি উপনিষদের মন্ত্র দ্বারা আঘাত করলেন।

উপনিষদ মানুষের ঐক্য ও সমগ্রতাবোধের প্রাচীনতম বাণীমূর্তি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনীষিবৃন্দ উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন। যে দেশে সভ্যতার উষালগ্ন উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্রে মুখর হয়ে উঠেছিল সে দেশ ছোট নয়, সে জাতি তুচ্ছ নয়, পরাধীন জাতির অবলুপ্ত আত্মচেতনাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই উদ্দীপনা, এই উদ্বোধনী শক্তির প্রয়োজন ছিল। সভ্যতাগর্বিত বিদেশী শাসকবর্গের সামনে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াবার জন্য যে সাহসের প্রয়োজন প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞাবাণী সেই আত্মোপলব্ধির সাহস সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ "ভারত-তীর্থকে" বৈদিকমন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণ বলে কল্পনা করেছেন। সমগ্রতাবাদী ঔপনিষদিক দর্শনকে বিবেকানন্দ যেভাবে তাঁর সমাজ-দর্শনে পরিণত করলেন তার তুলনা বিরল।

"সমগ্রের জীবনেই ব্যক্তির জীবন, সমগ্রের সুখেই ব্যক্তির সুখ। সমগ্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না—এই হ'ল শাশ্বত সত্য, এই সেই প্রস্তর-ভিত্তি যার উপর বিশ্বসংসার গড়ে উঠেছে।···এই প্রকৃতির নিয়ম, ······চিরদিন কেউ সমাজকে বঞ্চনা করে চলতে পারেনা।···সমাজের উপর তলায় যতই জঞ্জাল পুঞ্জীভূত হোক না কেন, সেই জঞ্জালের নীচে সমাজের প্রাণশক্তির অক্ষয় ধারা স্পন্দিত হতে থাকে।···সমাজ পৃথিবীর মত সর্বংসহ, অনেক ধৈর্যের সঙ্গে অনেকদিন অত্যাচার সহ্য করে চলে। কিন্তু একদিন সে জাগে, ভূমিকম্পের শক্তি নিয়ে জাগে। লক্ষ বছরের নীরব প্রতীক্ষার যুগে যে তুচ্ছতা ও স্বার্থপরতার গ্লানিময় আবর্জনা সমাজের বুকে জমে উঠেছিল এই ভূমিকম্প এক নিমেষে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।" ["Modern India"—"বর্তমান ভারত" নামে মূল বাংলা প্রবন্ধটি এই প্রবন্ধ লেখার সময় লেখকের হাতের কাছে ছিলনা, তাই মূলের ইংরেজী অনুবাদ থেকে পুনরনুবাদ করতে হ'ল—এজন্য পাঠক মার্জনা করবেন।]

ঔপনিষদিক দর্শনের এই সামাজিক পরিণতির সঙ্গে শঙ্কর প্রচারিত বেদান্ত-দর্শনের কোন সঙ্গতি নেই। বিবেকানন্দ নিজেকে অবশ্য শঙ্কর-বেদান্তের ধারক বলে মনে করতেন। কিন্তু মনুসংহিতার যে সমাজবিধানকে

বিবেকানন্দ তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেছেন শঙ্কর-বেদান্ত সেই সমাজের শাসন অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আজও মোহন্ত-মহারাজেরা মনুসংহিতার সনাতন ধর্মের শাসন ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। শংকরের মায়াবাদকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করলে এই সনাতন পথই গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র নিরাকার বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই যখন সত্য, সমাজ সংসার, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্য্যন্ত সবই যখন মিথ্যা, তখন নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ধনিকশ্রেণীর শোষণ-ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করে বঞ্চিত মানুষকে মানবিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসটাও মিথ্যা, মূল্যহীন। রাজশক্তি ও বিত্তবানদের অনুগ্রহে মঠগুলি বেঁচে থাকুক, মোহন্তরা বেঁচে থাকুন, এই মঠ-মিশনগুলিতে অকাতরে অর্থদান করার জন্য ধনিকের মুনাফা-শোষণের পবিত্র অধিকার চিরকাল বেঁচে থাকুক, এই মায়াময় সংসারে এইটুকু মায়া বেঁচে থাকলেই যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এ জাতীয় মায়াবাদে বিশ্বাস করতেন না। "গীতা-পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে তোমরা স্বর্গের অনেক কাছা-কাছি যেতে পারবে। এগুলি দুঃসাহসিক কথা, কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বলেই বলছি। বাইসেপ মাসল মজবুত করলে গীতা অনেক ভাল বুঝতে পারবে" ("Vedanta and Indian life")। উনবিংশ শতাব্দীর যে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী একথা বলতে পেরেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই নমস্য। শংকরাচার্য্য নিজে তাঁর মায়াবাদ যেভাবে বুঝেছিলেন, শংকরানুবর্তী পরবর্তী দুর্ধর্ষ তার্কিক দার্শনিকবৃন্দ এই মায়াবাদকে যেভাবে অনির্বচনীয়তা-সর্বস্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন, বিবেকানন্দ মায়াবাদকে সেই একই অর্থে গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিবেকানন্দ যেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন সেই "জ্ঞানযোগে", অথবা "কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত বক্তৃতাবলী"তে কোথাও শ্রীহর্ষ, চিৎসুখাচার্য্য বা মধুসূদন সরস্বতীর মত মায়াবাদের ব্যাখ্যা করেন নি। সর্বত্রই তিনি হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে এক মানবধর্মী বৈদান্তিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন। শংকর থেকে মধুসূদন সরস্বতী পর্য্যন্ত কোন বৈদান্তিকের ভিতরে এই বৃহত্তম মানবিকতার লেশমাত্র পাওয়া যাবে না। কারণ তাঁরা সমাজদর্শনকে দর্শনের মধ্যে গণনা করেননি, অথবা মনুসংহিতাকেই সমাজদর্শনের শেষ ও

সার কথা বলে ধরে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বার বার ঘুরে ফিরে দর্শনের মানবিক মর্মকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সকল মানুষ যখন এক, নিখিল বিশ্ব যখন একই ব্রহ্মের সংহতমূর্তি ( Perfect solidarity of the Universe ) তখন মানুষের উপর মানুষের বৈষম্যমূলক শোষণ ও নিপীড়ন এই শাশ্বত সত্যের বিরোধী, অদ্বৈত বেদান্তের ব্যভিচার। অথচ বিবেকানন্দ যাঁকে নিজের দার্শনিক গুরু বলে মনে করতেন সেই শংকর ও তার শিষ্যপরম্পরা কিন্তু অনায়াসে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রহ্মবাদকে দিব্যি মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন। মায়াবাদকে এই শোষণব্যবস্থার সহায় হিসাবে প্রয়োগ করাও অসম্ভব নয়। যদিও এরকম কল্পনা করা অন্যায় হবে যে সকল মায়াবাদী দার্শনিক সজ্ঞানে শোষণব্যবস্থার সহায়ক হিসাবে মায়াবাদকে গড়ে তুলেছিলেন।

এটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে বিবেকানন্দ ব্রহ্মবাদকে শোষণ-ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেননি। তাই অন্ততঃ দু'জায়গায় শংকরের হৃদয়হীন সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের হৃদয় ও শংকরের বুদ্ধির একত্র মিলন হওয়াটাই তার কাম্য ছিল। মূল প্রশ্নটা কিন্তু হৃদয়ের নয়, এ হল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। শুধু হৃদয়ের প্রশ্ন হলে ব্যক্তিগতভাবে পরোপকারের চেষ্টা করে, কতকটা সেবাধর্মের অনুষ্ঠান করে দরদী হৃদয়ের দাবী মেটানো সম্ভব হত। বিবেকানন্দের হৃদয়ের দরদ সমাজটাকে ঢেলে সাজাবার প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত হয়েছিল। প্রশ্নটা তিনি যে কত জোরালো ভাবে তুলেছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। অবশ্য সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন সেই মিশন-মার্কা পন্থা কোনদিনই সমাজ-বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারবে না। তিনি সমস্যার সমাধান দিতে না পারলেও সমস্যাটির মূল চরিত্র যে হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করেছিলেন, বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন সেটাও একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব। পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বলিষ্ঠভাবে কোন একটা মূল প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরাটাও মহতী প্রজ্ঞার পরিচায়ক। বিবেকানন্দ সে কাজ সার্থকভাবেই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রদর্শিত সমাধান-পদ্ধতিটা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের কুয়াশায় কলুষিত ছিল এ বিষয়ে কোনো বস্তুবাদীর সংশয়

থাকা উচিত নয়। এ বিষয়ে শুধু বিবেকানন্দ কেন, উনবিংশ শতকের ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বলতম পরিণতি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিও এই কুয়াশার আবরণকে ভেদ করে বাহির হতে পারেনি, যদিও বিবেকানন্দের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই আবরণটা অনেক বেশী পাতলা ছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক-ধারায় স্নান করেও যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জ্যোতির্ময় রূপটিকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছিলেন এবং সেই পথেই স্বজাতির ভিতরে আত্মোপলব্ধি-প্রদীপ্ত স্বাদেশিকতা উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেছিলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই সকল ভারতপথিকই আধুনিক বুদ্ধিদ্বারা পরিমার্জিত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে এক পরম প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। টোল-ঘরের সংস্কৃত পড়া বিদ্যাসাগরই এই ধারার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। আর এদের ভিতরে রবীন্দ্রনাথই অধ্যাত্মবাদকে লোকোত্তর ব্রহ্মলোক থেকে টেনে এনে মানব-সমাজের সামগ্রিক রূপের মধ্যে এক বৃহত্তম মানবিকতাবোধের সঙ্গে একাত্ম করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এখানে বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টির সামনে সব চেয়ে বড় বাধা ছিল শংকরের মায়াবাদ। এ বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর সমাজ দর্শনে তিনি যে ঔপনিষদিক ঐক্য ও সমগ্রতাবোধকে তুলে ধরেছিলেন তার সঙ্গে মায়াবাদের যে একটা মৌলিক দার্শনিক অসঙ্গতি আছে একথা তিনি স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। কিভাবে তিনি কষ্টকল্পিত সঙ্গতির চেষ্টা করেছিলেন আমাদের প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত চিঠিখানির উপসংহারই তার প্রমাণ। শ্রমজীবির বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পর মানুষ বুঝতে পারবে সমাজ সংসার সব মিথ্যা, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। তখন ঈশ্বরানুভূতির দরজায় গিয়ে মানুষকে ধর্ণা দিতে হবে। এই সত্যোপলব্ধির জন্যও তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মানুষকে যেতে হবে। মানুষকে সবরকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে দেয়া হোক, শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই। তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল বিজ্ঞানধর্মী ও মানবধর্মী, সমাজ-বাস্তবের বিশ্লেষণে তাই তিনি আধুনিক সত্যদৃষ্টির পথে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, কিন্তু হৃদয়টি ছিল দ্বিখণ্ডিত। নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনায়, সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের

প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভে এই হৃদয় উদ্বেলিত হত, আর একদিকে অলৌকিক অনুভূতির উপর গভীর বিশ্বাস, শংকর-বেদান্তের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ঐ একই হৃদয়কে এক লোকোত্তর প্রশান্তির কোলে টেনে নিয়ে যেত—শেষ পর্য্যন্ত সব মিথ্যা, সবই মায়া। শংকর-প্রদর্শিত অধ্যাত্মবাদই ভারতের সব চেয়ে বড় ঐতিহ্য। এই অধ্যাত্মবাদের পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই মানুষের চরম মুক্তি সম্ভব হবে এ বিশ্বাস তিনি ছাড়তে পারেন নি। দেশ-বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাময়িক বিফলতা, ভারতবর্ষের সমাজজীবনের গ্লানিময় পরিবেশ, বৃটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফলহীন নিরুপায় প্রতিবাদ, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব, শ্রমজীবি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রের সীমাহীন দুর্বলতা এ সব কিছু মিলিয়ে তাঁর হৃদয়ে মাঝে মাঝে হয়ত এমন এক হতাশার সৃষ্টি করত যার ফলে মায়াবাদকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরার এক বিপরীত প্রেরণা তিনি আরও বেশী করে অনুভব করতেন। রামকৃষ্ণদেবের হৃদয়টিও ছিল মানবিকতা ও অলৌকিকতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। রামকৃষ্ণ অলৌকিক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উপযুক্ত শিষ্যকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন, এই লোকোত্তর বিশ্বাসে তাঁর বিন্দু-মাত্র শিথিলতা ছিল না। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষটাও কেন্দ্রীভূত সমাহিত চিত্তের উপর প্রযুক্ত একধরণের self-hypnotic প্রক্রিয়া কিনা, এ জাতীয় সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমল দেননি। রামকৃষ্ণের চরিত্রের কতগুলি অপূর্ব মানবিক গুণ বিবেকানন্দের উপর যাদুর মত কাজ করেছে এবং এই মানবিক আকর্ষণ অলৌকিকতা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই সব কিছু মিলিয়েই বিবেকানন্দের চরিত্রে স্ববিরোধিতার উৎস আমাদের সন্ধান করতে হবে।

আর একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্তের দল এজন্য এই প্রবন্ধ-লেখকের ভিতরে "অর্বাচীনের আস্পর্দ্ধা"র সন্ধান পাবেন বলে আশংকা আছে। তথাপি একথা স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন যে শংকরের মায়াবাদের প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শংকর-বেদান্তের বিবেকানন্দ-কৃত ব্যাখ্যায় ভিতরে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্য অনেক বেশী। মায়াবাদের তিনি কোথাও বিশেষ বিস্তৃত অর্থ করেন নি, অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি অনেক বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন।

"অদ্বৈত-মতে এক বিজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, দুইই বটে। ব্রহ্ম জগত্ রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিণত হয়নি; জগত্ নেই, ব্রহ্মই আছে। মায়া সম্পর্কে ধারণা করতে হলে বেদান্তের এই মূলকথাটি বুঝতে হবে।...যা আছে তা শুধু ব্রহ্ম, পার্থক্য ও বহুত্ব সবই মায়াকৃত। ......ভারতবর্ষ হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সকল জাতির কাছে এই challenge জানিয়েছে। ফল হয়েছে, সেই জাতিগুলি সব মুছে গেছে, তোমরা বেঁচে আছ। জগতটা ভ্রান্তিমাত্র, সব কিছু মায়া। তুমি নখ দিয়ে মাটি খুঁটেই খাবার খাও বা সোনার থালায় করেই খাও, তুমি প্রবল প্রতাপশালী রাজচক্রবর্তী হয়ে প্রাসাদেই বাস কর, অথবা তুমি দীনতম ভিক্ষুকই হও, শেষ পরিণতি মৃত্যু, সব সমান, সব মায়া। এই হল বিশ্বের প্রতি ভারতের challenge" ( The Vedanta in All its Phases"—Lectures from Colombo to Almora, P 323-324 )। এই উদ্ধৃতির ভিতরে প্রথম অংশটুকু শংকর বেদান্তের একটা মূল কথা বটে, কিন্তু পরে যেভাবে মায়াবাদের ব্যাখ্যার উপসংহার টানলেন—ওগুলো কোনও দার্শনিক কথা নয়। মায়াবাদের স্বরূপ বুঝতে এ কথাগুলি বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। এ জাতীয় মায়াবাদের প্রচার হিন্দুঘরের দর্শনানভিজ্ঞ বৃদ্ধবৃদ্ধার দলও দিনরাত করে থাকেন। "রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মৃত্যুতে সব সমান, সংসার মিথ্যা মায়াময়" এর বেশী আর কিছুই বলা হল না। আর এ কথাটিই যদি বিশ্বের প্রতি ভারতবর্ষের challenge হয়ে থাকে, তবে বিশ্বের পক্ষে এই challenge-এর কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন পড়ে না। ভারতবর্ষ অনেকবার নিজের মুমূর্ষু অবস্থার ভিতর দিয়ে নিজেই এর উত্তর দিয়েছে।

শঙ্কর-বেদান্তের অধ্যবসায়ী ছাত্র মাত্রেই জানেন যে মায়াবাদের মূলকথা মায়া বা অবিদ্যার ভাব-রূপতা এবং অনির্বচনীয়তা ( Positiveness and Indefinability )। শংকরশিষ্য পদ্মপাদ থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দীর মধুসূদন সরস্বতী পর্য্যন্ত কয়েক শ' বছর ধরে, কয়েক হাজার পৃষ্ঠা ধরে এই অনির্বাচ্যতাবাদের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। সেই সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের মধ্যে না গিয়ে 'সব মায়ার খেলা' বলে ছেড়ে দিলে কিছুই বোঝা যায় না, challenge তো দূরের কথা। কিন্তু এত পরিশ্রম, এত কূট তর্কের পরও সার কথাটা এই মাত্র দাঁড়াল—জগতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোনটাই

যুক্তি বা তর্কের দ্বারা, কোন ন্যায়সম্মত ধারণার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; নির্বচন করা যায় না। সুতরাং জগত্ অনির্বচনীয়, অথচ একে অভাব বা শুদ্ধ negation বলেও কল্পনা করা যায় না, জগতের প্রতীতিটা ভাবরূপেই হয়ে থাকে। এই অর্থেই জগত্ মায়াময়। এই ভাবরূপে প্রতিভাত, অথচ যুক্তি ও সংজ্ঞার দ্বারা অস্তি বা নাস্তি রূপে অনির্বচনীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের ভাবনা থেকে যদি একটা abstract principle-এর কল্পনা করা যায়, যা সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সেই ভাবরূপ অনির্বচনীয়তা সর্বস্ব abstraction-এর নাম দেয়া হয়েছে "মায়া" বা "অবিদ্যা"—"সদসত্ত্যাম্ অনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী"। এই অর্থেই জগৎ মিথ্যা। যেহেতু এই অবিদ্যাকে সৎ বা অসৎ অথবা সদসৎ কোনও ভাবেই নির্বচন করা যায় না, সুতরাং একে ব্রহ্মের অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় সত্তারূপেও দাঁড় করানো যায় না। তাই ভাবরূপ অবিদ্যা স্বীকারের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব খণ্ডিত হয় না।

অদ্বৈত বৈদান্তিকদের ভিতরে দুর্ধর্ষতম তার্কিক কবি-দার্শনিক শ্রীহর্ষ "মায়া" সম্পর্কে এই জাতীয় ব্যাখ্যার মধ্যে একধরণের scepticism বা সন্দেহবাদের আশংকা করেই পূর্বপক্ষের একটা আপত্তিও সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা করেছেন—"আপনারা যদি জগতের কোন যুক্তিসিদ্ধ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারেন, তবে উপযুক্ত আচার্যের কাছে সংজ্ঞা-নির্ধারণ-প্রণালীটা শিক্ষা করে নিন, আপনার ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সংজ্ঞা ঠিক করা যাবে না বলে জগতটা মিথ্যা হয়ে যাবে এমন দাবী করবেন কেন? পূর্বপক্ষ এ আপত্তি তুলতে পারেন। তাদের আমরা অদ্বৈতবাদীরা এই কথাই বলব,—আপনারা যারা জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, আপনারাই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে এই অস্তিত্বের লক্ষণটা কি বলুন। আমরা দেখিয়ে দেব কোন লক্ষণই ধোপে টিকবে না। তবে কি জগতের অস্তিত্ব নেই? তাহলে আপনারাই জগতের নাস্তিত্বের লক্ষণ বলুন। আমরা দেখিয়ে দেব তাও সম্ভব নয়। সুতরাং জগতের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আপনাদের যুক্তি অনুসরণ করেই জগতটাকে অনির্বচনীয় বলছি। যদি আমাদের কথা বলেন, আমরা একটি মাত্রই সত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট আছি, সেই এক অদ্বিতীয় বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মসত্যের উপর নির্ভর করেই আমরা চরিতার্থ।"

এখন গঙ্গাযাত্রীর বৈরাগ্যবাণীর অর্থেই জগৎটাকে মায়াময় বলি, অথবা

সূক্ষ্ম দার্শনিক অর্থেই মায়াময় বলি, প্রশ্ন থেকে যায় এই মায়াবাদের সার্থকতা কি? বিবেকানন্দ কি এই মায়াবাদ প্রচার করেই ভারতের প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন? সমগ্র মানব সমাজের মৌলিক একতা, বিদ্বেষমুক্ত এক মানবিক সংহতি, স্বার্থ-গন্ধহীন স্বাভাবিক মানবীয় শুভ বুদ্ধি, মানুষ মূলতঃ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ,—ব্যক্তিগত লোভ, অন্যের উপর পীড়ন ও শোষণ মূল মানবপ্রকৃতির ব্যভিচার,—ঔপনিষদিক সমগ্রতাবাদী দর্শনের এই মানবমুখী ব্যাখ্যা জগতের সামনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তুলে ধরতে না পারলে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি পশ্চিম দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব হত না।

মায়াবাদের সার্থকতার প্রসঙ্গটি আমরা নিছক ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই উত্থাপন করিনি, "বিশুদ্ধ দার্শনিক" দৃষ্টিকোণ থেকেও উত্থাপন করেছি। জগতটা যদি মূলতঃ মিথ্যাই হয় তবে এই দিব্যজ্ঞান লাভ করা না করায় কার কি আসে যায়, যুক্তিতর্কের দিক থেকেই বা কি হানি হয়? জগতটা মিথ্যা হলে আমার এই দিব্যজ্ঞানে বঞ্চিত হবার ঘটনাটি, আর আপনার এই দিব্যজ্ঞান লাভ করার ঘটনাটি উভয়েই সমান মিথ্যা। আমার ও আপনার সকল বিশ্বাস অবিশ্বাস সবই সমান মিথ্যা। আমি যদি বস্তু-জগতটাকে সত্য মনে করে মায়ামোহে ডুবে থাকি, আর আপনি যদি অসত্য মনে করে মায়ামোহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, উভয়েরই জ্ঞান-অজ্ঞানের সমান মূল্য। কারণ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য কি মিথ্যা, জগতটা সত্য কি মিথ্যা তা ত আপনার বা আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর নির্ভর করছে না। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার কোন প্রয়োজন পড়েনা। কারণ বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপর নির্ভর করে বসে নেই। তিনি স্বয়ম্ভূ নিজে নিজের মতই আছেন; আপনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করে জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণ করুন, আর আমি দিব্যি দুদিন ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকি। আপনার বরং বৃথা কষ্ট করাটাই সার। কারণ আপনার কৃচ্ছ্রসাধন আর আমার সুখ-সম্ভোগ দুই শেষ পর্যন্ত সমানে মিথ্যা। আর যে জগতটাই নেই তাকে উদ্ধার করার জন্য এত প্রচার, আয়োজন, এত গাদায় গাদায় বই লেখা, এত বক্তৃতা, সবই পণ্ডশ্রম। জগৎটা উদ্ধার হল আর নাই হল, জগত যে মিথ্যা সেই মিথ্যা, ব্রহ্ম যে সত্য সেই সত্য। সুতরাং শংকর-বেদান্ত মূলতঃ non-ethical

philosophy, শুধু তাই নয়, এক ধরণের atheistic philosophy-ও বটে। কারণ শংকর-বেদান্তের যুক্তি নৈয়ায়িক নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করলে সৃষ্টি-কর্তা ঈশ্বরও মূলত মিথ্যা, ঈশ্বরোপাসনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। পাপ পুণ্যের ভিতরে, ন্যায় অন্যায়ের ভিতরে তফাৎ করার কোন বাস্তব নিরিখ থাকে না। এর উত্তরে বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরোপাসনা ও পুণ্যকর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, সেই বিশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ হয়। এরও উত্তর আগেই আমরা দিয়ে রেখেছি। নাই বা হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান, নাই বা জানলাম তিনি সত্য, নাই বা মানলাম জগত মিথ্যা, যা মিথ্যা তা মিথ্যাই রইল, যা সত্য তা সত্যই রইল। আমার ব্রহ্মজ্ঞানী হবার প্রায়জেন নেই। আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও মুক্ত না হলেও মুক্ত, কারণ আমি নেই, তিনিই আছেন। অথবা আমি, তুমি, তিনি কেউ নেই, কেবল এক "Impersonal It" মাত্র আছে।

এই বে-কায়দার অবস্থা থেকে পার পাবার জন্য জগতের একটা ব্যবহারিক সত্তা বা Pargmatic existence এর Coneept আমদানী করা হয়েছে। কিন্তু তাতেই বা যুক্তির দিক দিয়ে লাভ কি হল। ব্যবহারিক সত্তাটাও মূলত মিথ্যা। মনে করুন জগতটা অনাদিকাল ধরে দীর্ঘায়ত একটা স্বপ্ন, আর রাতের স্বপ্নটা ঐ স্বপ্নের অন্তবর্তী একটা হ্রস্ব স্বপ্ন। এখন রাতের স্বপ্ন থেকে "জাগতিক" স্বপ্নটা সত্তা হিসাবে উচ্চতর আসন পাবে কি জন্য? স্বপ্নটা দীর্ঘতর হলেই কি সত্যতর হয়? বিশেষত পরমার্থ ব্রহ্মসত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহারিক সত্তাটাও যখন মিথ্যা, তখন প্রাতিভাসিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে উনিশ-বিশ করার যুক্তি কোথায়? এই পার্থক্যটাও ত মিথ্যা। এখন তাহলে এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা জীব-গুলোকে মিথ্যা উদ্ধার করার জন্য এই মিথ্যা হস্ত-প্রসারণের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের মুখে শংকর-বেদান্ত আজ পর্য্যন্ত নিরুত্তর। সব চেয়ে বড় কথা, যে বস্তু-জগতের অস্তিত্বের উপর বাস্তব-বিশ্বাস না রাখলে কোন মায়াবাদী বৈদান্তিকের একটি নিমেষও বেঁচে থাকার উপায় নেই, এক পা চলার শক্তি নেই, একটা কথা মুখ দিয়ে বার করার ক্ষমতা নেই, সেই জগতটাকে একটি ব্যবহারিক সত্তার সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলিয়ে রেখে দায় সারার চেষ্টা করলেও দার্শনিক ভণ্ডামির দায় থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় নেই।

তাই বলছিলাম, বিবেকানন্দের শাংকরী মায়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি যেখানে মায়ার ব্যাখ্যা করেছেন সেখানে আরও দশজন সংসার-বিরাগীর মতই—ঈশ্বর সত্য, জগত মায়াময় এইটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। মায়াবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগটা mysticism-এরই একটা অঙ্গ। যে সামাজিক দৃষ্টিতে শ্রমজীবির সাম্যবাদী সমাজবিপ্লবের ন্যায্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতা ধরা পড়েছিল সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সহিত মায়াবাদের কোন সামঞ্জস্য নেই। বিবেকানন্দ আরও এক জায়গায় বলেছেন—"শংকরের বিরাট বুদ্ধি ছিল, কিন্তু বিশাল হৃদয় ছিল না"—("The Sages of India")। একথা যখন তিনি বলেছিলেন তখন মায়াবাদ তাকে বিভ্রান্ত করেনি। তাঁর মতে তিনি যেভাবে মায়ার ধারণা করেছিলেন তা আধ্যাত্মিক রহস্যবাদের প্রতি একটা অলৌকিক বিশ্বাসের সহোদর।

প্রাচীন ঔপনিষদিক যুগের মানবিক গৌরবকে ফিরিয়ে এনে বর্তমানকে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে কিঞ্চিৎ বিপদের সম্ভাবনাও আছে। বিবেকানন্দ Hindu Revivalism-এর মারফত জগতশুদ্ধি ও জাতিশুদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন। এই শুদ্ধি-পদ্ধতিতে প্রাচীনযুগের মানবধর্মী গৌরবদীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার রহস্যঘন অধ্যাত্মবাদের কুজ্ঝটিকাকেও আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার আশংকা থাকে। বিবেকানন্দের মানবধর্মও তাই অধ্যাত্মবাদের কুয়াসা থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

কিন্তু রাজশক্তি, বিত্তশক্তি ও মোহন্ত শক্তি যে চেষ্টাই করুক না কেন, নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের বিবেকবাণী যে বীর সন্ন্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর প্রদীপ্তমূর্তিকে শংকর-বেদান্তের ধূম্রমায়ায় চিরদিন আবৃত রাখা যাবেনা। দেশের মানুষ মানুষ-বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করবে—যে মানুষ উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসন্ধ্যায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'আসন্ন শূদ্রবিপ্লবের পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। সে আসবেই, কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে সে বিপ্লব আজ এসে গেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই দেশের শূদ্র জনসাধারণ ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা ও বৈশ্যের সম্পদশক্তিকে আয়ত্ত করে তাকে অতিক্রম করে চলে গেছে। শূদ্র-বিপ্লবের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরও

যদি মানুষ কোনও রহস্যময় ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে তাই করবে। কিন্তু সে বিপ্লব, সে সমাজতন্ত্র আগে আসুক। এও ত হতে পারে, শোষণহীন পৃথিবীতে সকল মানবিকগুণের অফুরন্ত উন্মেষে চির-ভাস্বর এক ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজই তখন ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করবে। সে সমাজ হিরণ্যগর্ভ; সেই সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ বিরাট পুরুষের জ্যোতিতে বিশ্ব জ্যোতির্ময় হবে। উপনিষদের প্রাচীন প্রজ্ঞামন্ত্র যে ঐক্য ও সমগ্রতার কথা ঘোষণা করেছিল এই পথেই তার চরম সার্থকতা প্রমাণিত হবে। আমাদের ভারতবর্ষেও সেদিন যখন আসবে তখন দেশের মানুষ শ্রদ্ধানম্র কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীকে যিনি প্রচার করতে চাইলেন শংকরবেদান্ত, কিন্তু ঘোষণা করলেন শোষিত মানুষের মর্মবাণী, আহ্বান জানালেন সাম্যবাদী শূদ্র-বিপ্লবকে।

বিবেকানন্দের সমাজচিন্তামূলক উদ্ধৃতিগুলি খুঁজে দেখতে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'Swami Vivekananda—Patriot Prophet' গ্রন্থখানি থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। ডঃ দত্তের গ্রন্থে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর যে পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমি যে পৃষ্ঠা নির্দেশ করেছি তার অসঙ্গতি আছে। কারণ, আমি গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছি।—লেখক

# সত্যাসত্য

## এক

মনীষী বার্ট্র্যাণ্ড রাসেলের একটা মন্তব্য নিয়ে আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করা যাক—

"নিছক দার্শনিক হিসাবে বিচার করতে গেলে মার্ক্সের্ কিছু গুরুতর দুর্বলতা আছে। তিনি বড় বেশী বৈষয়িক, তাঁর সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত। তাঁর দৃষ্টির প্রসার এই পৃথিবীর পর্যন্ত, এই গ্রহ আর মানুষ, এখানেই দর্শনের শেষ। কিন্তু কোপারনিকাসের পর থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা গেছে,—মানুষ এতদিন ধরে নিজের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছিল সেই বিশ্ববিসারী গৌরব আজ সে হারিয়ে ফেলেছে। যিনি এই ঘটনাটির মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি তাঁর পক্ষে নিজের দর্শনকে বিজ্ঞাননির্ভর বলে দাবী করার কোনো অধিকার নেই।"

—( History of Western Philosophy—Karl Marx )

রাসেলের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে অনেকটা এ রকম দাঁড়াবে—যে পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল সূর্যটা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে সে পর্যন্ত এই গ্রহবাসী মানুষের একটা যুক্তিসঙ্গত আত্মগরিমা ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তাকেই প্রদক্ষিণ করছে, সে ছিল বিশ্বের মধ্যমণি। কিন্তু পোল্যাণ্ডের এক পাদ্রীসাহেব কি কাণ্ড করে বসলেন, কলমের ডগায় সূর্যটাকে চেপে ধরে স্থির করে দাঁড় করালেন আর পৃথিবীটাকে ঘুরপাক খাইয়ে দিলেন সূর্যের চারদিকে। সৌরজাগতিক বিশ্বের সম্মানের আসনটি কেড়ে নিল একটা প্রাণহীন অগ্নিপিণ্ড। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডের চারদিকে আমরা আজ উদ্দেশ্যহীন বিরামহীনভাবে ঘুরে মরছি। মানুষ হয়ে মানুষের এমন সর্বনাশ করলেন কোপারনিকাস!

এখন বুঝতে পারছি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি ধূলিকণা মাত্র, লুপ্তগোরব হতবৈভব মানুষগুলি এই ধূলিকণার উপর ভাসমান কয়েক

কোটি আণুবীক্ষণিক জীবাণুমাত্র। এই জীবাণুগুলির ভিতরে অনেকেই নাকি আবার দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক। তারা ভাবছে তাদের দর্শন-বিজ্ঞানের ফরমান নিয়ে কোটি সূর্য তারায় ভরা ব্রহ্মাণ্ডটা ওঠবস করছে। রেলগাড়ীতে উঠে বাচ্চা ছেলে বাবাকে বিরক্ত করছে, গাড়ী চলছে না কেন? বাবা বললেন ধাক্কা দাও, চলবে। বালক সামনের বেঞ্চটাকে ধাক্কা দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছেড়ে দিল। বালক খুশী হয়ে ভাবল তার ধাক্কার জোরেই গাড়ীটা নড়ে উঠে চলতে শুরু করেছে। জগৎটাও তেমনি দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের নীতির জোরে চলছে।

মার্ক্স নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ বিশ্বাস অনেকটা ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পরা-ভক্তির মত। ভক্তের বিশ্বাস মঙ্গলময় ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত মানুষকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবেন। এখন ঈশ্বরের আসনে Dialectics বা দ্বান্দ্বিকপদ্ধতিকে বসান হল। মানুষের কল্যাণ-কামনায় প্রদীপ্ত একটি অপূর্ব সংবেদনশীল হৃদয় ছিল মার্ক্সের, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রখর বুদ্ধিভাস্বর মনীষা। হৃদয় বলে মানুষের মঙ্গল হোক: কিন্তু মঙ্গল হবেই, হতে বাধ্য, এই ধরনের একটা প্রত্যয় বা দৃঢ় ধারণাশক্তি না থাকলে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিরলস-ভাবে কাজ করবার উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই হৃদয়ের আবেগকে দর্শনবিজ্ঞানের যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মার্ক্সও তাই যুক্তি দাঁড় করালেন, দেখাবার চেষ্টা করলেন, জগৎজোড়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সমাজবিবর্তনের মূলেও কাজ করছে। যে পদ্ধতিতে সূর্য-তারা-গ্রহভরা বিশ্বপ্রপঞ্চ চলছে তারই অমোঘশক্তি মানুষকেও এগিয়ে নিয়ে চলেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের দিকে। মহাকাশময় গ্রহ-নক্ষত্রগুলি যেন সবাই উঠে পড়ে লেগেছে মানুষের ভাল করবার জন্য। না হলে আর জড়জগতের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটা চেতন মানুষের সমাজকে এগিয়ে দেবার কাজে হাত লাগাতে এল কেন? এখানে তাহলে দর্শনের যুক্তিটা চলেছে হৃদয়াবেগের পিছনে পিছনে। মানুষের শুভ ইচ্ছাকে ফলবতী করতে হবে; কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত একটি সংবেদনশীল মনীষী মন এই বলে নিঃসংশয় হল যে সমগ্র জগৎটাই চিরকাল ধরে দ্বান্দ্বিক উপায়ে এই পবিত্র কাজ সমাধান করার জন্য সাহায্য করছে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে যিনি নিছক দার্শনিক তাঁর পক্ষে এজাতীয় কল্পনা

অনুমোদন করা অসম্ভব। কারণ, এ হল অভীপ্সা-নির্ভর দর্শন। মানুষের মঙ্গল সম্পর্কে মার্ক্সের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে। সেই ধারণাকে 'সমাজ-বাস্তবে রূপদান করতে হবে। তাই জগতের গতি ও কৃতিকৌশলকে এমন-ভাবে ব্যাখ্যা করা হল যাতে কল্যাণময়ী অভীপ্সা চরিতার্থ হয়। "নিছক দর্শনের" দিক থেকে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয় তাকে এই ভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে,—মহাবিশ্বের একটি ধূলিকণারূপিণী এই পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকা কয়েক কোটি আণুবীক্ষণিক জীব, যাদের নাম মানুষ, যারা মহাকালের তুলনায় মাত্র কয়েকদিন হল পৃথিবীতে এসেছে, তাদের ভাগ্য ফেরাবার জন্য সারাবিশ্বের বিধি-বিধানগুলি কাজ করে যাবে এমন কি দায় পড়েছে। গ্রহনক্ষত্রগুলির এমন কি মাথাব্যথা হয়েছে যে মানুষের ভাল না হলে তাদের স্বস্তি নেই। নিউটন-আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ নীতি মানুষের জন্য সমাজের আসরে নেমে বিপ্লবের কাজে হাত বাড়িয়েছে একথা যেমন একটি স্বচ্ছন্দ কল্পনা মাত্র, তেমনি দুনিয়াজোড়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মানুষের সমাজে প্রতিফলিত হয়ে সমাজটাকে সাম্যবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, এও একটা স্বৈরিণী ধারণামাত্র। এ জাতীয় কল্পনায় সুখ আছে, সাহস বাড়ে, উৎসাহের সৃষ্টি হয়, মানুষের অভীপ্সিত সামাজিক লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। জড়জগতের কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। মানুষ তার নিজের লক্ষ্য জগতের উপর আরোপ করে নিজের সীমিত উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যায়। কিন্তু মানুষ মহাকাশে হাজারবার লক্ষ যোজন পাড়ি জমালেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরে ফেরাই সার। যে কপাল নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সে কপাল নিয়েই তাকে ঘুরতে ফিরতে হবে; আর সূর্যের পোড়া কপাল, চিরকাল নিজের আগুনে নিজেকে পুড়ে মরতে হবে (যদি না একদিন ছাই হয়ে শেষ হয়ে যায়)।

মার্ক্সীয়দর্শন বিশ্ববীক্ষার দাবীদার, কিন্তু মুস্কিল বেঁধেছে মূলঘাটে, বিশ্বের তো নিজস্ব কোন বীক্ষা নেই। তাই মানুষের মননশীল মনে যে বীক্ষণশক্তি স্থান পেয়েছে সেটাই বিশ্ব-বীক্ষা, এমন দাবী করলে মানবকেন্দ্রিক দর্শন পরিতৃপ্ত হতে পারে। কিন্তু এও এক ধরনের আত্মরতিময়ী পরিতৃপ্তি যার ভিতরে লুকিয়ে আছে এক পরম স্পর্ধা—আমিই বিশ্ব। এ যেন অদ্বৈত-বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি, "সোহম্"-বাদের এক নবরূপী সংস্করণ। কিন্তু নিখিল

জগতের কোটি কোটি বছর ধরে এই যে বিরামহীন কালক্ষয়ী কালপরিক্রমা, এর ত কোন লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, মূল্য নেই। তাই জগতের অণুতম ভগ্নাংশ যে মানুষ তারও কোন চরম মূল্য নেই, চূড়ান্ত সার্থকতা নেই। একই কারণে মানুষের কোনো বিশ্ববীক্ষণের ক্ষমতা নেই। তার বিশ্ব-দৃষ্টি আত্মদৃষ্টিরই নামান্তর মাত্র—একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের পক্ষে সুবিপুল সমগ্রতাকে ধারণ করা ও ধারণা করা অসম্ভব।

এত কথা বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন নি। রাসেলের বক্তব্যের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমরা এমন ভাবে উপস্থিত করলাম যাতে "মানবকেন্দ্রিক" মার্ক্সীয় দর্শনের বিরুদ্ধে "বিশুদ্ধ দর্শনের" আপত্তিটা বেশ জোরদার বলে মনে হতে পারে।

## দুই

বিশুদ্ধদর্শনের মতে সত্যাসত্য মানুষের শুভাশুভ-নিরপেক্ষ। একদিন সমুদ্রের নাবিকরা ধ্রুবতারা দেখে দিক্‌নির্ণয় করত। কিন্তু দিশাহারা নাবিককে দিগ্‌দর্শন করাবার জন্য ধ্রুবতারাটা কোন ব্রত গ্রহণ করে আকাশে ওঠেনি। এখন নাবিকের পক্ষে সে নিষ্প্রয়োজন, তাতেও তার কোনো আপশোস নেই। তবু তার অস্তিত্বটা সত্য যা মানুষের ভালমন্দর কোনো তোয়াক্কা রাখে না। এই হল দার্শনিক সত্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য যা মানুষের আপন মনের রঙে রাঙানো নয়, অথচ মানুষ যাকে আপন কাজে লাগালেও লাগাতে পারে।

কিন্তু যে দর্শনের মূল লক্ষ্য মানুষ সেই মানবকেন্দ্রিক দর্শনের শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ওঠার সম্ভাবনা আছে। কারণ এ হল মানুষেরই আত্মদর্শন। তা হলে বহুবিঘোষিত বস্তুবাদ যখন মানবতাবাদে পর্যবসিত হয় তখন দার্শনিক সত্যদৃষ্টি থেকে তার বিচ্যুতি ঘটেছে বলতে হবে।

গ্রীক দর্শনের সোফিস্ট সম্প্রদায়ের পূর্বতম সূরি প্রোটাগোরাস একটি বহুজন-বিদিত প্রবাদের জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন—"যা কিছু আছে আর যা কিছু নেই, কি আছে আর কি নেই, এই সব কিছুরই মাপকাঠি হল মানুষ।" (**Man is the measure of all things, of things, that are that they**

are, and of things that are not that they are not ). পরবর্তীকালে এই উক্তিটির মর্মার্থ একটি বৃহত্তর মানবতাবাদী তাৎপর্যে রূপান্তরিত হয়েছে—"সবার উপরে মানুষ সত্য", এই মহত্তর মানবিক বাণী-ভাবনার সহিত একাত্মতা লাভ করেছে। প্রোটোগোরাসের প্রবাদবাক্যটি যে মহিমময় অর্থে আমরা বর্তমানে ব্যবহার করছি, মূলত হয়ত সে অর্থ তার ছিল না। প্লোটোর সমালোচনায় একথাটির যে অর্থপ্রকাশ পেয়েছে তাকে মানুষের উল্লসিত হবার কোনও কারণ ঘটেনি। "সব কিছুরই মাপকাঠি মানুষ" একথাটির প্লেটো অর্থ করেছেন—যার কাছে যখন যা প্রতিভাত হয়, তার কাছে তখন তাই সত্য। কামলারোগী যখন সাদাকে হলুদ দেখে তখন তার কাছে হলুদ রঙটাই সত্য, যে সাদা দেখে তার কাছে সাদাটাই সত্য। সুতরাং সত্যাসত্য শেষপর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার মাত্র। এর সহজ অর্থ হল, মানুষের দৃষ্টিনিরপেক্ষ নিছক বস্তুগত সত্যাসত্য বলে কিছুই নেই। কাজেই সত্যমিথ্যার স্বগত-পার্থক্য নির্ধারণের ও কোনো উপায় নেই। সক্রেটিসের মুখ দিয়ে প্লেটো এই মতবাদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা শুরু করলেন তার যুক্তিসিদ্ধ নির্দোষ ব্যঙ্গরসটুকুও যথেষ্ট উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

প্লেটোর সক্রেটিস বলছেন—প্রোটাগোরেসের বইখানা খুলেই আমি খুশী হয়েছি, যখন দেখলাম তিনি বলছেন—যার কাছে যা প্রতিভাত হয় তাই সত্য। তবুও আমি একটা কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, প্রোটাগোরাস আর একটু এগিয়ে গিয়ে কেন বললেন না—"সব কিছুরই মাপকাঠি শূয়োর বা বেবুন বা ব্যাঙাচি"। বিদ্রূপটির মর্মার্থ পরিষ্কার। মানুষের কাছে যা প্রতিভাত তা যেমন মানবিক সত্য, ব্যাঙাচির কাছে যা প্রতিভাত তা ব্যাঙাচির সত্য। ব্যাঙাচির চেয়ে মানুষকে বিজ্ঞতর বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। ( Plato—Theaetetus )

এখন মনে করুন, বিশ্বরহস্যের অতল গভীরতা ও অন্তহীন বিপুলতায় অভিভূত হয়ে কোনও বিনয়বিহ্বল দার্শনিক যদি ভাবতে শুরু করেন—হায় মানুষ, তোমার কিসের গৌরব, কিসের গর্ব, অনন্তের তুলনায় তুমি ব্যাঙাচির চেয়ে বড় নও, তাহলে এই ব্যাঙাচি-ভাববিভোর দার্শনিকের ভাবনার তাড়না থেকে আপনি উদ্ধার পাবেন কি করে? উদ্ধার পাবার দুটি রাজপথ

অনেকদিন থেকে তৈরী হয়ে আছে। বিশ্বের রহস্য যেখানে দুর্গম ও দুর্ভেদ্য বলে মনে হবে, সেই গভীর শূন্যময় অন্ধকূপে এক সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা নিত্যভাস্বর পরমেশ্বরকে বসিয়ে দিন, আর ভাবুন তাঁর আলোতে আলোময় এ বিশ্বভুবন—তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। ভাবুকের ভাবনা রবারের মত টানলে বাড়ে। তাই ক্ষমতা থাকলে আরও ভাবুন, ভাবুন তিনিই আছেন, আর কিছু নেই, আরো ভাবুন আপনিই তিনি। এখন আর আপনি "তৃণাদপি সুনীচ" নন। জগতের জয়টীকা আপনার ললাটে। অনন্ত গৌরবে প্রদীপ্ত আপনি বিশ্বের পরম বিস্ময়। এখন জলের মত সব ব্যাখ্যা হয়ে গেল, সকল রহস্যের সমাধান হয়ে গেল, হৃদয়ের সকল গ্রন্থি খুলে গেল, সকল সংশয় কেটে গেল।

কিন্তু আপনি তো এক ভাবনায় সব নিরাময় করে দিলেন। এদিকে সক্রেটিসের শূয়োর, বেবুন আর ব্যাঙাচিগুলিও তো রয়েছে। ওরা কি আপনার মত ভাবতে জানে? ভাবুকের ভাবের ঘরে পরমেশ্বর, আর শূকরের মুখগহ্বরে পঙ্কামৃত, দুয়ের কাছে দুটাই পরম সত্য। মানুষ ও শূয়োর যদি এক সঙ্গে সত্যদৃষ্টির দাবিদার হয়, তবে কোন্ হাকিম রায় দেবার সাহস করবে বলুন। ভাগ্যে শূয়োরের বুদ্ধি নেই তাই কোন দার্শনিকের আদালতে হাজির হয়নি; অথবা তার বুদ্ধি একটু বেশী, বুঝেছে যে মানুষ যখন নিজেই মামলার শরিক তখন তার বিচারের ওপর নির্ভর করা বৃথা, তাই নির্ভাবনায় কাঁদায় গড়াগড়ি দিয়ে কসাইখানায় চলে যাচ্ছে।

কিন্তু শূকর জানে না যে মানুষের মধ্যেও নিরপেক্ষ দার্শনিক আছেন। আপনি যদি ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর শিষ্য হন তবে কিন্তু শূকরের দিকেই সত্যনারায়ণের পাল্লা ভারী হবার সম্ভাবনা আছে। বার্গসঁর মতে মানুষের বিচারবুদ্ধি তার একটা দুর্ভাগ্য; এই বিচারবুদ্ধি বা intellect এর কাছে মানুষের স্বাভাবিক অনুভবশক্তি বা instinct হার মেনে আত্মগোপন করেছে। জগতের মূল সত্য একটা দুরন্ত দুর্নিবার জীবনীশক্তি যার নিরন্তর গতিশীল স্বরূপটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর। বুদ্ধির ধর্মই হল জগৎটাকে খণ্ড খণ্ড করে স্থিরভাবে দেখা। একমুহূর্তও যে থমকে দাঁড়ায় না বুদ্ধি তাকে ধরবে কি করে। তাই মানুষ তার বুদ্ধির দৌলতে জড়জগৎ সৃষ্টি করেছে। যা গতিশীল হলেও মানুষ তার গতিক্ষণগুলোকে ভাগ ভাগ করে

বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়। এই খণ্ড খণ্ড স্থির বস্তুপিণ্ডগুলিই বুদ্ধির একমাত্র পুঁজি। তাই জ্যামিতি বিন্দু সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান অণু পরমাণু সৃষ্টি করেছে। একদিন যে আলোককে শক্তির তরঙ্গ বলে জানতাম তার ভিতরেও বিচ্ছুরিত কণিকা সমষ্টি আবিষ্কার করেছে। আসল কথা গতি-শক্তির একটা আধার না থাকলে মানুষ গতির কল্পনা করতে পারেনা, আর আধারটি যদি অন্তত একটিক্ষণ স্থির না থাকে তবে তাকে আধার বলে চেনা যায়না, কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু বার্গসঁর মতে শক্তির আধার বলে কিছু নেই, গতিশীল বস্তু বলে কিছু নেই। আছে শুধু একটা বস্তুহীন ধাবমান গতিশক্তি যার নাম জীবন। তাই বস্তুপূর্ণ জড়জগৎ বুদ্ধির কল্পনাবিলাস মাত্র। আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল—একথা বলাও বুদ্ধিবিকারের লক্ষণ মাত্র। কারণ ঐ পরিমাপটাও একটা স্থির গাণিতিক সংজ্ঞা। যে সত্য অখণ্ড অপরিমেয় তাকে যত সূক্ষ্ম করে মাপার চেষ্টা করা হবে ততই তাকে খণ্ড খণ্ড করে বুঝতে হবে, আর ততই বুদ্ধি সত্যভ্রষ্ট হবে। গণিতশাস্ত্র শেষ পর্যন্ত পরিমাপের বিজ্ঞান, তাই সে অমেয়কে মাপার স্পর্ধা রাখে, কতকগুলি স্থির সংজ্ঞার দ্বারা অস্থির জীবনকে বাঁধতে চায়।

তাহলে উপায় কি, সত্যকে জানব কি করে? জানা যায় না। অনুভব করা যায়, বুদ্ধির বিকারমুক্ত নির্লিপ্ত স্বাভাবিক অনুভব শক্তির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। মানুষের বিচারবুদ্ধি উপলব্ধিকে কোণঠাসা করে রেখেছে। সেই উপলব্ধিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পিছন দিকে তাকালে দেখা যাবে আমরা এই উপলব্ধির পরম ঐশ্বর্য ফেলে রেখে এসেছি ইতর প্রাণী-জগতের অনুভূতির ভাণ্ডারে। ইতর প্রাণীদের ভিতরে বুদ্ধি ও অনুভূতির ব্যবধান ক্রমশঃ দূর হয়ে গেছে, আর আমরা যত ওপরের দিকে উঠেছি ততই ব্যবধানটা বেড়ে গেছে। উন্মার্গগামী বুদ্ধির যে দৌরাত্ম্য দেখা গেল বানরের মধ্যে, মানুষের মধ্যে এসে তা উৎকটরূপে পরিপূর্ণ হল। উপলব্ধির সঙ্গে বুদ্ধির দূরত্ব এতখানি বেড়ে গেল, এমন সর্বগ্রাসী প্রতাপ নিয়ে বুদ্ধি আবির্ভূত হল যে বেচারা উপলব্ধি মনের অতলগহ্বরে ভয়ে নির্জীব নিঃসার হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু ইতর প্রাণীর বিচারবুদ্ধি দুর্বল, তাই অনুভূতিটাই প্রবল। পিঁপড়া, মৌমাছি বা উঁইপোকার দিকে তাকান, তাক-লাগানো এত সুন্দর

সুন্দর কাজগুলি তারা বিচার বিশ্লেষণ করে করছে না, করছে স্বচ্ছ স্বাভাবিক অনুভব-প্রবণতার ক্ষমতায়, যে ক্ষমতা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রযুক্ত হয় না, অথচ যা জীবনীশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরুদ্দেশে, নির্বিচারে কাজ করে চলে। মানুষের সুপ্ত অনুভূতিকে প্রথমযুগের গৌরবের ভূমিকাটি ফিরিয়ে দিন, তার্কিকের বুদ্ধিকে স্তব্ধ করে রাখুন, সত্যের চির-ভাস্বর গতিময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করুন।

তাই বলেছিলাম, বার্গসঁর শিষ্য হলে শূকরের দিকে সত্যানুভূতির পাল্লা ভারী হবার সম্ভাবনা আছে, কারণ ওর ভিতরে নিছক জীব-সহজাত অনুভূতি ছাড়া আর কোন বুদ্ধির তাড়না কল্পনা করা যায়না। কিন্তু শূকরের কাছে সত্যদৃষ্টি শিখতে বললে মানুষের অপমানিত বোধ করা স্বাভাবিক। অত কদাকার চেহারা, আর অত বদভ্যাস বরদাস্ত করা অসম্ভব। খাবার টেবিলে ভোজনরসিকের প্রীতি জন্মালেও হরিজনের বস্তিতে পঙ্ককেলিনিমগ্ন ওর দৃষ্টি মোটেই মনকে প্রসন্ন করে না। সুতরাং আমরা মৌমাছিকেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলে ধরে নেব, কবি-মানুষের মনও আনন্দিত হবে, এদের নিরলস নিরুদ্দেশ ও নির্বিচার নির্মাণ-কৌশলে দার্শনিক দৃষ্টিও বিমুগ্ধ হবে।

## তিন

কিন্তু সক্রেটিসের শূকর এত সহজে আমাদের ছাড়বে কেন? কথায় বলে শূয়োরের গোঁ! তারপর অতবড় দার্শনিকের কাছ থেকে কিছু বুদ্ধি ধার করে সেও তর্ক জুড়ে দিতে পারে, বলতে পারে,—বার্গসঁ তো বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই বুঝিয়েছেন যে বুদ্ধির দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় নিছক অনুভূতির দ্বারা। তাহলে শেষ পর্যন্ত ঐ হ'ল—মানুষের বুদ্ধিতে যা প্রতিভাত তা মানবিক সত্য, তার কাছে—"Man is the measure of all things।" তবে আমার কাছে "The measure of all things is the pig" (Plato—Theaetetus), এ আমার 'শৌকরিক' সত্য। এখন দার্শনিকের উপায় কি? উপায় বাতলালেন William James, যিনি ব্যবহারবাদ বা Pragmatism-এর প্রধান আচার্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি বললেন,—একদিকে চেতন মানুষের

ধারণা-নিরপেক্ষ একটা বহির্বিশ্ব, আর একদিকে তার ধারণা, এই দুইয়ের ভিতর মিল থাকার নামই সত্য-সত্যের এ জাতীয় সুকঠোর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেই দার্শনিকরা বিপদে পড়েছেন। এই মিলটা কোথাও আছে কি নেই এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, অন্ততঃ মিলটা যে কোথাও আছেই এমন নিশ্চিত কোন প্রমাণ খুঁজে বার করা অসম্ভব। এখানে বিজ্ঞানবাদীদের যুক্তি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সুদৃঢ়। আমার চেতনার বাইরে গিয়ে আমি বাহিরকে জানতে পারি না। অথচ বাহিরকে চেতনার আলোতে স্নান করাবার আগেই তাকে না জানলে তার সঙ্গে চেতনার মিল খুঁজব কেমন করে? মিল খুঁজতে গেলে যার সঙ্গে মিল তাকে আগে জানা চাই, অথচ জানতে গেলে মিল চাই, নৈয়ায়িকের পরিভাষায় এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া মুস্কিল। সুতরাং জেমস্ ঠিক করলেন —জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভিতরে সামঞ্জস্যের নাম সত্য, সত্যের এই সংজ্ঞাটিকে পরিত্যাগ করে নূতন কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা উচিত।

জেম্স্ সত্যের নূতন সংজ্ঞা প্রণয়ন করলেন—"কোনও ধারণার উপর বিশ্বাস রাখা যে পর্যন্ত আমাদের জীবনের পক্ষে লাভজনক, সে পর্য্যন্ত সেই ধারণাটাই সত্য।" "শেষ পর্যন্ত এবং সামগ্রিকভাবে যে ধরণের ধারণা আমাদের সুবিধাজনক তাই সত্য।" "যদি কোনও আপাতসিদ্ধ ধারণা থেকে জীবনের পক্ষে কার্যকর সুফল পাওয়া যায় তবে আমরা তা বর্জন করতে পারি না।" জেমস্ এর ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বরের উদাহরণ টেনে আনলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার যদি ব্যাপকতম অর্থে কোনও সন্তোষজনক কার্য-কারিতা থাকে তাহলে ঈশ্বর সত্য। জেমসের মতে এই কার্যকারিতা আছে, তাই ঈশ্বরের ধারণা সত্য। "আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারি যে এমন একটা উচ্চ পর্যায়ের শক্তি আছে যা আমাদের ধ্যানধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে জগৎটাকে উদ্ধার করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।"

সত্যের এই অভিনব সংজ্ঞায় ইতর প্রাণীদেরও আপত্তির কিছু নেই। আমরা তাদের বুঝিয়ে বলতে পারি—তোমাদের পক্ষেও যা ভাল বা কার্যকর তাই তোমাদের সত্য।

তবু মানুষের ন্যায়শাস্ত্র জেম্‌স্‌-প্রদর্শিত সমাধানের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলবে। প্রথম আপত্তি, সত্যাসত্যের বিচারে আমাদের ধারণার অনুরূপ বহির্জগতে কোন বস্তু বা ঘটনা আছে কি নেই জেম্‌স্‌ এই মূল প্রশ্নটি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। অথবা এ প্রশ্নটিকে তিনি কোনও প্রশ্ন বলেই স্বীকার করেন নি। ঈশ্বর আছে কি নেই সেটা আসল কথা নয়, আসল কথা হল ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলে আমাদের পক্ষে ভালভাবে কাজ উতরে যায় কিনা। যদি দেখা যায় দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে। তাহলেই বিশ্বাসটা সত্য, তিনি থাকুন আর নাই থাকুন। কিন্তু বিশ্বাস না রেখেও যাদের কাজ উতরে যায় তাদের বেলা ঈশ্বরের গতি কি হবে?

আমাদের দেশের মীমাংসা-দর্শনে দুটি প্রধান কথা আছে, বিধি ও অর্থবাদ। বিধি হল অভীষ্ট-সিদ্ধিকর কোন কার্যে নিযুক্ত করার জন্য কোন আদেশ বা উপদেশ (অথবা কোন নির্দিষ্ট কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য)। অর্থবাদ হ'ল অদেশটা মানতে যাতে লোকে অনুপ্রেরিত হয় এমন কোন আনুষঙ্গিক স্তুতি বা কাহিনী। মনে করুন ছোট্ট ছেলে তেতো ওষুধ খেতে রাজী নয়। মা তাড়াতাড়ি পঞ্জিকার পাতা খুলে এক মস্ত পালোয়ান এনে হাজির করলেন, বললেন, দেখ খোকা কি লিখেছে; এই ওষুধ খেয়ে অতবড় পালোয়ান হয়েছে লোকটা। ছেলে পালোয়ানের দিকে তাকিয়ে ওষুধটা খেয়ে ফেলল। জেমসের মতে তা হলে পঞ্জিকার পালোয়ানটা সত্যিই পালোয়ান, কারণ সে ছেলের মায়ের কাজটা ভালমতেই হাসিল করে দিয়েছে। ওষুধের বিজ্ঞাপনদাতাও কিন্তু জেমসের মত পালোয়ানে বিশ্বাস করে না। আমাদের দেশের দার্শনিকরাও অর্থবাদ-বাক্যগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে সত্য বলে মনে করেন না। বিধিবাক্যগুলির প্রামাণ্যের পুচ্ছ ধারণ করেই অর্থবাদ বাক্যগুলি ধার করা প্রামাণ্য লাভ করেছে। চাপরাসীর চাপরাস মূলত মালিকের মহিমাই কীর্তন করে। জেমসের মতে কিন্তু অর্থবাদগুলো খাঁটি সত্য হতে বাধ্য, কারণ ওগুলো কার্যসিদ্ধিকর। আমাদের দেশের এক দিক্‌পাল প্রাচীন দার্শনিক এমন কথা বলেছেন যে স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী অনেক ধার্মিক লোকের মর্মাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ছেলে কাঁদছে, মা বলছেন, কেঁদো না, কাঁদলে বাঘে খাবে, ছেলে ভয়ে ভয়ে কান্না থামিয়ে দিল। পাপ করলে নরকে যেতে হবে, এই নরকবাসটাও ঐ কান্না থামানো বাঘের মত। ওটা

সত্য নয়, কিন্তু দরকারী, কারণ পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে। এ কথাগুলো বলেছেন স্বয়ং ভর্তৃহরি—

"ব্যাঘ্রাদিব্যপদেশেন যথা বালো নিবর্ত্যতে।

অসত্যোঽপি তথা কশ্চিৎ প্রত্যবায়ো বিধীয়তে ॥" ( ভর্তৃহরি—বাক্যপদীয়—দ্বিতীয় কাণ্ড )

ভর্তৃহরি যাকে অসত্য বলে ঘোষণা করলেন, জেমসের মতে কিন্তু তা সত্য, কারণ বাঘের ভয়ে কান্নাটা থামল তো !

জেমসের "সত্য-সংজ্ঞার" বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটাও কম জোরালো নয়। জেম্‌স্‌ সত্যের ধারণাকে একটি নৈতিক ধারণার (ethical concept) সঙ্গে একাকার করে ফেলেছেন। তিনি যে কার্যসিদ্ধির কথা বলেছেন স্বভাবতই তা ইষ্টসিদ্ধি, অনিষ্টসিদ্ধি নয়; মানুষের যাতে মঙ্গল হয়, ভাল হয় তাই সত্য। এখন মনে করুন, পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিটিকে ওলাইচণ্ডী দেবী দয়া করলেন। এখন এই ঘটনাটি কার ইষ্টসিদ্ধি করবে? পরিবারের পক্ষে এ ঘটনাটি ( দার্শনিকমতে ধারণাটি ) মর্মান্তিক সত্য। কিন্তু জেমসের সংজ্ঞানুসারে ঘটনাটি মিথ্যা হতে বাধ্য, কারণ কলেরা রোগটা তো সন্তোষজনক-ভাবে কারুর কার্যসিদ্ধি করছেনা। সুতরাং রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোরও কোন প্রয়োজন নেই, কারণ রোগের ধারণাটাই মিথ্যা। আমাদের দেশের হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষও জেমসের সত্যদর্শনে অনেকটা স্বস্তিবোধ করবেন।

William James-এর সমালোচনা আমরা সাধারণ ভাবেই উপস্থিত করলাম, বিশেষভাবে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়। মার্ক্সবাদের তরফ থেকে সমালোচনা অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু কোনও অ-মার্ক্সীয় বিশুদ্ধ দার্শনিক আপত্তি তুলতে পারেন যে সত্যাসত্য বিচারে জেমসের লেখার ভিতরে অনাবশ্যক ও দুর্ভাগ্যজনক কতগুলি শব্দ স্থান পেয়েছে—যেমন, practical cash-value, payments, that which pays ইত্যাদি, এবং এই শব্দগুলি দেখেই মার্ক্সবাদীরা বিভ্রান্ত হয়ে জেমসের দর্শনের সঙ্গে মার্কিনীপুঁজিবাদের একটা সঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন।

অবশ্য জেমসের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী Dr. Dewey-র মতবাদকে যিনি মার্কিনী শিল্পসভ্যতার সাগরেদ বলে বর্ণনা করেছেন তিনি মোটেই মার্ক্সবাদী নন, তিনি হলেন স্বয়ং বার্ট্রাণ্ড রাসেল। রাসেলের মন্তব্যের বিরুদ্ধে Dewey-র পাল্টা মন্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য—"মার্কিনী শিল্পসভ্যতার ন্যক্কারজনক বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে pragmatic মতবাদের একটা সম্পর্ক স্থাপন করা রাসেলের একটা সুনিশ্চিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, আমি যদি তাঁর দার্শনিক মতের সঙ্গে বিলাতী অভিজাত জমিদারশ্রেণীর স্বার্থের কোনও সম্পর্ক খুঁজতে যাই তবে তাও তেমনি অদ্ভুত শোনাবে নাকি"? রাসেল প্রত্যুত্তরে বললেন,—"ব্রিটিশ অভিজাতশ্রেণীর সহিত সম্পর্কের প্রভাবে আমার মতামত গড়ে উঠেছে, এ রকমের ব্যাখ্যা শুনতে আমি অভ্যস্ত, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের কাছ থেকে। তবু একথা মেনে নিতে আমার মোটেই অনিচ্ছা নেই যে আমার মতামত অন্য সকলের মতামতের মতই সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত।"

Dewey-র মতে পারিপার্শ্বিকের সাথে সামঞ্জস্য-বিধান বা খাপ খাইয়ে নেবার জন্য জীবশরীরের যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা তারই নাম সত্যানুসন্ধান। কাজেই সত্য এবং অনুসন্ধান দুটি পৃথক ব্যাপার নয়, সমগ্র অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটিই গতিশীল সত্য। প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করা থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ সব সময়ই এই সামঞ্জস্য-বিধানের অবিরাম চেষ্টা করছে। প্রতিকূল পরিবেশ নিরন্তর সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ নিজকে পরিবেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকেও নিজের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। ফলে পুরাতন ধারণার জায়গায় নূতন ধারণার আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচীন যাদুবিদ্যার প্রতিজ্ঞা-বাক্যগুলির স্থান গ্রহণ করেছে আধুনিক বিজ্ঞানের সুপরীক্ষিত প্রতিজ্ঞাসমূহ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানুষের সমস্যার শেষ সমাধান বলে কোন কথা নেই। নিত্য নূতন পারিপার্শ্বিকে সঙ্গে নূতন সামঞ্জস্য-বিধানের সমস্যা তাকে কোনদিনই রেহাই দেবে না। কাজেই জীবক্রমাগত গতিশীল সত্যের প্রলম্বিত প্রক্রিয়াটিও বীর হনুমানের দেহের মত ক্রমশঃ লম্বা হয়ে চলবে।

'গতিশীল' কথাটা আজকাল খুবই জনপ্রিয় সন্দেহ নেই। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রনায়করাও জনমানসে নিজেদের স্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য যত্রতত্র বক্তৃতায় কয়েকবার 'গতি'-শব্দটি ছড়িয়ে রাখেন। হয়তো দুর্গতিটাও একরকমের গতি। চিন্তানায়ক Dewey সাহেব সত্যের যে গতিময় রূপটি আবিষ্কার করলেন তার ভিতরেও দুর্গতির দুর্ভোগটা নেহাত কম নয়। একটি বহুপ্রচলিত গল্প অনেকেরই জানা আছে। বর্ষার দিনে ছাত্র স্কুলে আসতে দেরি করেছে। মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—দেরি হ'ল কেন? ছাত্র বললে—কি পিছল পথ, এক পা এগোই তো দুপা পিছিয়ে যাই। মাষ্টারমশাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তবে স্কুলে এসে পৌঁছলে কি করে? চতুর ছাত্র বলল, মুখ ঘুরিয়ে বাড়ীর দিকে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে স্কুলে এসে পৌঁছলাম। ছাত্রটির গণিতের জ্ঞান যেমন নির্ভুল, Dewey প্রণীত সত্যের সংজ্ঞাও তেমনি নির্ভেজাল। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জীবশরীরের অবিরাম প্রচেষ্টাকেই যদি সত্যের সংজ্ঞা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে, প্রচেষ্টা যখন সার্থক হল তখন পূর্বকৃত ধারণাটি সত্যে পরিণত হল, অর্থাৎ সত্যের প্রক্রিয়ার সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটল। এইভাবে সত্যে পরিণত হওয়া মানেই সত্য প্রমাণিত হওয়া। সত্যরূপে পরিণতিই হল সত্যের প্রমাণ। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, আগ থেকেই একটা কিছু সত্য ছিল যাকে এখন আমরা প্রমাণের ভিতর দিয়ে জানলাম। সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার আগে সত্যমিথ্যা কিছুই ছিল না। এই প্রচেষ্টার প্রারম্ভই হল সত্যের সূতিকাগার।

জেমস্ সত্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন তার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে Dewey যে তত্ত্ব আমদানী করলেন তাতে জেমসের মূলনীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না। যা আখেরে সন্তোষজনক-ভাবে কার্যকর তাই সত্য—**Truth is that which is useful in the long run,** এই সংজ্ঞাটির সহজবোধ্য রূপটিকে একটি সুগম্ভীর শব্দসম্ভারে ঢেকে দিয়ে মূলত ঐ একই অর্থে তিনি একটি নতুন সংজ্ঞার আমদানী করলেন। জেমসের ভাষার অপূর্ব প্রসাদগুণ এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য সযত্নে বর্জন করে **Dr. Dewey** সত্যের এক পালোয়ানী সংজ্ঞা দিলেন—**Warranted Assertibility,** যার এক কথায় বাংলা তর্জন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু পালোয়ানী

দর্শনকেও কায়দা করে জল করে দেয়ার কৌশল বোধ হয় রাসেলের মত আর কারুর জানা নেই, তাই আমরা তারই শরণাপন্ন হলাম। কোন নির্দিষ্ট ধারণার অনুরূপ একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞাবাক্যের নাম দেওয়া যাক assertion। ধরুন "শীতলা পূজা দিলে বসন্ত রোগ হয় না" একটি প্রতিজ্ঞা-বাক্য। এখন এই প্রতিজ্ঞাবিধৃত ধারণা অনুসারে কাজ করলে যদি সুফল পাওয়া যায় তবে প্রতিজ্ঞা বা ধারণাটি সত্য। তাহলে অভীষ্টসাধনার দ্বারা কোন ধারণা যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় অর্থাৎ warranted হয়, জেমসের সহজ-ভাষায় ইষ্টসিদ্ধির দ্বারা ধারণাটির উপযোগিতা যদি প্রমাণিত হয়, তখন ঐ ধারণার অনুরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যটিও সত্য বলে প্রমাণিত হল। সুতরাং সত্য মানে "warranted assertibility"। এখন এই গম্ভীর সংজ্ঞাটির একটি গম্ভীর ব্যাখ্যা করে বলা যাক—সত্য মানে একটা স্থিরনিশ্চয় নয়। সত্য হল একটা কার্যকরী প্রক্রিয়া—ইষ্টসিদ্ধিমূলক ব্যবহারিক কার্য দ্বারা কোন প্রতিজ্ঞাবাক্য উপযোগী বলে বিবেচিত হওয়ার এই যে প্রক্রিয়া এরই নাম সত্য। সঙ্গে সঙ্গে সহজকে কঠিন করে বলার একটা পণ্ডিতী প্রক্রিয়ার নিদর্শনও আপনারা পেলেন। আবার দেখুন, বহুবর্ষের অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেল শীতলা পূজা দিয়ে বসন্ত রোগ ঠেকানো যায় না। সমস্যাবিব্রত মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বসন্তের টীকা আবিষ্কার করল। এই সার্থক প্রতিষেধক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাহিকা প্রক্রিয়াটিও অনেক দূর এগিয়ে গেল। "শীতলা পূজা বসন্তের প্রতিষেধক" এই মূল প্রতিজ্ঞাবাক্যটির জায়গায় একটি নতুন প্রতিজ্ঞা বাক্য আমদানী হল—"টীকা বসন্তের প্রতিষেধক।" সত্যকে এভাবে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে চিন্তা করলে মূল প্রতিজ্ঞাটিকেও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কারণ শীতলা পূজার ভিতর দিয়ে যে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাই বর্তমানে বসন্তের টীকা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। আরও কতদূরে এগিয়ে যাবে সে কথা এখনই বলা যায় না।

প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা শুরু করার আগে মানুষকে নিশ্চয়ই প্রতিকূল প্রকৃতির কোলে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তা হলে কোন মনুষ্য-প্রাণী জন্মাবার আগে যে পৃথিবীটা ছিল সে পৃথিবীটা সত্য না মিথ্যা? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য

কোনও জীবই পৃথিবীতে ছিল না; যখন জীব এসেছে তখনও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে বা নিজের সম্পর্কে ধারণা করার মত কোন মানুষই ছিল না। সুতরং সামঞ্জস্য-বিধানের সমস্যাই যখন ছিল না সেই প্রাগ্‌জৈবিক বা প্রাগ্‌মানবিক পৃথিবীটা Deweyর মতে সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। তবে কি সে অদ্বৈত-বেদান্তের মায়া? সত্য না হলে মানুষ জন্মাল কোথায়? যদি বলা যায় প্রাগ্‌জৈবিক পৃথিবীটা বর্তমানে সত্যে পরিণত হয়েছে, তা হলে বলতে হবে মানুষ যেদিন প্রথম পৃথিবীতে জন্মেছিল সেদিন সে সত্যই জন্মায় নি, আজই সে জন্মেছে। ব্যাপারটা তবে খুবই অদ্ভুত দাঁড়াবে। সূর্য থেকে যে জলন্ত খাবলাটা ছিটকে গিয়ে পৃথিবীটা জন্মেছিল, সেদিনের ঘটনাটাও তা হলে আজই সত্যে পরিণত হয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে Deweyর "গতিশীল" সত্যের সংজ্ঞাটি অশেষ দুর্গতি ডেকে এনেছে। মানুষের ধারণা ও প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষ কোন বস্তু বা ঘটনা সত্যিই আছে, এই জাতীয় একটা ধারণাকে আগে থেকেই সত্য বলে মেনে না নিলে আমাদের সকল ধারণা ও প্রচেষ্টা মহাশূন্যে প্রলম্বিত এক অনাদি ত্রিশঙ্কুর মত চিরদিন ধরে ঝুলতে থাকবে। পারিপার্শ্বিক বলে একটা কিছু আছে, জীবশরীর ও তার ধারণা বলে একটা কিছু আছে এমন একটা সুনিশ্চিত নিঃসন্দিগ্ধ ধারণা আগে থেকে না থাকলে পারিপার্শ্বিকের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা শুরু হয় কি করে? বলা যেতে পারে ঐ মূল ধারণাটা বুদ্ধিদীপ্ত নৈয়ায়িকের ধারণা নয়। ওটা জীব-সহজাত শারীরিক ধর্মেরই একটা অংশ। তা হলেও অন্ততঃ জীবশরীরের অস্তিত্বটা অনপনেয় সত্য বলে স্বীকৃতি পাওয়া প্রয়োজন, যে স্বীকৃতি কোনও পরবর্তী প্রক্রিয়ার পরিণতি নয়, কিন্তু সকল প্রক্রিয়ার স্ব-প্রমাণ পূর্বশর্ত। এর অর্থ হল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মানবিক ধারণা ও প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষ একটা স্বাধীন বস্তুজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়াও সমানে চলে এসেছে, একজাতীয় একটি প্রতিজ্ঞাকে পূর্বনির্ধারিত সত্য বলে মেনে নিতে হবে। অথচ একথা মেনে নিলে Deweyর সত্যস্বরূপের সংজ্ঞাটিকে আমূল সংস্কার করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। গাড়ীতে চড়ে মানুষ যখন গতিশীল হয় তখন গাড়িটা চলছে বলেই মানুষ চলে। মানুষ চলছে বলে গাড়ি চলেনা। Deweyর যুক্তিতে কিন্তু ব্যাপারটা

উল্টাই হওয়া উচিত। মানুষের মহাকাশ যাত্রা সম্ভব হয়েছে বলেই মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটি সত্য নয়, সূত্রটি সত্য বলেই মহাকাশযাত্রা সম্ভব হয়েছে। Deweyর সংজ্ঞানুসারে কিন্তু প্রথম কথাটিই ঠিক, দ্বিতীয়টি নয়। তিনি যদি একথা বলতে পারতেন যে সফল মহাকাশযাত্রার দ্বারা মানুষের গণিত-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাগুলি সত্য (বা মিথ্যা) বলে **প্রমাণিত** হল, তা হলে কোন গোলমাল ছিল না; গোলমাল বাঁধে তখনই যখন বলা হয় যে প্রতিজ্ঞাগুলি এখন সত্যে **পরিণত** হল। এমতে সত্যের অস্তিত্বটাই নির্ভর করছে সফল পরিণতিব উপর। কিন্তু বস্তুবাদী মতে সফল পরিণতি নির্ভর করছে সত্যের উপর। যখন বলা হয় বিজ্ঞানের নীতিগুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ তখন এর অর্থ এই নয় যে, যে পর্যন্ত সার্থক ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ না হল সে পর্যন্ত নীতিগুলি সত্য নয়। তাহলে তো বুঝতে হবে, নিউটনের আগে পর্যন্ত বিশ্বসংসার মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মেনে চলেনি, অথবা কোপারনিকাসের আগে পর্যন্ত সত্যিই পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেনি। "প্রমাণ-সাপেক্ষ" কথাটির অর্থ হল প্রমাণের দ্বারা আমরা সত্যকে জানতে পারি, নিঃসংশয় হতে পারি, কিন্তু সত্যের অস্তিত্বটা আমাদের প্রমাণ করতে পারা না পারার উপর নির্ভর করছে না। এজন্যেই আমরা বলেছিলাম, Deweyর সত্যনিরূপণের প্রচেষ্টা স্কুলের ছেলের বাড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে "পিছন টানে" স্কুলে এসে পৌঁছার মত। যেদিকে তিনি চলার চেষ্টা করলেন এসে পৌঁছালেন ঠিক তার উল্টাদিকে। কার্যের দ্বারা কারণকে জানতে গিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে কার্যের দ্বারাই কারণ উৎপন্ন হয়; ব্যবহারের দ্বারা সত্যকে জানতে গিয়ে সিদ্ধান্ত করে বসলেন ব্যবহারের দ্বারাই সত্য তৈরী হয়।

Pragmatism বা ব্যবহারবাদের সাথে বস্তুবাদের এই দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও অনেক বিদগ্ধজন মার্কসীয় বস্তুবাদকে ব্যবহারবাদের সগোত্র বলে ঘোষণা করেছেন। অনেকে আবার Pragmatism-এর ভিতরেও প্রগতির সন্ধান পেয়েছেন। এই বিভ্রান্তির কারণ বোধ হয় এই যে Pragmatism ও মার্কসবাদ উভয়েই সত্যাসত্য বিচারে ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। সত্যের মার্কসবাদ-সম্মত সংজ্ঞা পরীক্ষা করার সময় আমরা এবিষয়ে আলোচনা করব।

## পাঁচ

সত্যাসত্য নির্ধারণে পরিশ্রান্ত দার্শনিকদের কাছে সমস্যা সমাধানের দুটি চিরপরিচিত রাজপথ খোলা আছে একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মানুষের অজ্ঞতার বিরাট ফাঁকটাকে ততোধিক বিরাট এক পরমেশ্বর দিয়ে ভর্তি করা যেতে পারে। সেই পরমসত্যের লীলা-ললিত প্রকাশভঙ্গী এই বিশ্ব, এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই সান্ত্বনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার মত দার্শনিকের অভাব নেই। ঈশ্বরকেও যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গ্রীসের এরিস্টোটল থেকে আরম্ভ করে আমাদের দেশের সর্বশেষ নৈয়ায়িক-চূড়ামণি পর্যন্ত যুক্তিটা একই ধরণের। এরিস্টোটল বললেন, পালঙ্ক তৈরী করতে মিস্ত্রী চাই; নৈয়ায়িক বললেন, ঘট তৈরী করতে কুমোর চাই। কোনও বস্তু তৈরী করতে হলে তার উপযোগী উপদানগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে কাজটা করার জন্য একজন অন্ততঃ কর্তা চাই। এমন চমৎকার বিধিনিয়মে আবদ্ধ সাজানোগুছানো এই ব্রহ্মাণ্ডটার পিছনেও একজন কর্তা থাকা প্রয়োজন। না হলে এই বিরাট ব্যাপারটা করল কে? কিন্তু তিনি তো আর কামার কুমোরের মত সীমিতশক্তি স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তি হতে পারেন না। তাঁকে অমিতশক্তি সর্বজ্ঞ হতে হবে। এই সর্বজ্ঞপুরুষের নাম দেওয়া হল ঈশ্বর। কিন্তু এতেও ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা নিরঙ্কুশ হল না। গোলমাল বেঁধেছে অনুমানের মূলনীতি নিয়ে। ঘট তৈরী করেন কুম্ভকার, সুতরাং জগত তৈরী করেন ঈশ্বর, একথা বললেই চলবে না। এ যুক্তির পিছনে একটা সাধারণ নিয়ম আছে, যাকে একটা ব্যাপক মূলসূত্র হিসাবে দাঁড় করানো প্রয়োজন, যেমন, "যা কিছু কার্য বলে প্রতিভাত হয় তার পিছনে একজন কর্তা আছেন।" এই মূল সূত্রটিকে দাঁড় করাতে না পারলে ঈশ্বরকেও দাঁড় করানো অসম্ভব। প্রশ্ন হল, ঘট-পটের কর্তা কুম্ভকার-তন্তুবায়কে দেখেই সকল কার্যেরই একজন কর্তা আছে এতখানি কল্পনা করার মত এতবড় একটা উল্লম্ফন দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? তাহলে সব জায়গাতেই লাফটা দিয়ে দেখুন না? মনে করুন আপনি এক লম্ফবীরের সঙ্গে চলেছেন। পথে একটা খাল পড়েছে, বীরবর একলাফে পার হয়ে গেল, আপনার দেহটি দুর্বল, কিন্তু অনুমানি-

শক্তিটি প্রবল ; আপনি লম্ফবীরের উদাহরণ থেকে একটা নৈয়ায়িকসুলভ মানসিক লাফ দিয়ে একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে ফেললেন,—এইমাত্র যে খাল পার হল সে মানুষ, তা হলে "মানুষে এই খাল পার হতে পারে।" এই সূত্রটি পাবার পরই—"আমিও মানুষ, সুতরাং আমিও পার হতে পারি," এই আপনার সিদ্ধান্ত। এখন তা হলে লাফটা দিয়ে দেখুন, মজাটা কি হয়। তখন আপনাকে বলতে হবে,—ঐ রকমের বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন মানুষই খালটা পার হতে পারে,—আপনার সাধারণ নীতিসূত্রে মানুষের ঐ উপাধিটা বাদ দিয়েছিলেন বলেই আপনি এখন জলে পড়েছেন।

এখন তাহলে "কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে" এই সাধারণ সূত্রটিরও একটু সংকোচ সাধন করা প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের বহুযুগব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে কোনটা প্রাকৃতিক জিনিস আর কোনটা কৃত্রিম অর্থাৎ কোনও প্রাণী বা মানুষের তৈরী, এবিষয়ে একটা ধারণা হয়েছে, যার ফলে চেয়ার টেবিল দেখামাত্র বলতে পারা যায় যে কোনও মিস্ত্রী এগুলি তৈরী করেছে। তাই চোয়ারটা ভেঙ্গে গেলে আমরা মিস্ত্রী ডেকে মেরামত করাই, পরমেশ্বরকে ডাকি না। সুতরাং কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে এই সাধারণ সূত্রটির সংস্কার সাধন করে এ রকমভাবে দাঁড় করানো যেতে পারে—"যেসব জিনিসের ভিতরে প্রাকৃতিক বিধিবিধানের অতিরিক্ত বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করার ছাপ আছে তার কোন না কোন কর্তা আছে।" তাই বনের গাছটা যখন তক্তা ও টেবিল হয়ে গেল তখন আমরা সূত্রধরের কৃতিত্ব অনুমান করি। এর দ্বারা প্রাকৃতিক গাছপালা পাহাড়-পর্বত গ্রহ-নক্ষত্রেরও এক অতিমানব কর্তা আছে—এ জাতীয় অনুমান অযৌক্তিক। এই অতি প্রলম্বিত অনুমানটি শক্তিহীন অবিবেকী বামন ব্যক্তিটির অমূলক লম্ফ প্রদানেরই সামিল। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারে "কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে" এই "ব্যাপ্তি" বা সাধারণ সূত্রটি "ব্যভিচারী।" কুম্ভকার, সূত্রধর বা তন্তুবায়ের মত সূর্য চন্দ্র তারা ও সসাগরা পৃথিবীর কোনও কর্তা কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। কাজেই কাপড়খানা দেখে বর্তমানে সামনে অনুপস্থিত কোন কারিগর বা তাঁতীর কৃতিত্ব অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে, এই কাপড়ের দৃষ্টান্ত টেনে পৃথিবীর পিছনে ঈশ্বরের কৃতিত্ব অনুমান করা যায় না।

ঈশ্বরবিশ্বাসী তার্কিক তুমুল আপত্তি তুলবেন। বলবেন—এ কেমন কথা! অনুমান মানেই হল যা দেখা যায় তার ভিত্তিতে যা দেখছি না, তার অনুসন্ধান করা। জগৎ সংসারের কোন কর্তার অস্তিত্বই তো অনুসন্ধান করছি। আর তুমি বলছ—তাঁকে দেখা যাচ্ছে না তাই আমার মুলসূত্রটিই ভুল। এখন যদি তাঁকে দেখাই যেত তা হলে আর অনুমানের দরকারটা কি? প্রত্যক্ষ পাচ্ছিনা বলেই তো অনুমান করছি। তোমার কাপড় কেনার সময় তাঁতীকেও সঙ্গে কিনে নিয়ে আসছ না তো? তুমি যেমন বর্তমানে অপ্রত্যক্ষ তাঁতীর অনুমান করছ আমি তেমনি বর্তমানে অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অনুমান করছি। যে বিষয়ে আমি অপ্রত্যক্ষ কর্তার অনুমান করছি সেই বিষয়টি দেখিয়েই বলা চলে না—"কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে" এই সূত্রটি ভুল। তা হলে "কাপড় মাত্রেই তাঁতীর তৈরী" এই সূত্রটিও ভুল বলতে পারি। তোমার কাপড়খানা দেখিয়ে বলব এ কাপড়ের তো তাঁতী দেখছি না। তখন নিশ্চয়ই প্রত্যুত্তরে বলা হবে, এই কাপড়ের বেলাই তো আমি তন্তুবায়ের কৃতিত্ব অনুমান করছি। কাজেই এরই নজির দেখিয়ে "কাপড় মাত্রেই তাঁতীর তৈরী" এই সূত্রটি ভুল বলা যাবে কি করে? তা হলে আমার ঈশ্বরের বেলাও ঐ একই কথা খাটবে।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী তার্কিকের এ যুক্তি মেনে নিলে কিন্তু অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। তা হলে কোনও অনুমানকেই আর ব্যভিচারী বলা চলবে না। জগৎটা ঈশ্বর আর শয়তান দুয়ে মিলে তৈরী করেছে এরকম অনুমানও করা যেতে পারে। জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুই-ই যখন আছে তখন স্রষ্টার ভিতরে সুবুদ্ধি আর কুবুদ্ধি দুই-ই থাকতে হবে। ঈশ্বর যদি শুধু মঙ্গলময়ই হন, তবে অমঙ্গলকারী এক শয়তানও থাকতে হবে। এই দুয়ে মিলে অনেকক্ষণ পাঞ্জা লড়ার পর বোধহয় একটা আপোস-রফা হল; কিছু মঙ্গল আর কিছু অমঙ্গল মিশিয়ে জগৎ সৃষ্টি করা হল। এখন আরও কল্পনা করা যাক ঈশ্বর ও শয়তান পালা করে রাজত্ব চালাচ্ছেন। যখন ঈশ্বর রাজা তখন মঙ্গলের দিকটাই ভার হয়। যখন শয়তান রাজা তখন অমঙ্গলের দিকটাই প্রবল হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী তার্কিক যে যুক্তি দিলেন তাকে ন্যায়ের পারিভাষিক সূত্রে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—"পক্ষে সাধ্যের অদর্শন দেখিয়ে কেউ অনুমানকে ব্যভিচারী বলতে পারে না।" "ঘট

মাত্রেই কুম্ভকারের সৃষ্টি” এই সাধারণ সূত্র গ্রহণ করার পর, যখন একটা ঘট দেখছি, কিন্তু কুম্ভকারকে দেখছি না, তখন এ ঘটটিও কোন কুম্ভকার কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে বলে অনুমান করছি। এ অনুমান নির্ভুল। এখানে ন্যায়ের পরিভাষায় এই বিশেষ ঘটটিকে বলা হয় “পক্ষ”, এবং “কুম্ভকার কর্তৃক সৃষ্ট” এই অনুমেয় বিষয়কে বলা হয় “সাধ্য”। এখন একথা বলা চলবে না,—এই ঘটটির বেলা কুম্ভকারকে দেখছি না, সুতরাং “ঘট মাত্রেই কুম্ভকারের সৃষ্টি” এই সাধারণ সূত্রটি ভুল।

কথাটা ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হল কি জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে কত বড় সাধারণ সূত্রে আপনি যেতে পারেন, তার একটা সীমা থাকা দরকার। আপনার খুশিমত কোন একটা পক্ষ স্থির করে একটা অতি ব্যাপক সাধারণ সূত্রে যাবার অধিকার আপনার আছে কিনা? ঘটের কর্তা কুম্ভকারকে দেখে জগতেরও একজন কর্তা সাব্যস্ত করা আপনার প্রয়োজন পড়েছে; তাই ঘটের দৃষ্টান্ত থেকে কার্যমাত্রেরই কর্তা আছে এরকম একটা সর্বব্যাপক সাধারণ সূত্রে যাওয়ার আপনার অধিকার আছে কিনা? সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য ধর্মকীর্তি ঠিক এই মৌলিক প্রশ্নটিই তুলে ধরেছেন। তিনি বললেন এ জাতীয় কোন সীমা না মানলে অনেক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে যেতেও আমাদের বাধা থাকবে না। ধর্মকীর্তি একটি উদাহরণ দিলেন যার ব্যঙ্গ-রসটুকুই শুধু উপভোগ্য নয়, মৌলিক প্রশ্নের দিক থেকে যার তাৎপর্যটিও খুবই গভীর। ধরুন, মাটি দিয়ে তৈরী ঘটটার সৃষ্টিকর্তা কুম্ভকার—এই দৃষ্টান্ত থেকে কেউ একটা সাধারণ সূত্র বা ব্যাপ্তি ঠিক করে ফেলল। “যা মাটি দিয়ে তৈরী তাই কুমোরের কাজ” তারপরে একটা উঁইয়ের ঢিবি দেখেই,—“এই ঢিবিটাও মাটির তৈয়ী, সুতরাং এটিও কুমোরের কাজ” এই বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল। এখন এই অনুমানকে আপনি ঠেকাবেন কি করে? যদি বলা হয় উঁই-ঢিবির পিছনে কুমোরের কর্তৃত্ব দেখা যায় না বলে “যা মাটি দিয়ে তৈরী তাই কুমোরের কাজ” এই সাধারণ সূত্রটি ভুল; তবে জগৎসংসারের পিছনে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব দেখা যায় না বলেই “কার্য মাত্রেরই কর্তা আছে” এই সাধারণ সূত্রটিও ভুল। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যার ফলে গৃহিণীর নিত্য নূতন গঞ্জনা থেকে আপনি রেহাই পাবেন না। মনে করুন দশদিন, দশটা

পকেট মেরে কোন পকেটমার একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে ফেলল—"পকেট কাটলেই টাকা পাওয়া যায়", আর আপনার গৃহিণীও জানেন—পকেটমার পকেট কাটে টাকা পায় বলেই। একদিন আপনি কাটা পকেট নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। আপনি জানেন বেচারা পকেটমার বেয়াকুব হয়ে সেদিন আপনার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছে। কিন্তু আপনার গৃহিণী ও পকেটমার একই সাধারণ সূত্রে বিশ্বাসী। আপনি পকেটমারের দুর্গতি ভেবে আনন্দে ঘরে ফিরছেন—জানেন না আপনার কপালে কি দুর্গতি আছে। কাটা পকেট দেখে ভীতিকাতরা গৃহিণীকে আপনি বুঝাবেন কি করে যে আপনার টাকা মারা যায়নি। নিশ্চয় মারা গেছে, না হলে পকেটমার পকেট কেটেছে কেন? পরদিন আপনার অফিসের পথ-খরচা ও টিফিন বাবদ পকেটের বরাদ্দ চার আনায় নেমে দাঁড়াল। গৃহিণী আপনার বুদ্ধিমতী, যদিও তাঁর সেদিনের অনুমানটি আপনার মতে মিথ্যা। কিন্তু কেন মিথ্যা হবে? পকেটে টাকা দেখা না গেলেও কোন অদৃশ্য টাকা নিশ্চয়ই ছিল। "পক্ষ"রূপী পকেটে "সাধ্য"রূপী টাকার দেখা পাওয়া না গেলেই কি অনুমান ভুল হবে? যার পকেট কাটা গেছে তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী তার্কিক হলে গৃহিণীর এই তর্কের জবাব দিতে হিমসিম খাবেন।

আবার দেখুন—কেউ যদি এ জাতীয় অনুমান করেন—বড় বড় কাজ করতে অনেক কারিগর দরকার হয়, যেমন দালান বাড়ি নগরী তৈরী করতে অনেক মিস্ত্রী প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত একটা বিরাট ব্যাপার ঘটাতে অন্তত কয়েক কোটি ক্ষুদে ঈশ্বরের দরকার হয়েছে। এক ঈশ্বর কল্পনা করলে আপনার কল্পনার লাঘব হলেও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির গৌরবটা তাঁর প্রাপ্য নয়।

আবার ধরুন, কেউ বললেন—বিচিত্র রচনাময় দালান কোঠা ঘর বাড়ি আমাদের মত মানুষের তৈরী, সুতরাং বিচিত্র জগৎটাও আমাদের মত আরো অনেক মানুষ মিলে তৈরী করেছে।

যদি বলা হয় বিপুল বিশ্ব মানুষের পক্ষে তৈরী করা সম্ভব নয়, তা হলে উল্টা অনুমান করাটা আরও সহজ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কোন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেনি, কারণ মানুষের পক্ষে এ সৃষ্টি সম্ভব নয়, এবং আমাদের সামগ্রিক

অভিজ্ঞতায় মানুষ ছাড়া কোনও স্রষ্টাও আর চোখে পড়েনি (অবশ্য মৌমাছি বোলতা ইত্যাদি কিছু কীট পতঙ্গ ছাড়া)।

এভাবে পরমসত্যের চরম বিশ্রান্তি হিসাবে পরমেশ্বরকে মেনে নিয়ে সত্যানুসন্ধানী নিষ্কণ্টক হতে পারেন না। পদে পদে তিনি তর্কের জালে জড়িয়ে পড়বেন। আমাদের দেশের বৈষ্ণব দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ তার্কিক মাধ্ববৈদান্তিকরাও শেষ পর্যন্ত নৈয়ায়িকদের ঈশ্বরানুমানে ঘোরতর আপত্তি তুলেছেন। নব্যন্যায়ের জনক গঙ্গেশোপাধ্যায়ের ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করে ব্যাসতীর্থ সিদ্ধান্ত করলেন—আনুমানিক যুক্তিতর্কের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের উপরেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

কিন্তু অবিশ্বাসীর গতি নরক হলেও ইহালোকে ঈশ্বরের গতি খুব নিষ্কণ্টক হল না। তাই একদল দার্শনিক সত্যাসত্যনির্ণয়ের দ্বিতীয় রাজপথটি বেছে নিলেন—এটিকে এক জাতীয় শূন্যমার্গ বলা যেতে পারে। তারা বললেন—শেষ পর্যন্ত আমরা এই নির্ণয় করলাম,—কিছুই নির্ণয় করার উপায় নেই। কিছুই জানা যায় না—এই হল সার সত্য। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার চপলমুহূর্তগুলি মিছিল করে চলেছে, ঐ চপল মুহূর্তগুলি সম্পর্কেই একমাত্র আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে কোন বস্তুসত্তা আছে কি নেই, বস্তুজগতের কোনও ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে উদ্বোধিত করছে কিনা, সে কথা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। একথাগুলি যিনি বলছেন তিনি নেই, কথাগুলোও নেই, কোন শ্রোতা নেই, পাঠক নেই, কথায় ঠাসা বইগুলোও নেই, অন্তত এসব আছে বলে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তাহলে আর এ অমূল্য কথাগুলো বলার জন্য, লেখার জন্য এত পরিশ্রমেরই বা কি দরকার ছিল?

ছয়

যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল "মানবকেন্দ্রিক" মার্ক্সীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আপত্তি জানিয়েছেন তাঁর নিজের নিরালম্ব দর্শন একসময় কতদূর পর্যন্ত

এগিয়েছিল তাও একটু ভেবে দেখা দরকার। একসময় "মনোবিকলনের" ('Analysis of Mind') ভিত্তিতে তিনি এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন যে মানুষের মগজ বলে কিছু আছে কিনা সে সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। 'আমি আমার মগজটা দেখতে পাই না। কোনও শরীরতত্ত্ববিদ বা Physiologist আমার মাথার খুলিটা ভেঙে আমার মগজ দেখার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তখনও তিনি আমার মগজ দেখতে পাবেন না। তাঁর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে আমার মগজের ছবি তাঁর মগজে যে কম্পন জাগাবে তিনি তাই শুধু অনুভব করতে পারবেন। এর বেশী তাঁর কিছু জানবার কথা নয়। অথচ তিনিও তো তাঁর নিজের মগজটা দেখতে পারেন না। মগজের এই মজা দেখে ওটাও যে আছে সেকথা নিশ্চয় করে বলার জো নেই। কিন্তু তার চেয়েও মজার কথা আজ নব্বুই বছরের বৃদ্ধ এই প্রতিভাশালী দার্শনিক পরমাণু বোমার আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের মানুষের জীবন যাতে লণ্ডভণ্ড না হয় সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত নন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য বিনা দ্বিধায় তিনি বিলাতের জেল খেটেছিলেন। "বিশুদ্ধ দর্শনের" পক্ষ থেকে "মানব-কেন্দ্রিক" দর্শনের বিরুদ্ধে যিনি মৌলিক আপত্তি জানিয়েছেন জীবনের প্রান্তিক সন্ধ্যায় উত্তীর্ণ সেই দার্শনিকের সুনিবিড় মানবপ্রেম আজ মানুষের অকৃপণ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে।

তথাপি তাঁর মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ পরিণতি হিসাবে ১৯৫৯ সালেও যে ঘোষণা তিনি করেছেন তার ভিতরেও একথা স্পষ্ট যে বার্কলি ও হিউমের ভূত তাঁর ঘাড় থেকে এখনো নামেনি। এখন তিনি অবশ্য আপন অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ একটা বহির্বিশ্বের অস্তিত্বের উপর নিঃসংশয় বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছেন। তাহলেও শেষরক্ষা যে করতে পারেন নি তার প্রমাণটাও স্পষ্টভাবে তাঁর কথার মধ্যে ধরা পড়েছে। "জগৎ সম্পর্কে আমার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী" বলতে গিয়ে তিনি একটি মূল্যবান নীতিসূত্রের অবতারণা করেছেন যা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সগোত্র। "দার্শনিকরা সাধারণতঃ, কি করে আমরা জানি,—জ্ঞানলাভের এই পদ্ধতি থেকে শুরু করে, আমরা কি জানি, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মনে করি এ দৃষ্টিভঙ্গীটা ভুল। কারণ কি করে আমরা

জানি তা আমরা যা জানি তারই একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।" এ কথাটি এইজন্য মূল্যবান যে আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তুজগতের অস্তিত্ব মেনে না নিলে আমরা কি করে জানি তাও জানতে পারি না। কিন্তু মানুষের মগজের উদাহরণ থেকে তিনি আগে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেয়েছিলেন তার ছাপ এখনও তাঁর মগজে আঁকা আছে।—"আপনি যে মগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন সেটা নিঃসংশয়ে বস্তুজগতেই অংশ, কিন্তু এই বাস্তব মগজটা আপনার জ্ঞানের বিষয় নয়।...আমি একথাই বলতে চাই, আমরা কেবল আমাদের নিজেদের মাথার ভিতরে যা ঘটছে তাই দেখতে পারি, অনুভব করতে পারি। তার বাইরে আর কোন কিছুই দেখতে বা অনুধাবন করতে পারিনা।...গাণিতিক পদার্থবিদ্যার পদার্থগুলি কোন বাস্তব পদার্থ নয়, ওগুলি গণিতবিদের সুবিধার জন্য কতগুলি ঘটনাকে মিলিয়ে নিয়ে তৈরী করা বুদ্ধিগত কল্পনামাত্র। দ্বিতীয়তঃ, অনুমানের মাধ্যম ছাড়া আমরা যা কিছু জানি তা সবই আমাদের ব্যক্তিজগতের ব্যাপারমাত্র। এবিষয়ে আমি বার্কলির সঙ্গে একমত। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় যে তারাভরা আকাশটাকে আমরা জানি সে আকাশ আমাদের অন্তরে। বাহিরের আকাশটা আমরা অনুমান করি। তৃতীয়তঃ যে কার্যকারণ-ধারার মারফত আমরা বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের বস্তুকে জানতে পারি, সেই ধারাগুলিও মরুভূমিতে নদীর মত মিলিয়ে যায়।" ( My Philosophical Development—My Present View of the World )

এখানে কিন্তু যে বস্তুবাদী জ্ঞানসূত্র থেকে রাসেল তাঁর সর্বাধুনিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীটি আমাদের কাছে খুলে ধরবেন বলে আশা সৃষ্টি করেছিলেন সেই সূত্র থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছেন। কি করে জানি এটাই তাঁর কাছে শেষ সিদ্ধান্তে বড় হয়ে উঠেছে। জগৎটা প্রত্যক্ষ সত্য নয়, কিন্তু অনুমেয় সত্য—এটা ন্যূনাধিক দুই হাজার বছর আগেকার সৌত্রান্তিক বৌদ্ধদের মত। কিন্তু যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষ সত্যকে নিরসন করা হয়েছে সেই একই যুক্তিতে অনুমেয় সত্যকেও নিরাশ হতে হবে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের কম্পনগুলির বাইরে আর কোনও কিছুই প্রত্যক্ষ নয় একথা মেনে নিলে অনুমানেরও নিস্তার নেই; কারণ অনুমানটাও তো মস্তিষ্কেরই একপ্রকার প্রক্রিয়া। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার বাইরে অনুমেয় বহিঃসত্য

বলে কিছু যে আছে তা জানার কোনও উপায় নেই। মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া দিয়েই যদি জগতের সকল সত্যাসত্য ব্যাখ্যা করতে হয় তবে অনুমান ও প্রত্যক্ষের ভিতরে কোনও তফাত করা দুঃসাধ্য। এ হিসাবে অনুমানটাও এক রকমের প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের বেলাও যেমন স্নায়বিক উত্তেজনার বাইরে কোনও স্বতন্ত্র উত্তেজক বহিঃপদার্থ আমাদের গোচরীভূত নয়; অনুমানের বেলাতেও মস্তিষ্কস্থিত আনুমানিক কার্যকলাপের বাইরে আর কিছু অনুভব করছি এমন কথা বলা চলে না। যদি বলা যায়, কোনও উদ্দীপক বহিঃপদার্থ না থাকলে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিল কে, তাই বহির্বিশ্ব কিছু আছে; এর উত্তরও পরিষ্কার,—এই যুক্তিটা যে দেয়া হল এত মাথারই একটা কাজ। কাজেই মাথার বাইরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো অসম্ভব। সৌত্রান্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে এই দুর্লঙ্ঘ্য যুক্তি উপস্থিত করলেন প্রজ্ঞাকর গুপ্ত। ধর্মকীর্তির শ্রেষ্ঠকীর্তি "প্রমাণবার্তিকে"র অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার প্রজ্ঞাকর গুপ্ত এইযুক্তি উপস্থিত করলেন বিজ্ঞানবাদীর তরফ থেকে। তথাপি এর ভিতর দিয়ে সৌত্রান্তিক মতের গুরুতর দুর্বলতা ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সর্বাধুনিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দুর্বল-স্থানটিও বারোশত বছর আগেকার প্রজ্ঞাকর দেখিয়ে দিলেন।

এর সঙ্গে রাসেল বর্ণিত মগজ পরীক্ষার বিশ্লেষণ পদ্ধতিটিও মিলিয়ে দেখুন আখেরে গিয়ে কি অবস্থা দাঁড়ায়। আমার ইন্দ্রিয়সমূহ, আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার দেহের রক্তের জোয়ার, আমার স্নায়ুজাল ও মস্তিষ্ক কোনও কিছুই আমার প্রত্যক্ষ নয়; একমাত্র প্রত্যক্ষ—কতগুলি শূন্যে ভাসমান অনুভূতি। রাসেলের যুক্তিতে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-কেন্দ্রের কম্পনগুলিও অনুমানমাত্র। সুতরাং রাসেল যখন বললেন আমরা যা কিছু দেখি শুনি সবই আমাদের মাথার ভিতরে তখনও তিনি ঠিক কথা বলেন নি। কারণ ঐ কথার কয়েক পংক্তি আগেই তিনি বলেছেন, আমার মাথাটা আমিও দেখি না অন্যেও দেখে না। তার উপরে "আমি তুমি" এগুলোও কথার কথা। দেকার্তে অন্ততঃ একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন—"আমি যে আছি এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই।" এখন কিন্তু ব্যাকরণের প্রথম মধ্যম উত্তম এই তিন পুরুষই ভিটেছাড়া হ'ল। বস্তুহীন মহাশূন্যে পরস্পর বিসংলগ্ন কতকগুলি অনুভূতির কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে,

সেগুলির কোন মালিকানা নেই, কারণ তারা কারুর নয়, কারণ আর কেউ বলে কিছু নেই। দর্শনের এই "অ-পৌরুষেয়তা" আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে পুরুষত্বহীনতায় পর্যবসিত হয়েছে।

রাসেল এতটা চরম সিদ্ধান্ত করেন নি, কিন্তু তাঁর যুক্তি অনুসরণ করলে এ পর্যন্ত যেতে হয়। বস্তুজগতের উপর রাসেল যে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস পোষণ করেন বলে ঘোষণা করেছেন, সে বিশ্বাসটা ঠিক তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস নয়, ওটা একটা সহজাত মানবিক বিশ্বাস যার সঙ্গে তাঁর দার্শনিক যুক্তির সামঞ্জস্য নেই। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি অনপনেয় আশা (incurable optimism) পোষণ করেন। যদিও তাঁর বিশুদ্ধ দর্শনের যুক্তি অনুসারে তুচ্ছ মানুষ থাকল বা গেল তাতে বিশ্বের কিছু আসে যায় না।

রাসেল "মানবকেন্দ্রিক" মার্কসীয় দর্শনের দুর্বলতা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব "বিশ্বগ্রাসী" দর্শন বিশ্ব-পরিক্রমা শেষ করে অবশেষে অনুভূতি-সর্বস্বতায় বিশ্রান্তি লাভ করেছে। বহিঃসত্য অনুমেয় মাত্র—এই "সৌত্রান্তিক" সত্যের সূত্র ধারণ করে তিনি "যোগাচারী বিজ্ঞানবাদে" এসে পৌঁছেছেন। যোগাচার-বৌদ্ধমতে একমাত্র স্বানুভূতি বা স্ব-সংবেদনই প্রত্যক্ষ সত্য; অনুমিতিও স্ব-সংবেদনেরই প্রকারভেদ মাত্র। বহির্বিশ্বের অস্তিত্বের প্রতি পরিনিষ্ঠিত বিশ্বাসটাও এক ধরনের অনুভূতি। এই বিশ্বাস-বিধৃত বিপুল ব্রহ্মাণ্ডটা আমার জ্ঞান-কাণ্ডেরই একটা অংশমাত্র। একদিন তিনি একথাই বলতেন। আজ তিনি বলুন আর নাই বলুন তাঁর সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্তের গতি ও প্রকৃতি আজও এই একই সিদ্ধান্তে আমাদের টেনে নিয়ে যায়।

## সাত

যে "মানবকেন্দ্রিক" মার্কসীয় দর্শন রাসেলের দার্শনিক প্রজ্ঞাকে পীড়িত করেছে তার "মানবকেন্দ্রিকতা" কি ধরনের সে বিষয়ে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। একদিন মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে ধার্মিক মহলের প্রধান আপত্তি ছিল যে এ দর্শন ভ্রষ্টাচারজনক জড়বাদের নির্লজ্জ চারণকাব্য। বিশ্ববিদ্যার আড়তগুলিতে যে আড়তদাররা সারস্বত শয্যা পেতে রেখেছিলেন তাঁরা এ

দর্শনের কলুষিত স্পর্শ থেকে দেবী সরস্বতীকে শত হস্ত দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগ আজ পাল্টে গেছে। এই "জড়বাদী" দর্শন যে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রতিফলিত হয়ে বিশ্ববাসীর বিমুগ্ধ বিস্ময় ও বিপুল বিশ্বাস উৎপাদন করেছে সে দেশ আজ পৃথিবীর সারস্বত তীর্থ। মস্কো এখন আর কেবল কমিউনিস্টদের "মক্কা" নয়। বরঞ্চ এই মক্কায় এখন অ-কমিউনিস্টদের আনাগোনাটাই বেশী করে চোখে পড়ে। এমনকি পৃথিবীর অনেক কমিউনিস্ট-বিরোধীও এই "জড়বাদের" তীর্থভূমির অকৃপণ প্রসাদ পেয়ে পরিপুষ্টি লাভ করছে। এ কথাও আজ অনেকেরই জানা হয়ে গেছে যে এই "জড়-দর্শনের" উপাসকবৃন্দ যখন সকল পার্থিব ভোগবিলাস উপেক্ষা করে মানুষকে মানুষের মত বাঁচাবার জন্য কৃচ্ছ্র-কঠোর জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন তখন ধর্মরাজের বরপুত্রগণ বিত্তবানদের কাঞ্চন-প্রসাদের প্রত্যাশায় জড়বাদের মুণ্ডপাত করার ব্রত ধারণ করেছিলেন।

কলেজ জীবনে দর্শনের অধ্যাপক যখন নিঃসঙ্কোচে শিখিয়ে চলতেন,—গ্রীসদেশে এপিকিউরাস নামে এক জড়বাদী দার্শনিক ছিলেন যাঁর সার নীতি ছিল—খাও দাও স্ফূর্তি কর, Eat, drink, and be merry, তখন মুগ্ধ চিত্তে অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও নীতিনিষ্ঠার তারিফ করেছি। আজ বড় হয়ে অনেকদিন পরে জানতে পেরেছি এপিকিউরাস এমন কথা কোন দিন বলেন নি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অপরিসীম কৃচ্ছ্রসাধক, বাল্য আর যৌবন কেটেছে তাঁর অন্তহীন দারিদ্র্যে। শুধু রুটি আর জল ছিল তাঁর দৈনিক খাদ্য। তার উপরে একটু চীজ মিললে তিনি সেদিন ভোজের আনন্দ অনুভব করতেন। যে যুগে ঈশ্বরবিশ্বাসী জাঁদরেল দার্শনিক প্লেটো বা এরিস্টোটলের ঘরে শ' পাঁচেক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী না থাকলে দার্শনিক চিন্তায় অঙ্গসেবার আমেজ জমত না, সেইযুগে পরমাণুবাদী নিরীশ্বর এপিকিউরাস ক্রীতদাস প্রথাকে নৈতিক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই মিতাহারী মিতাচারী জড়বাদীর গৃহে ক্রীতদাসরা ঠাঁই পেয়েছিল সাম্য স্নেহ ও সম্মানের ভূমিতে। এমনকি সমাজের অবজ্ঞাত উৎপীড়িত বারাঙ্গনাদের পর্যন্ত বিত্তবানদের লালসা থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের স্নেহস্নিগ্ধ গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে লালসাসিক্ত ধার্মিকদের কুৎসার অন্ত ছিল না। ছাত্র ও শিষ্যদের অতি সামান্য দানে কায়ক্লেশে তাঁর দিন

চলে যেতে। বিত্তশালী ক্ষমতাবান প্রভুদের অনুগ্রহের পরোয়া না করে মানুষের প্রতি সুস্নিগ্ধ ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল এই দরিদ্র দার্শনিক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে গেলেন। জুলিয়াস সিজারের সমকালীন বিখ্যাত লাতিন কবি লুক্রেসিয়াস এপিকিউরাসকে মানুষের রক্ষা-কর্তা বলে স্মরণ করেছিলেন। এপিকিউরাসের দর্শনের কাব্যময় রূপ তিনি যে কবিতায় নিবদ্ধ করেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা বহুযুগ ধরে ধার্মিক-শাসিত সমাজে অপাংক্তেয় ছিল। মধ্যযুগের পাদ্রীদের রোষবহ্নি থেকে একখানা মাত্র পাণ্ডুলিপি কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছিল। তাই লুক্রোসিয়াস বরাতের জোরে অমরত্ব লাভ করেছেন। লুক্রোসিয়াস যে শেলীর প্রিয় কবি হয়েছিলেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আমাদের দেশের 'ধার্মিক' দার্শনিকরাও জড়বাদী চার্বাকের যে কুৎসিত চিত্র এঁকেছেন তাতে এপিকিউরাসের নামে আরোপিত "eat, drink and be merry"-র নীতি-কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এপিকিউরাসের প্রায় তিনশত গ্রন্থই চিরকালের মত নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। সামান্য দু-এক টুকরো লেখা মাত্র রক্ষা পেয়েছে। এপিকিউরাস ও লুক্রেসিয়াসের গ্রন্থভাগ্য আরও মনে করিয়ে দেয় যে চার্বাকের ভাগ্যের জোর বোধহয় আরও কম ছিল। যে সব "ধর্মপ্রাণ" দার্শনিকরা চার্বাককে খণ্ডন না করে জলস্পর্শ করতেন না তাদের বা তাদের মুরুব্বিদের রোষানলে চার্বাক-দর্শনের সকল পাণ্ডুলিপিও হয়তো অক্ষয় সদ্‌গতি লাভ করেছে!

মার্কসীয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যে এপিকিউরাসের প্রসঙ্গ মুখ-বন্ধরূপে উত্থাপন করলাম তার তাৎপর্য বুঝতে পাঠকদের বোধ হয় বেগ পেতে হয়নি। মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে ধর্মধ্বজীদের আক্রমণের লক্ষ্য মূলত তার তথাকথিত "জড়বাদ" নয়। এই দর্শনের মর্মনিহিত মানবতাবাদই এ আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু মানুষকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এ দর্শন এতখানি সাফল্য অর্জন করেছে এবং এই অনাস্বাদিত-পূর্ব সাফল্য সমগ্র মানবসমাজে এত বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, মানুষের চিন্তাধারাকে এমন এক নূতন খাতে প্রবাহিত করেছে যে এই দর্শনকে নিছক "জড়বাদ" বলে আক্রমণ করলে চিন্তাশীল মানুষের সাধুবাদ আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। যে দর্শন মানুষকে জড়পদার্থ বলে মনে করে না, কিন্তু জড়পদার্থের উপর

মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে; তার বিরুদ্ধে জড়বাদের কুৎসা আর কতদিন চালানো সম্ভব? কাজেই এখন ঠিক উল্টো দিক থেকে আক্রমণ চালানো দরকার হয়ে পড়েছে,—"মার্কসীয় দর্শন বড় বেশী মানবিক; কারণ মানুষের প্রয়োজনের কল্পনা দিয়ে সত্যকে সাজিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে।"

অবশ্য রাসেল কোন কুটিল অভিপ্রায় নিয়ে এ আপত্তি তোলেন নি। তাঁর মতে মানুষের শুভাশুভ বিচার নৈতিক দর্শনের সমস্যা, আর জাগতিক সত্যাসত্যের বিচার মানবকল্যাণ-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ দর্শনের সমস্যা। মার্কসবাদ এদুটাকে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছে। আমরা বিচার করব মার্কস্-বাদের বিরুদ্ধে রাসেল যে মৌলিক আপত্তি তুলেছেন তার বাস্তবিকই কোন ভিত্তি আছে কি না। কোন মার্কস্বাদী কি এমন কথা কোনদিন বলেছেন যে বস্তুজগতের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা হবে মানুষের ভালমন্দের নিরিখে? রাসেলের মতে তা হলে মার্কস্বাদও এক ধরনের Pragmatic মতবাদ। একাধিক জায়গায় রাসেল বলেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বিশ্বসত্যের তুলনায় মানব-সত্যের মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের আত্মবলয়কে সংকুচিত করেছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই আত্মপ্রসন্ন বিদগ্ধবাণীর ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে, বস্তুজগতের তুলনায় মানুষের নগণ্যতাকে প্রকটিত করার মারফত তাঁর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব খর্ব করে দিয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি রাসেলের নিজের ঘাড়ে বার্কলি ও হিউমের প্রেতাত্মা এখনও ভর করে আছে, তাঁর দার্শনিক যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডটাই মানুষের মগজের ভিতরে ঢুকে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এবং সে মগজটাও যে আছে এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। রাসেলের নিজস্ব দর্শন আত্মকেন্দ্রিক নয়, কারণ আত্মা বলে কিছু নেই; মানবকেন্দ্রিক নয়, কারণ মানব বলে কিছু নেই এবং বস্তুতান্ত্রিক নয় কারণ বস্তু বলে কিছু নেই। অনুমেয় সত্য এই বহির্জগৎটাও আনুমানিক অনুভূতিতে সীমাবদ্ধ। এই নিরালম্ব অনুভূতির ভৌতিক দীর্ঘনিঃশ্বাসকে এখন তিনি মার্কসের নাসিকা-প্রসূত বলে অনুভব করছেন। আবার অন্ধকার শ্মশানে অনেক সাহসী লোকও অনেক সময় নিজের নিঃশ্বাসকে ভূতের নিঃশ্বাস বলে অনুভব করে।

"মানবকেন্দ্রিক" দর্শন কথাটির অর্থ কি? মানুষের বুদ্ধি ছাড়া মানুষ বস্তুসত্তাকে জানবে কি করে? যে জগৎটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, যার অস্তিত্ব মানুষের শুভাশুভ বিবেচনার উপর নির্ভর করে না তার রহস্য বুঝতে হ'লে কোন অতিমানবের কাছ থেকে মানুষ বুদ্ধি ধার করবে? অতীতের মর্কট-কান্তি মানুষই এখন কার্তিক-কান্তি হয়েছে সত্য, কিন্তু মর্কটের ধ্যানধারণা ধার করে মানুষের পক্ষে জগতের রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। এ অর্থে তো সকল মতবাদই মানবকেন্দ্রিক, কারণ মানবীয় ভাবনাকেন্দ্রের বাহিরে গিয়ে মানবের পক্ষে কোন কিছু ভাবাই অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধি দিয়েই "অ-মানুষে"র জ্ঞানলাভ করতে হয়—জ্ঞানের এই নীতি স্বতঃসিদ্ধ। একে অস্বীকার করলে বলতে হবে—পাথর জানতে চাইলে পাথর হতে হবে, এমিবার রহস্য জানতে চাইলে মানুষকে আগে এমিবা হতে হবে; নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডি জানতে পারেন নি বলে যে কবিগুরু আক্ষেপ করেছেন তাঁরও বোধহয় বলা উচিত ছিল—"হায়, আমি নেড়ী কুকুর হতে পারলাম না!" যদি ধরেও নেই যে পুরুষ বৈষ্ণবসাধককে যেমন গোপীপ্রেমের রহস্য বুঝতে গেলে গোপী হয়ে যেতে হয় মানুষকেও তেমনি এমিবা বা নেড়ীকুকুর হতে হবে, তাহলেও এই অ-মানুষ জীবের মর্মকথা কোনদিন প্রকাশ করা সম্ভব হবে না; কারণ প্রকাশ করবে তো মানুষ, তখন ত তাকে আবার মানবিক ভাবনারই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

কাজেই মানবিক ভাবনা দিয়েই মানবেতর বস্তু বা প্রাণীর কথা ভাবতে হবে, জানতে হবে—এ নীতি স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধ নীতির সঙ্গে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা মেনে নিতে হবে—"মানুষের ভাবনার বাহিরে একটা স্বতন্ত্র বস্তুজগৎ আছে বলেই মানুষ ভাবতে পারে।" বিশুদ্ধ দার্শনিক তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে উঠবেন—এ নীতি দুটো তো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। বিরোধ হলে কি করব? এ বিরোধটাও তাহলে দুনিয়ারই নীতি। এই বিরোধকে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ দার্শনিক একবার ভাববার চেষ্টা করে দেখুন না। তিনি কিছুই ভাবতে পারবেন না। শূন্যবিহারিণী ভাবনা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। প্রথম কথা, সকল ভাবনার আশ্রয়স্বরূপ অন্ততঃ একটা মস্তিষ্করূপী বস্তু চাই যার অস্তিত্ব আমার চিন্তার উপর নির্ভর করছে না, অথচ আমার চিন্তাই যার অস্তিত্বের উপর প্রতিক্ষণ নির্ভর করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার জ্ঞানের বিষয় হিসাবে গাছপালা চেয়ারটেবিল মানুষ-টেবিল মানুষ ইত্যাদি স্বতন্ত্র সত্যবস্তুসমূহ রয়েছে যাদের সম্পর্কে আমি জানি, যারা আমার জ্ঞানকে আকার দেয়, রূপ দেয়, অর্থ দেয়। না হলে বলতে হয় দর্শনের কোন বিষয় নেই, দার্শনিক মানুষও নেই, শুধু দর্শনটাই আছে। অথবা যে দেখে সে নেই, যা দিয়ে দেখে সেই চোখটাও নেই, যা দেখে সেই বস্তুটিও নেই—তবু শুধু দেখাটাই আছে। এই তবে দার্শনিকের দর্শন, পরমার্থদর্শন। আধুনিক কালে এই পরমার্থ-দর্শন প্রচার করেই নাকি দর্শনশাস্ত্রে বিপ্লব আনা হয়েছে। যখন দ্রষ্টাও নেই দ্রষ্টব্যও নেই, শ্রোতাও নেই বক্তাও নেই, লেখকও নেই পাঠকও নেই, কথাও নেই, বইগুলোও নেই, তখন এই শূন্যময়ী বিপ্লবের বাণী প্রচার করার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন বোধহয় একটা আছে, তবে সেটা একটু বেশি পারমার্থিক। এই মৌলিক বিপ্লবের মূল্য হিসাবে মোটা মাইনেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা পদ অলঙ্কৃত করা যায়—এই মূল্যবোধটা সব চেয়ে বাস্তব, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ। শূন্য ভাবনার প্রস্তুতির জন্য একদিকে প্রয়োজন কোটি টাকার মঠ, অন্যদিকে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে বিশ্বের সরস্বতী আরামে লয় পেতে পারেন।

বলাবাহুল্য, এই অতি আধুনিক অথচ অতি পুরাতন বিপ্লবী দর্শনের উপর মার্কসীয় দর্শনের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। "মানুষ নামে একজাতের জীব আছে, মানুষের বাইরে বস্তুজগৎ একটা আছে, এবং মানুষ তার আপন বুদ্ধির দ্বারা এই বস্তুজগৎকে জানতে পারে"—মার্কসবাদের মতে এই স্বতঃসিদ্ধ নীতিসূত্রকে গ্রহণ না করে এক পা এগোবার জো নেই। যারা এই নীতিসূত্রকে অস্বীকার করে তারা নয় উন্মাদ, নয় ভণ্ড, নয় বিভ্রান্ত। তারা মাকড়সার মত আপনার জালে আপনি আবদ্ধ। তাদের দর্শন মানবকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু শূন্যকেন্দ্রিক। এই মূলনীতি স্বীকার করার জন্য মার্কসীয় দর্শন যদি "মানবকেন্দ্রিক" হয়ে থাকে, তাতে দুঃখের কিছু নেই।

"বিরোধ" কথাটার মার্কসীয় দর্শনে প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রেও এর ব্যবহার নিতান্ত অপ্রচুর নয়। তবু এর অর্থ সম্পর্কে এই দুয়ের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা বৃত্ত ও বর্গক্ষেত্রের সংজ্ঞা জানি। এই সংজ্ঞানুসারে আমাদের দুটি পৃথক পৃথক ধারণা আছে। "বৃত্তাকার

বর্গক্ষেত্র” বলামাত্র আমরা বলি এটা স্ববিরোধী কথা। এর কারণ আমাদের পক্ষে বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্রের ধারণা করাই অসম্ভব। এ জাতীয় বিরোধ জ্ঞানকেই অসম্ভব করে তোলে। কিন্তু আবার ধরুন যোগ ও বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—এখানেও যুগল ধারণার মধ্যে বিরোধ আছে। তবু চার সংখ্যাটিকে আমরা দুই আর দুইয়ের যোগফল হিসাবেও ভাবতে পারি আবার ছয় থেকে দুই-এর বিয়োগফল হিসাবেও ভাবতে পারি। চৌদ্দকে সাত দিয়ে ভাগ করে দুই পাওয়া, আর সাত ও দুই-এ গুণ করে চৌদ্দ পাওয়া মূলত একই প্রক্রিয়ার দুইটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য; এখানে কিন্তু বিপরীতের বিরোধ বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্রের মত জ্ঞানের বন্ধ্যাত্বে পরিণত হয় না; বরঞ্চ সংখ্যার প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরও স্বচ্ছ ও গভীর করে তোলে। আবার দেখুন, বনের গাছটা মিস্ত্রীর হাতে পড়ে টেবিল হয়ে গেল। বিশুদ্ধ ন্যায়ের অনুরাগী দার্শনিকরা কি তুমুল তর্ক তুললেন, টেবিলটা গাছ কিনা, গাছটাই টেবিল কিনা? কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে গাছ আর টেবিল এক নয়, অথচ একও বটে। এখানে এই বিরোধ ও সমন্বয়কে একই সাথে মেনে না নিলে গাছের টেবিলে পরিণত হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কোনও ন্যায়শাস্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সত্যকে বিকৃত করা সম্ভব নয়। জগতে প্রতিমুহূর্তে একবস্তু আর একবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। একের ভিতরে বহু বিপরীতের সমন্বয় ও বিরোধ একই সঙ্গে স্বীকার করতে না পারলে প্রতিক্ষণের এই পরিণাম বা পরিবর্তনের ধারণাই করা যেত না। সুতরাং এখানে বস্তুর অন্তর্নিহিত বিরোধ বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের সত্যদৃষ্টিকে আরও গভীর ও প্রসারিত করে।

জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারেও ঐ একই কথা সত্য। মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত বহিঃসত্যকে মানুষ জানে। নিছক অনুভূতিবাদী দার্শনিক বলেন, তবেই হ'ল। জ্ঞানের পরিধির বাইরে গিয়ে কোন কিছুই যখন জানা সম্ভব নয়, তখন সবই আমার একান্ত অন্তরের ধন। কিন্তু একথা বলে অনুভূতিবাদী নিজের অন্তরেই বিরোধের পাকে জড়িয়ে পড়লেন। একই জ্ঞান, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল; একজন জ্ঞাতা এনে যদি এখন হাজির করা যায়, তবে তো বিরোধটা আরও বেশী জমে উঠবে। মানুষের ধারণা জ্ঞেয়

পদার্থটা জ্ঞানের বাইরে, জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পদার্থ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী যদি জ্ঞেয়কে জ্ঞানের অন্তর্গত বলে মনে করেন, তবে নিজের অন্তরে বিপরীতের বিরোধ তাকে মেনেই নিতে হবে। যদি বিরোধটা মানতেই হল তবে সাধারণ মানুষের ধারণা নিয়ে বহির্বস্তুকে বাহির বলেই মানতে আর আপত্তি করার কি আছে। আর একথাও খাঁটি সত্য যে তর্কের সময় অন্তরের ধন নিয়ে যিনি যতই মেতে উঠুন না কেন, প্রকৃত জীবনে নিজের বাইরে একটা বস্তুজগতের উপর অবিচল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস নিয়ে না চললে তর্কের দিনটি পর্যন্ত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকার সৌভাগ্যই হত না। যে বিশ্বাস ছাড়া এক পা হাঁটা যায় না, এক মুহূর্ত বাঁচা যায় না, তর্ক করার তাকত পাওয়া যায় না সে বিশ্বাসটাকে তর্কের খাতিরে উড়িয়ে দিতে হবে এমন আবদার করলে সে তার্কিককে গাছের ডালে চড়িয়ে দিয়ে বলতে হয়, একবার কালিদাস হোন, ডালটা কেটে দেখুন না কি হয়। সুতরাং অন্তর ও বাহির এই দুই ধারণা পরস্পরবিরোধী হলেও এই দুয়ের সমন্বয়েই আমাদের জ্ঞানের সৃষ্টি। একদিকে আমায় ইন্দ্রিয় স্নায়ু ও মস্তিষ্ক সমন্বিত দেহ আর একদিকে বাইরের বস্তুজগৎ—এই দুয়ের সম্পর্কের মারফত জ্ঞানের উৎপত্তি। এখানে ভিতর-বাইরের বিরোধটা "বৃত্তাকার বর্গক্ষেক্ষেত্রের" বিরোধ নয়। এইরূপে বিরোধ ও সমন্বয়ের একই সঙ্গে ধারণা না থাকলে কোন বস্তুগত ধারণাই অসম্ভব। নিছক ভাববাদী দার্শনিকরা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের, অন্তর ও বাইরের বিরোধকে "বৃত্তাকার বর্গের" মতই মনে করেন। এই দুই ধরনের বিরোধকে একাকার করে দেখার ফলেই শংকরাচার্য তাঁর বেদান্তভাষ্য এই বলে আরম্ভ করলেন যে জ্ঞান ও জ্ঞেয় আলো ও অন্ধকারের মত পরস্পর-বিরোধী। বিরোধ পরিহারের উপায়টিও সস্তা, জ্ঞেয় পদার্থকে বাদ দিলেই লেঠা চুকে গেল। তা হলে জ্ঞানের রূপ আকার প্রকার এসব কোথায় পাওয়া যাবে? বলা হল ওগুলোও মিথ্যা, এক নিরাকার জ্ঞানই অবিনশ্বর সত্য। মার্কসবাদী এখানে সবিনয়ে বলবে,—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যা ধারণা করতে পারে আপনি যদি তা না পারেন তবে আপনার ধারণার অক্ষমতাকে সম্মান দেখাবার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের ধারণা মুছে ফেলতে

মায়ামোহগ্রস্ত জীবগুলো রয়েছে তাদের উদ্ধার করার জন্য আপনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন কেন? ব্রহ্মাণ্ডটা যখন আপনার ভিতরেই রয়েছে তখন আর আমাদের উদ্ধার করার জন্য বাইরে হাত বাড়াবার দরকার কি ছিল? যদি বলেন এসব কিছু করেছেন ব্যবহারিক সত্তার খাতিরে; তা হলে বলুন না কেন ব্যবহারিক সত্তাটাই সত্য; আপনার কল্পিত পারমার্থিক সত্তাটাই ভাববিলাস মাত্র? জগৎটা যদি রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতই হবে, তবে উপমাটা তো আমরা একটু উল্টেও দেখতে পারি, দড়িটাই জগৎ আর সাপটাই ব্রহ্ম হোক না কেন? আর এটাই ঠিক হবে, কারণ এই বস্তুজগৎটার উপর দাঁড়িয়েই আপনি ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়েছেন।

আট

বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন মার্কসবাদের একটি মূলসূত্র তখন আমাদের পূর্বালোচিত অর্থে মার্কসবাদকে নিশ্চয়ই "মানবকেন্দ্রিক" বলা যায় না। রাসেল শেষ পর্যন্ত যা বলতে চেয়েছেন তাতে মনে হয় মার্কসবাদ Pragmatic অর্থে মানবকেন্দ্রিক। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্যের মুস্কিল হল এই যে মার্কসবাদী দার্শনিকরা সুস্পষ্ট ভাবে Pragmatic মতবাদকে আত্ম-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানবাদ বা Subjective Idealism বলে ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং লেনিনের এবিষয়ে একাধিক নিঃসঙ্কোচ বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, কোন বস্তু বা ধারণা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে বলেই সত্য একথা ঠিক নয়, বরঞ্চ সত্য বলেই প্রয়োজন সাধন করতে পারে এ কথাই ঠিক। আমরা আগেই বলেছি যে ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা কোন বস্তু বা ধারণাকে আমরা সত্য বলে জানতে পারি; কিন্তু এর দ্বারা আমরা বস্তুর অস্তিত্বটা তৈরী করছি না, সত্যের সৃষ্টি করছি না। এর অর্থ, আমরা জানি বলেই যে বস্তুটা আছে তা নয়, আছে বলেই তাকে জানি। একই কথা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বস্তুসত্য নিরপেক্ষ বা absolute, কিন্তু

মার্কসের মতে সত্য আপেক্ষিক, আপেক্ষিক সত্য মানেই তো pragmatic truth, যখন যে রকম ভাবলে, যে রকম করলে কার্যসিদ্ধি হয় তখন তাই সত্য। এই অপব্যাখ্যার নাম স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি বা বুদ্ধির অক্ষমতাজনিত বিভ্রান্তি। সত্যকে যখন আমরা আংশিকভাবে জানি তখনই আমাদের জ্ঞানটা আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই অর্থে কোন বস্তু বা ঘটনার অসম্পূর্ণ ধারণাকে আপেক্ষিক সত্যও বলা যেতে পারে।

আমাদের ধারণা সাধারণতঃ কোন বস্তুসত্তার আপেক্ষিক সত্যকেই প্রকাশ করতে পারে। এই টেবিলটার উদাহরণটাই ধরুন না কেন। যে কাঠুরিয়া বনের গাছটা কেটে তক্তা করেছে, যে মিস্ত্রী তক্তা দিয়ে টেবিলটা তৈরী করেছে—টেবিল সম্পর্কে তারা যা জানে আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না। এখন কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী ও আমার খণ্ড খণ্ড ধারণাগুলি মিলিয়ে টেবিলটাকে যেভাবে জানা যাবে, আমার চোখের দেখায়, বা উপরে কাগজ রেখে লেখায় কিন্তু সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যাবে। মার্কস ও হেগেলের পূর্ববর্তী সমস্ত দার্শনিকরাই জ্ঞান ও জ্ঞেয়র আলোচনা করতে গিয়ে মুলতঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিচারপ্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ রয়েছেন—চোখের সামনে যে বইটা দেখছি ওর সঙ্গে আমার দেখা বা জানার সম্পর্ক কি, এই সমস্যা নিয়েই দর্শন দিশাহারা হয়েছে। কাজেই আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানটুকু যে বস্তুস্বরূপের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র প্রতিফলিত করে, আমার অগ্রবর্তী অভিজ্ঞতা এবং সমাজের আরও দশজনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করে আমাদের ধ্যানধারণা যে ক্রমশঃ সমগ্র বস্তুস্বরূপকে জানা ও বোঝার দিকে অগ্রসর হয়—জ্ঞানের এই ক্রমান্বয়ী অগ্রগতির দিকটা তারা বেমালুম পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। সামগ্রিকভাবে সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে অগ্রসর হতে না পারলে আমাদের খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলি অন্ধের হাতি দেখারই সামিল। পূর্ণতা বা সমগ্রতাই সত্য—Truth is the whole—হেগেলের এই মতকে মার্কসবাদীরাও সত্য বলে মনে করেন। কোন বস্তুর সমগ্র স্বরূপকে জানতে গেলে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব নিয়েই টান পড়ে। গাছটা ঠিক কি তা জানতে হলে গাছের উৎপত্তি ও পরিণতির সমগ্র ইতিহাস মিছিল করে মানুষের দরজায় হাজির হয়। বিজ্ঞানের সকল বিভাগ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হয়, সবকিছু মিলিয়ে

একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণায় উপস্থিত হতে হয়। জ্ঞানটা তাহলে একদিনের ব্যাপার নয়, একজনের ব্যাপার নয়, বহুযুগের বহু মানুষের খণ্ডিত উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত ফল হল সত্যের জ্ঞান। তথাপি এ জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ অনেক রহস্য অনেকদিন ধরে অজ্ঞাত থেকে যাবে। মার্কসবাদ জ্ঞান ও জ্ঞেয়র সম্বন্ধকে পূর্ণতার দিকে অবিরাম অগ্রগতি হিসাবেই বিচার করে থাকে। এই অগ্রগতির বিরাম নেই, কারণ বিশ্বরহস্যের শেষ নেই। যা জানার তা জেনেছি, যা বোঝার তা বুঝেছি, যাকে জানলে সব জানা যায় সেই পরমপুরুষকে জেনেছি—এমন কথা মানুষের পক্ষে বলা কোনদিন সম্ভব হবে না। যাঁরা একদিন একথা বলেছেন তাঁরা তাঁদের পথচারী পরিশ্রান্ত প্রজ্ঞার অক্ষমতাকে এক পরমপুরুষ দিয়ে ঢেকে রেখে ক্লান্তি-জুড়ানো পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সব জানা শেষ করে এই ঘুমিয়ে পড়াটাই যদি সার কথা হত তবে পৃথিবীর বুকে আদিম মানুষের প্রথম পদধ্বনির কয়েক যুগ পরেই মানুষের সভ্যতাও হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।

মানুষের শৈশব আছে, কৈশোর আছে, যৌবন আছে কিন্তু বার্ধক্য নেই, কারণ তার জানার শেষ নেই। বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূর্ণ সত্য চিরকাল মানুষের অগোচর থাকবে, কারণ সে সত্য স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ, মানুষের জানা অজানার উপর তা মোটেই নির্ভর করছে না, আর সেই জন্যই মানুষের সভ্যতাও কোনদিন ঘুমিয়ে পড়বে না। মানুষের জ্ঞান আংশিক, আপেক্ষিক, তাই সে চিরকাল বাঁচবে। সকলের জ্ঞানকে একত্র করে আরও বেশী করে জানবে, অপূর্ণতাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করবে। অনেক কিছুই অজানা থাকবে একথাও যেমন সত্য, আদিম মানুষের তুলনায় অনেক বেশী জানা গেছে, আরও বেশী জানা যাবে একথাও তেমনি সত্য। বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যনূতন রহস্য ভেদ করার মধ্যেই মানুষের অন্তহীন গৌরব। মার্কস্‌বাদ এই গৌরবে বিশ্বাসী; এই জন্যই যদি তাকে "মানবকেন্দ্রিক" বলা যায়, তবে এই মানবকেন্দ্রিকতা একনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধিৎসার ছাড়পত্র। এই ছাড়পত্র যে দেশ পেয়েছে সেই দেশ সকলের আগে মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে। এমন একটা সমাজব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা যায় যেখানে মানুষের লোভ মানুষের বাঁচার পথে অন্তরায় নয়, যেখানে সকলের সম্মিলিত

জ্ঞানভাণ্ডারকে অবাধে পূর্ণসত্যের সাধনায় নিয়োজিত করা সম্ভব, তাহলে মাহুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে—তার প্রমাণ সোভিয়েত রাশিয়া। সাম্যবাদী দর্শনের মর্মকথা সোভিয়েত সমাজের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে প্রযুক্ত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয়েছে,—সাম্যবাদী দর্শন সত্যোপলব্ধির দর্শন। এ দর্শন মানুষকে বাঁচতে শেখায়, সত্যকে জানতে শেখায়। কয়েক বছর আগে রাসেল বলেছিলেন—সোভিয়েত রাশিয়ার বৈপ্লবিক সাফল্য মার্কস্‌বাদ ছাড়াও হতে পারত। ব্যাকরণের Subjunctive mood-টা বড় বেশী subjective। উত্তরে শুধু এটুকুই বলা চলে—যে দেশের চিন্তারাজ্যে Berkley, Hume ও Russell-এর নিরঙ্কুশ আধিপত্য সেই Newton-এর দেশে রাশিয়ার অনেক আগে মহাকাশ জয় করা যেত।